জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

গ্রন্থাবলী—

সোসিয়ালিজম্

ও

কমিউনিজম্

প্রধানতঃ

লিওডোর উল্‌সে

প্রণীত

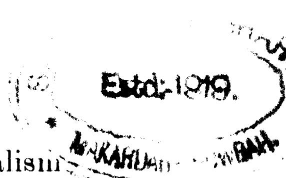
Communism and Socialism

In their History and Theory

নামক গ্রন্থ অবলম্বনে

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত



বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪২

মূল্য—১৸০

এক টাকা বার আনা মাত্র

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়—

দ্বিতীয় অধ্যায়—

তৃতীয় অধ্যায়—

চতুর্থ অধ্যায়—

পঞ্চম অধ্যায়—

ষষ্ঠ অধ্যায়—

সপ্তম অধ্যায়—

অষ্টম অধ্যায়—

KAMALA PRINTING WORKS.

3, KASI MITTER GHAT STREET.

BAGHBAZAR, CALCUTTA

কমিউনিজম্ ও সোসিয়ালিজম

১

সংজ্ঞা ও তত্ত্ব

সোসিয়ালিজমের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ মেলা কিছু দুর্ঘট। চলিত ভাষায় ত নাইই, সংস্কৃতের ভাণ্ডার খুঁজিয়াও এরূপ কোন শব্দ মিলিবার আশা খুবই কম। ওরূপ বা উহার অনুরূপ কিছু আমাদের দেশে জন্মায় নাই বলিয়া উহার দেশীয় নামকরণও ঘটে নাই। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান বিকাশের প্রথম যুগে কতকগুলি বিদেশীয় কথার সংস্কৃতমূলক আখ্যা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চলন বড় রহিল না। তাপমান যন্ত্র, লৌহশকট, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আর আধুনিক সাহিত্যে বড় স্থান পায় না। এ সব বস্তুর বিকৃত বা অবিকৃত বিদেশী নামই চল হইয়া গিয়াছে। এই সব জড়রাজ্যের বস্তুর মত ভাবরাজ্যেরও অনেক বিদেশী বিষয়ের সহিত আমরা এতটা ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি যে সেগুলিকে তাহাদের মৌলিক নামেই অভিহিত করিয়া থাকি, এবং তাহাদের কোন নব রচিত দেশীয় আখ্যা আমাদের কাণে যেন ভাল শোনায় না; বেখাপ্পাই লাগে। আবার অনেক সময় এই আখ্যাগুলি তেমন সঙ্গতার্থকও হয় না। সোসিয়ালিজমের তত্ত্বের সঙ্গে সকলের বিশেষ পরিচয় না থাকুক, উহার নামের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের অনেকটা পরিচয় আছে। এই আশায় এবং উহার

কোন কষ্টকল্পনা-প্রসূত নূতন নাম তেমন সুসঙ্গত হইবে না এই আশঙ্কায়, উহার বিদেশী নামই প্রধানতঃ বর্ত্তমান আলোচনায় বাহাল রাখা গেল।

আমাদের দেশে উহার প্রতিশব্দের অভাব ঘটিলেও উহা যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেখানে উহা কাল ও পাত্রভেদে নানা অভিধায় দেখা দিয়াছে। এই অভিধাগুলির মধ্যে কমিউনিজম (Communism) ও কলেক্‌টিভিজম (Collectivism) এই এই দুইটি অনেকটা প্রচলিত। এ দুইটি সোসিয়ালিজ্‌মের সহিত অনেক সময় সমানার্থক রূপে ব্যবহৃত হইলেও, উহাদের মধ্যে বেশ একটু ভাবগত পার্থক্যও আছে। মিউচুয়ালিজম (Mutualism) বলিয়া ঐরূপ ভাবের আর একটা শব্দ প্রতীচ্য ভূমির স্থান বিশেষে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু উহা নিজের উৎপত্তিস্থল ফ্রান্স ব্যতীত বিশ্বসাহিত্যের মাঝখানে বড় একটা অধিকার পায় নাই। উহা অবশ্য সাম্য ভাবাত্মক সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিরই দ্যোতক। এই শব্দটির ধাতুগত অর্থের মধ্যে না থাক, উহার তত্ত্বগত মর্ম্মের মধ্যে সোসিয়ালিজমের বিশিষ্ট লক্ষণ সম্পত্তির সমাধিকারিতার আভাসও পাওয়া যায়।

যে দেশে সোসিয়ালিজমের উৎপত্তি, সেই দেশেই সোসিয়ালিজম বলিতে কি বুঝায়, ইহা লইয়া এখনও অনেক মত ভেদ রহিয়াছে। কমিউনিজম বা কলেক্‌টিভিজম সংজ্ঞা দুটির মধ্যে যে পরিমাণে একটা সুস্পষ্ট ভাবার্থ পাওয়া যায়, সোসিয়ালিজম শব্দটি অবশ্য সেরূপভাবে ততটা সুস্পষ্ট নয়। এই কারণেও ভাষান্তরে ইহার প্রতিশব্দ রচনা কিছু দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্ঘতন্ত্র বা সমষ্টিতন্ত্রের মত শব্দের সাহায্যে কমিউনিজম বা কলেক্‌টিভিজমের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ রচনা করা যাইতে পারে, এবং তাহা শ্রুতিকটু বা অসঙ্গতও তেমন ঠেকে না। ঐসব

বিদেশী শব্দগুলির বারম্বার প্রয়োগের পরিবর্ত্তে আমরা এই পুস্তকের মধ্যে দুই এক যায়গায় উহাদের ঐ প্রতিশব্দ দুটি ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু সোসিয়ালিজম শব্দটির বেলা সেরূপ কোন প্রয়াস পাইব না।

মিউচুয়ালিজমের মত কলেক্‌টিভিজম সংজ্ঞাটি সম্বন্ধেও বড় বেশী কিছু বলিবার নাই। ইহার প্রচলন মিউচুয়ালিজমের মত অতটা সংকীর্ণ না হইলেও, বড় বেশী ব্যাপকও নয়। তবে সম্প্রতি ফরাসী ও জার্ম্মাণ লেখকেরা এটির প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যষ্টির পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত ভাবে সামাজিক ব্যাপারের—বিশেষতঃ শ্রমশিল্পের পরিচালনাই এই সংজ্ঞাটির স্থূল ভাবার্থ। এখন বাকি দুইটি সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক। কমিউনিজম ও সোসিয়ালিজমের মধ্যে প্রথম পার্থক্য এই যে আগেরটি প্রাচীন ও শেষেরটি নবীন। কিন্তু এই কালগত পার্থক্য বড় বেশী ধর্ত্তব্য নয়। উহাদের মধ্যে অর্থ ও ভাবগত যে বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে, তাহাই বিশেষরূপে দর্শনীয়।

কমিউনিজম্ বলিতে এমন একটা সমবেত জীবনপদ্ধতি বুঝায় যাহার মধ্যে আইনের বলে, সকলের সম্মতিতে, অথবা ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত কোন সংকল্প গ্রহণে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত করা হইবে। দেশের ধন সম্পদে সর্ব্বসাধারণের এই সমবেত অধিকার স্থাপিত হইলে স্বতন্ত্র সব পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না, এবং ইহার পরিবর্ত্তে জীবনযাত্রার এমন এক রীতি প্রচলিত হইবে যাহার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পরিবার কিছু কিছু থাকিলেও, পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও নীতি ধরিয়া সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইবে না। বর্ত্তমানে এক একটি সমাজের মূল সংস্থান হইতেছে একএকটি পরিবার। বহু এইরূপ পরিবারের সমষ্টিই হইতেছে একএকটি সমাজ,

অথবা তাহার এক একটি শাখা বা সম্প্রদায়। ধনসম্পত্তির অর্জ্জনে সঞ্চয়ে বর্দ্ধনে কি ইচ্ছামত ভোগে প্রত্যেকটি পরিবারের অব্যাহত অধিকার এখন একটা আছে। এই অধিকার পরিচালনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবারকে কতকগুলি নিয়মে শাসন ও রক্ষা করেন পিতা বা তাঁহার স্থানীয় একজন কর্ত্তা, যাঁহার প্রভুত্ব পরিবারভুক্ত সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ ও সাধারণ ব্যবহারের নীতি এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, যাহাতে প্রত্যেকটি পরিবারের বিশিষ্ট সব অধিকার এবং পারিবারিক জীবনের সুনীতির শৃঙ্খলা ব্যাহত না হয়।

কিন্তু কমিউনিজমের আদর্শ ধরিয়া নূতন যে সমাজ হইবে, তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তি ও সেই সব সম্পত্তির অধিকারী পৃথক্ পৃথক্ পরিবার কিছুই থাকিবে না। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ ও ব্যবহারের নীতি এমন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, যাহা এই সমবায় রক্ষার সহায়ক হইতে পারে; এবং পিতা বা পারিবারিক কর্ত্তার পরিবর্ত্তে এমন অন্যরূপ শাসকের নিয়োগ করিতে হইবে, যাঁহারা নূতন নিয়মে সুশৃঙ্খলায় এই সমবায়কে এমনভাবে পরিচালিত করিবেন যে তাহা ভাঙ্গিয়া না পড়ে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকেই বড় বলিয়া না ধরিয়া সমাজকে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের সমষ্টিগত জীবনকেই যাঁহারা বড় বলিয়া মনে করেন, এবং প্রধানতঃ এই সমষ্টি জীবনের মঙ্গল হইতে পারে এমন কোনও আদর্শ-পদ্ধতি স্থির করিয়া তাহারই অনুসারে সমাজকে যাঁহারা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নিতে চান, ইঁহাদেরই নীতির সাধারণ নাম সোসিয়ালিজম। আধুনিক ব্যক্তি-প্রাধান্য বাদের (Indiv dualismএর) বিপরীতার্থ-দ্যোতক শব্দ হইতেছে সোসিয়ালিজম।

সোসিয়ালিজম্ এমন একটা আদর্শ ধরিয়া সমাজ গড়িতে চায় যাহাতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতা যতটা থাক কি না থাক, সমাজ মঙ্গলে থাকিবে। অন্যান্য আদর্শের ন্যায় কমিউনিজম ইহার বিশিষ্ট একটি আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু এক মাত্র আদর্শ নয়। তবেই সোসিয়ালিজম সংজ্ঞাটি কমিউনিজম অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হইল। ইহা বিশেষ কোন সমগ্র রাষ্ট্রের পরিচালনার অনুযায়ী একটা নিয়মপদ্ধতি হইতে পারে; কিংবা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘের নিয়মপ্রণালীও হইতে পারে,যাহা সমগ্র কোন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হয় না। সম্পত্তির সহাধিকারিতা বা অন্য প্রকার সামাজিক সহযোগিতা ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ হওয়া অসম্ভব নয়। আবার শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ প্রকার সহাধিকারিতা বা সহযোগিতা উহার বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া বুঝিতেই হইবে, এমন কোন কথাও নাই। তবে ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যে এই শব্দটি যাঁহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছে, মোটের উপর তাঁহারা সকলেই কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজের নিয়মপ্রণালীরই প্রবর্ত্তনকামী। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ ব্যাপক আদর্শে সমাজ বা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী, তাহা ঐ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণার্থক কমিউনিজম শব্দে পাওয়া যায় না বলিয়াই এই নবীন সোসিয়ালিজম সংজ্ঞাটির সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে, সম্পত্তির সাধারণ সহাধিকারিতা অর্থাৎ সমগ্র বা প্রায় সমগ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপই ইহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র জগৎকে অথবা সন্নিকট বহু রাষ্ট্র লইয়া তাহার একটি বৃহৎ অংশকে একেবারে না হউক, সমগ্র একটি রাষ্ট্রকে অন্ততঃ এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। এবং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই রাষ্ট্রের প্রজাবৃন্দকে রাষ্ট্রশক্তির আধার ষ্টেট্‌কে কর্ত্তারূপে মানিয়া চলিতেও বাধ্য থাকিতে হইবে। ইহার কমে সোসিয়ালিজম্ সন্তুষ্ট নয়। এদিকে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘও

কমিউনিজমের নিয়মে পৃথক্‌পৃথক্ ভাবে চলিতে পারে। কমিউনিজমের সার্থকতা তাহাতেও হয়। কিন্তু যদিও সোসিয়ালিজম ও কমিউনিজম সংজ্ঞা দুটির মধ্যে এতটা পার্থক্য, তথাপি অনেক লেখক দুইটির উদ্দেশ্যগত সমতা লক্ষ্য করিয়া দুইটিকে সমানার্থকরূপে প্রয়োগ করিতেও বিরত হন নাই।

এখন এই আলোচ্য বিষয়টির প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। এক হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজের কথা। এইটাই অবশ্য আদি বিভাগ। এই বিভাগে যে সব সঙ্ঘের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, করিতে চাহেও নাই। কতকগুলি লোক কেবল সাধারণ লোকসমাজ-হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া নিজেদের বিশিষ্ট আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, যাহা সাধারণ লোকসমাজ হইতে কতকটা পৃথক্ ভাবে না থাকিলে সম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী বা আধুনিক বিভাগ বলিতে এমন কতকগুলি মতবাদ বুঝা যায় যাহা বর্ত্তমান সমাজপ্রণালীরই আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চায়। এই সব মতানুসারে কোনরূপ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়াস এ পর্য্যন্ত বড় ঘটে নাই। যাঁহারা ঐ সব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা উহা জগতের সমক্ষে একটা বিচার্য্য আদর্শরূপে খাড়া করিয়া ধরিয়াছেন। ঐ আদর্শকে কার্য্যক্ষেত্রে মুর্ত্তিমান করিয়া তুলিতে কেহ তেমন বদ্ধ-পরিকর হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ আদর্শগুলি কেবল আকাশ কুসুমের মতই চিরদিন থাকিতেছে না। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে উহারা ক্রমশঃ ছায়ামূর্ত্তি ছাড়িয়া কতক কায়ার আকারও ধারণ করিতেছে। ফরাসী রাজ্যে এই আদর্শ বিপ্লববাদে পরিণত হয়; এবং সাম্য ও মৈত্রীর বিশেষ একটা ভাবাশ্রয় ইহাকে অতি বলশালী

করিয়া তোলে। ক্রমশঃ ঐ আকাশ কুসুমের মত আদর্শ মাত্র এরূপ বিশিষ্ট পদ্ধতি ও প্রণালীর আকার ধরিয়াছে, যাহা দ্বারা মানবসমাজ কেবল একটুমাত্র সঞ্চালিত হইতে পারে তাহাই নয়, পরন্তু উহার আমূল পরিবর্ত্তনেরও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ঐ সব আদর্শের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক জীবনের উন্নতির দিকে আগ্রহও যেন দিন দিন বেশ জাগরুক হইয়া উঠিয়াছে। এই সব আধুনিক মত অবশ্য প্রাচীন মতের বিরোধ কিছু নয়। তবে পূর্ব্বে যাহা অস্পষ্ট ছিল, এখন তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এখন এই মতগুলি এতটা সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে ছোট ছোট পৃথক্ এক একটি সঙ্ঘে কেবল নয়, রাষ্ট্রেও তাহাদের একটা পরীক্ষার এখন বোধ হয় লইতে পারে। *

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফোরিয়ার (Fuorier) কেবেট (Cabet) ব লুই ব্লোঙ্কের (Louis Blanc) মত বাদ গুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ গুলি সকলই সঙ্ঘতান্ত্রিক বা কমিউনিষ্টিক।

কিন্তু এই সব নবা মতের লক্ষ্যস্থল কেবল প্রচলিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘমাত্রই নয়। ধরিতে গেলে উহারা সমগ্র রাষ্ট্র-গ্রাসী। এমন কি উহা সমগ্র পৃথিবী না হোক, পরস্পর নিকটবর্ত্তী একটা রাষ্ট্রমণ্ডলের নিয়ন্তৃত্ব করিতে স্পর্দ্ধা রাখে। এই সব মতের বিশেষত্ব এই যে এগুলি সব অর্থনৈতিক সমস্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে উহাদের প্রবর্ত্তন প্রণালীর সহিত সাম্য মৈত্রীর ন্যায় সাধারণ নীতিরও যোগ আছে। উহাদের সকলেরই মুখ্য লক্ষ্য হইতেছে একমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তির হস্তেই সমাজের সমস্ত শ্রমশিল্পের ভার অর্পণ এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন। আধুনিক সোসিয়ালিজমের

* রুষিয়ায় বোলশেভিক বিপ্লবে এইরূপ আদর্শে সমাজ গড়িবার প্রথম চেষ্টা হইতেছে।

আদর্শানুমত রাষ্ট্রে উহার অন্তর্ভুক্ত সকলকেই যে এক যোগে একই ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা হয়ত অনেকের মতে বাঞ্ছনীয় হইলেও, একান্ত ভাবে অনিবার্য্যও নয়। কিন্তু সম্পত্তির সাধারণ সহাধিকারিতার প্রবর্ত্তন চাইই চাই। এরূপ ভাবে সমাজের পুনর্গঠনের নামই সোসিয়ালিজম,—তা সে সোসিয়ালিজম লাসেলের (Lassale) আদর্শানুসারে প্রতিষ্ঠিত সমাজকে একেবারে লঙ্ঘন না করিয়া মধ্য পথই অবলম্বন করুক, অথবা দৃঢ়চেতা মনস্বী কার্ল মার্কসের (Karl Marx) প্রণালীতে বর্ত্তমান সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনেরই পক্ষপাতী হৌক।

ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে কমিউনিজম প্রকৃতপক্ষে পৃথক্ পৃথক ভাবে সম্পত্তির অধিকারের একেবারে বিরোধী নয়। কমিউনিজমের নিজ সঙ্ঘ মধ্যে কাহারও কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবকাশ না থাক, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিতরে বা বাহিরে এরূপ সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা কমিউনিজম অঙ্গীকার করিতে পারে। সঙ্ঘের মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি অনেক সময় ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছাদত্ত উপহারের মতই গৃহীত হয়। এরূপ সম্পত্তির সংরক্ষণের নিমিত্ত মামলা মকদ্দমাও চালান হয়; সঙ্ঘের বহিঃস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ওরূপ সম্পত্তির ক্রয়বিক্রয়ও চলে। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে যে ব্যক্তি সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া যায়, তাহার সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করাও হইয়া থাকে। অপর পক্ষে সোসিয়ালিজমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র উহার বহিঃস্থ অপর রাষ্ট্রের সম্পত্তি অঙ্গীকার করিতে পারিলেও, নিজের এলাকার ভিতর কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি কখনও অনুমোদন করিতে পারে না। উহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবন নির্ব্বাহের জন্য, বড় জোর হয়ত নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বর্দ্ধনে, নিজের অর্জ্জিত বা সঞ্চিত কিছু স্বীয় সম্পত্তিরূপে ব্যয় করিতে পারে।

কিন্তু কোন প্রকার মূলধন রূপে কোন কিছু নিজের হাতে রাখিবার কাহারও অধিকার একেবারেই নাই।

নানা নীতির অনুসরণে নানা প্রকার কমিউনিটী বা কমিউনিষ্ট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় পরস্পরে এইরূপ যোগ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এবং এই সঙ্ঘগুলি যে যে রাষ্ট্রের অধীন, সেই সেই রাষ্ট্রের আইন কানুন যথাসম্ভব মানিয়াই নিজেদের মধ্যে নিজেদের বিশেষ নিয়ম-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সঙ্ঘপ্রবেশকামী ব্যক্তিমাত্রকেই নিজ নিজ সম্পত্তির দাবী পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, রাষ্ট্রের আইনে হয়ত কোন স্থলে এ সম্বন্ধে কোন বাধাও ঘটিয়াছে। বিবাহ-কৌমার্যের ব্যাপারেও বয়স্ক সভ্য বৃন্দের কর্ম্ম-নিয়োগে, ধর্ম্মোপাসনার ব্যবস্থায় (অবশ্য যে স্থলে সঙ্ঘ ধর্ম্ম বলিয়া কিছু মানিত); সমাজের শাসনে ও সম্পত্তির পরিচালনায় যাহা যাহা প্রয়োজন, সে সব অবশ্য সাধারণের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানাদির বিরোধিতা যথাসম্ভব না করিয়াই এ সব বিষয় নির্ণয় করিতে হইয়াছে। এরূপ সঙ্ঘগঠনের প্রকার ও হেতুও নানাবিধ হইতে পারে। কোথাও উহা একান্ত ভাবে কোন বিশেষ ধর্ম্মমতেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত। কোথাও বা কেবল পুরুষরা মিলিয়া, কোথাও কেবল স্ত্রীলোকরা মিলিয়া, এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। কুত্রাপি ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়গত নানা কারণ এরূপ সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কৌমার্য্য, কোথাও বা বিবাহের ব্যবস্থাও আছে। পারিবারিক জীবন অনেক স্থলেই সঙ্ঘের পরিপন্থীরূপে পরিগণিত হইলেও কয়েক স্থলে উহার আংশিক অনুমোদনও করা হইয়াছে। এরূপ সঙ্ঘের উপর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিদিগের শাসন দৃষ্টি কোথাও খর, কোথাও

বা বেশ কোমলও দেখা গিয়াছে। কমিউনিজমের এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক মিলিতে পারে। কিন্তু সোসিয়ালিজমের মূর্ত্ত বিকাশ পৃথিবীতে আজও বড় ঘটে নাই, এক নব্য রুযিয়ার যে চেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ব্যতীত।

যাই হোক, বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মতামত সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে খুবই পার্থক্য আছে। কমিউনিজম বিশেষ কোন দলের হইতে পারে, হইয়াছেও তাহাই। কিন্তু সোসিয়ালিজম আদি হইতেই একেবারে জনসাধারণের বস্তু। কমিউনিজম রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা বিশেষ সঙ্ঘের পরিচালনা মাত্র। কিন্তু সোসিয়ালিজম সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গড়িতে উন্মুখ। এইরূপ ভাবে দেখিলে ইহাকে কমিউনিজম অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর দৃপ্ত ও অধিকতর ব্যাপক বলিয়াই মনে হইবে। এক পক্ষে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ইহা এত দূর বিরোধী যে, ইহা জনসাধারণের মতি-গতি ফিরাইয়া, নয় সামাজিক বিপ্লব ঘটাইয়া, এমন কি যদি সম্ভব হয়, তবে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি করায়ত্ত করিয়াও, যেরূপে হৌক, বর্ত্তমান ব্যবস্থার আমূল ওলট-পালট করিতে প্রয়াসী। অপর পক্ষে আবার এমন সোসিয়ালিজম-বাদীও আছেন, যাঁহারা হাতে ক্ষমতা পাইলেও সমাজকে ওরূপ ভাবে একেবারে বদলাইতে চাহেন না। তাঁহারা চান ব্যক্তিগত মূলধন উঠাইয়া দিয়া একান্ত ভাবে সাধারণ সামাজিক মূলধনের প্রতিষ্ঠা করিতে। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও বিবাহাদি অনুষ্ঠান সমাজে যেরূপ চলিতেছে কতকটা সেইরূপ ভাবেই চলিতে থাকুক, ইহাতে তাঁহাদের বড় আপত্তি নাই।

বিশেষজ্ঞদের মতে খাঁটি সোসিয়ালিজম এইরূপই। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে এমন কি সাধারণ শিক্ষিতদের ভিতরেও ইহার সম্বন্ধে বহুবিধ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ ঘটিবার একটা বিশিষ্ট

কারণও আছে। যাঁহারা সোসিয়ালিজমের বিশেষ সমর্থনকারী, তাঁহাদেরই অনেকের মধ্যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম যেন তেমন পরিস্ফুট নয়। ইহার বিরোধী ও পক্ষপাতী উভয় দলের মধ্যেই ইহার সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রতিদিন দেখা দিতেছে। কেহ ইহাকে মহাবিভীষিকার মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিতেছে, আবার কেহ ইহাকে অসঙ্গত আশার আলোকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ উভয় দলের অনেকেই ইহার যথার্থ স্বরূপ ঠিক অবগত নয়। যাহারা ইহাকে ঘৃণা বা ভয় করে, তাহারা জানে না ইহা কেনই বা এত ঘৃণার্হ বা ভয়ার্হ। আবার যাহারা ইহার মহিমা গান করে, তাহারাও ইহার মহিমার বিশেষ হেতু যে কিছু ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না।

সাধারণের মধ্যে সোসিয়ালিজম সম্পর্কে এই প্রকার নানা অস্পষ্ট জ্ঞান ও মত বিদ্যমান থাকায় নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের পক্ষে ইহার সত্য স্বরূপটি অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, তাহা হইলেই ইহার সম্বন্ধে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার ভ্রান্ত ধারণা ক্রমে নিরসিত হইবার সম্ভাবনা। ইহার সম্বন্ধে বিখ্যাত অর্থনীতিবেত্তা সাফ্লের (Schaffle) সার ও সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সাফ্লেকে কতকাংশে সোসিয়ালিজমের সমর্থনকারী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার বিরোধী সমালোচক ও ইতিহাস লেখক থিওডোর উল্‌সির নিকট সাফলে উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে সমাদৃতহইয়াছে। সোসিয়ালিজমের এই বাঙ্গলা সঙ্কলনের মধ্যে আসল সোসিয়ালিজম-বাদীদের পরস্পর বিরোধী মতামত অপেক্ষা ঐ দুইজন গ্রন্থকারের আলোচনাই বিশেষ রকমে স্থান পাইবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনকারিদের হাতে ইহা যে রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহা ইহার একটা অচিরস্থায়ী সুতরাং অবান্তরিক লক্ষণ মাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদের ঐ সব বাহ্য বর্ণবৈচিত্র্যের দিকে নজর দিলে বলিবে না। ধর্ম্ম বা রাজনীতি ইহার সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেও, বস্তুতঃ ইহা একটা অর্থনৈতিক সমস্যা ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের তত নয়, প্রধানতঃ উদরেরই কথা। শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যের প্রচলিত বণ্টনকার্য্যে একটা বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা হইতেই সোসিয়ালিজমের আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে। কলকারখানার বর্ত্তমান প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের ধ্বংসই ধরিতে গেলে এই আন্দোলনের আদি মূল। প্রচলিত শ্রমশিল্প-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই ইহার গতি প্রথম হইতেই বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে সোসিয়ালিজমের সংক্ষিপ্তসার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ব্যষ্টিগত মূলধনের পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত মূলধনের স্থাপনা করিতে চায়। এখন যে প্রতিযোগিতা-মূলক উৎপাদনক্রিয়া সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে এ কার্য্য যতদিন সম্পাদিত হইবে, ততদিন প্রতিযোগিতার ভাব অপরিহার্য্য। অতএব ব্যক্তিগত মূলধন উঠাইয়া দিয়া জাতীয় মূলধনের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এরূপ জাতীয় মূলধনের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকারিত্ব বিলুপ্ত হইয়া হইয়া সমষ্টিগত অধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, অর্থাৎ উৎপাদন কার্য্যে নিয়োজিত যে কোন প্রকার মূলধনের উপরেই কোন বিশেষ ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না; সমষ্টিগত ভাবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত লোকই এরূপ মূলধনের অধিকারিরূপে পরিগণিত হইবে। এরূপ মূলধনের

সৃষ্টি ও পরিচালনার ভার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিদের হস্তেই অর্পণ করা ভিন্ন পথ নাই। তাঁহারাই সাধারণ মূলধনগত সমস্ত শ্রমশিল্পের উৎপাদন-ক্রিয়া পরিদর্শন করিবেন এবং শ্রমজাত দ্রব্যসম্ভার শ্রমকারিদের ভিতর বিভাগ করিয়া দিবেন।

সোসিয়ালিজমের তত্ত্বটি যে ভাবেই অভিব্যক্ত হৌক, আর যে ভাবেই উপলব্ধ হৌক, সংক্ষেপতঃ উপরি উক্ত উদ্দেশ্যটিই ইহার মর্ম্মের কথা।

বর্ত্তমান নিয়মে যাহারই মূলধন আছে, সেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য তাহা মুক্তভাবে নিয়োগ করিতে পারে। শুধু নিজের লাভের খাতিরে তাহারই মত অপর প্রতিদ্বন্দ্বী মূলধনিদের বিষয় ছাড়া অন্য কাহারও দিকে তাহার নজর রাখিবার প্রয়োজনই নাই। এখন সোসিয়ালিজমের উদ্দেশ্য এই যে এরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ-মূলক প্রক্রিয়ার বদলে এরূপ প্রাণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত মূলধন অর্থাৎ পণ্যোৎপাদক শ্রমসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার উপায় ও সাধন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। এরূপ ব্যবস্থায় একদিকে সমস্ত ব্যক্তিগত ও বিভক্ত শ্রমশক্তি নানা আকারে সমষ্টিগত ভাবে একই সামজিক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত থাকিবে, অপরদিকে এরূপ সামাজিক সমবায়জাত সর্ব্বপ্রকার অর্থ প্রত্যেক শ্রমকারির শ্রমের পরিমাণ অনুসারে সকলের মধ্যে বণ্টন করা যাইবে। নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসায় বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। সমষ্টিগত মূলধনের সাহায্যে ঐরূপ শ্রমের সমবায় ও তজ্জাত পণ্যের উৎপাদন ও বিনিময় সম্পাদিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থার অধীনতায় সমস্ত শ্রমকারির অর্জ্জিত অর্থ অপরের দেয় বেতনরূপে গণ্য না হইয়া নিজের শ্রমজাত প্রাপ্যরূপে পরিগণিত হইবে। উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের সম্পাদকেরা

নিজ নিজ বিভাগ সম্বন্ধে যে যা হিসাব দিবে, অবশ্য তাহারই সাহায্যে প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণীত হইতে থাকিবে। এরূপ নির্ণয় করা সত্ত্বেও যদি কখনও কোন দ্রব্যের ঘাটতি বা বাড়তি ঘটে, তবে এই সাময়িক ব্যতিক্রম সঞ্চয়-ভাণ্ডারের দ্বারা সংশোধন করা যাইবে। এরূপ ভাণ্ডার অবশ্যই কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নয়, সাধারণের দ্বারাই সংস্থাপিত হইবে। ব্যক্তিগত মূলধনের পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত মূলধনের প্রতিষ্ঠার অর্থ উল্লিখিত ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু নয়। সোসিয়ালিজম-বাদীর মতে ঐরূপে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই বর্ত্তমান ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার বিশৃঙ্খল অরাজকতার মধ্যে সমষ্টিগত সহযোগিতার শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। বর্ত্তমান প্রণালীকে অরাজক বলা হইয়াছে, কেন না উহার প্রচলনে সমাজ মধ্যে দ্রব্যাদির উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের কাজ কোনরূপ সামাজিক বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; পরন্তু উহাতে প্রতিযোগিতার বিশৃঙ্খল দ্বন্দ্ব ও অধিকতর সংগ্রহের ব্যগ্রতায় ব্যক্তিগত লোভের প্রকোপই স্থান পাইয়াছে।

সোসিয়ালিজম সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নেতৃগণ, বিশেষতঃ খ্যাতনামা কার্ল মার্কস্ (Karl M rx), নিজেদের নিবন্ধাদিরে মধ্যে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনে যতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, নিজেদের নিয়মপ্রণালী গঠনে ততটা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও উপরি উক্ত কথাটিই যে সোসিয়ালিজমের প্রাণ ও মর্ম্ম, ইহা সকল বুদ্ধিমান্ পাঠক ও সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের কাছেই ধরা পড়িবে। অন্ততঃ ব্যক্তিগত মূলধনাত্মক বর্ত্তমান শ্রমশিল্পের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টরা যে কঠোর প্রতিবাদ খাড়া করিয়াছেন, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কিছু প্রতিপন্ন করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন সোসিয়ালিজমের বিজ্ঞান শ্রমকেই যেরূপভাবে মূল্যের একমাত্র নিয়ামক করা হইয়াছে, উহার ভাবী ব্যবস্থায় শ্রম-কালের অর্থাৎ যতটা সময় শ্রম করা হইবে, তাহারই পরিমাণে যেরূপ ভাবে শ্রমকারিদের আয়ের পরিমাণ নির্ণীত হইবে বলা হইয়াছে, এবং যেরূপ ভাবে ভাবী এই পদ্ধতিতে বর্ত্তমান মুদ্রার প্রলচন রদ করার কথা হইয়াছে, তাহা হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয় না কি? প্রতিবাদের দিক্ ব্যতীত গঠনের দিক দিয়াও এই আন্দোলনের চিন্তাশীল নেতৃগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যতটুকু আভাস দিয়াছেন, তাহাও অবশ্য ঐরূপ সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। ফল কথা, সোসিয়ালিজমের তত্ত্বটিকে যেমন করিয়াই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা যাউক, ইহার বিশেষ মর্ম্মটি একই ভাবে প্রস্ফুট হইয়া উঠে। সেই মর্ম্ম কি, না দেশের সমস্ত জমিজমা, কলকারখানা, যন্ত্র-তন্ত্র, সংক্ষেপে উৎপাদনের সমস্ত সহায় ও সাধন, কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারে না থাকিয়া সমষ্টিগত ভাবে সর্ব্ব-সাধারণের অধিকারে থাকিবে, মূলধনিদের বিশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার স্থলে বিধিবদ্ধ শ্রমের সমবায় ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কোন প্রকার ব্যবসায় করিতে পারিবে না। দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্বন্ধীয় কাজ সমষ্টিগত ভাবে সকলের দ্বারা সাধিত হইবে। শ্রমশিল্পের সমস্ত উপকরণের অধিকারী থাকিবে সর্ব্ব-সাধারণ এবং সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রত্যেক শ্রমকারির কার্য্যের পরিমাণ অনুসারে শ্রমজাত দ্রব্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ধরিতে গেলে, সমস্ত উৎপাদকই তখন শ্রমিকরা হইবে, মূলধনী বলিয়া কোন লোকই আর থাকিবে না। কিন্তু এই শ্রমিক তখন বেতনভুক্ ভৃত্যরূপে অপরের তাঁবে কোন কাজ করিবে না। সকলেই পরস্পর সহযোগির ন্যায় নিজের সমাজের সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে। তখন বর্ত্তমানে প্রচলিত লাভ,

ক্ষতি, মজুরী প্রভৃতি কোন কাথাই আর থাকিবে না। প্রত্যেক শ্রমকারির আয়ের অর্থ হইবে জাতীয় দ্রব্য ভাণ্ডারের নিজ নিজ অংশ, এবং এই অংশ শ্রমিকের নিজ শ্রমের পরিমাণ অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইবে। মূলধনী, জমিদার বা কুসীদগ্রাহীর কবলে তখন আর কিছুই যাইবে না। সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য যাঁহারা শাসন বিচার, শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ করিবেন. তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে ভাবে কোন প্রকার পণ্যের উৎপাদন না করিলেও, সমাজের হিতার্থে প্রত্যেকে যিনি যতটুকু সময় ব্যয় করিবেন, জাতীয় পণ্য ভাণ্ডারের কিয়দংশ তাঁহাদের মধ্যে সেই পরিমাণে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

এরূপ একটা সামাজিক ওলট পালটের আন্দোলন অনেকেরই কাছে বেজায় বেয়াড়া বলিয়াই ঠেকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার পক্ষপাতী এমন অনেক দল গড়িয়া উঠিতেছে, যাহারা কি জ্বলন্ত উৎসাহে, কি অটল বিশ্বাসে, কি সঙ্ঘ-গঠনে, কি মত প্রচারে, অনেক দলকে অতিক্রম করিয়াছে। এই সব দল ক্রমশঃই পুষ্ট হইতেছে, এবং নিজেদের বিজয় সম্বন্ধে সকলে যেন একেবারে অসন্দিগ্ধ। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় যাহারা এরূপ বিপ্লব ঘটাইতে প্রয়াসী, এরূপ প্রতিপক্ষের আসল তত্ত্বটি বুঝিয়া দেখা সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন। একজন বিশিষ্ট বিরোধীর সহিত যুক্তি তর্কে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মতটিকে নিজের কোন সংস্কারে রঞ্জিত না করিয়া ঠিক রকম জানা, তিনি কি চাহেন বা চাহিতে পারেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত নয় কি? এরূপ করিতে হইলে ঐ দলের মাথা-পাগলদের প্রলাপে কাণ দিলে চলিবে না। কারণ ও গুলা উহার ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস মাত্র। উহার আসল মর্ম্মের সহিত ও গুলার কোন সম্পর্ক নাই। আসল মর্ম্মটি ধরিতে হইলে, উহার মূল নীতি হইতে যে সব সিদ্ধান্তে মনস্বী লেখকগণ উপনীত হইয়াছেন,

বা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব, সেই দিকেই নজর দেওয়া চাই।

কোন বিষয় বা বস্তুকে বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে সেটি কোথায় কি ভাবে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও জানা দরকার। আবার শুধু ঐ বস্তুর মূলটুকু মাত্র জানিলেই উহার সম্বন্ধে সব জানা হয় না। ঐ মূল কি ভাবে অঙ্কুরিত বিকসিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারও সন্ধান লইতে হয়। তাই যে তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারও উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটু খবর প্রথমে লইব। সোসিয়ালিজম সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস লেখা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাহা হইলেও উহার একটা সংক্ষিপ্ত জন্মবৃত্তান্ত না দিলেও এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইবে না। কিন্তু এরূপ সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লেখার পূর্ব্বে উহার কোন প্রকারভেদ আছে কি না, কিংবা উহার অনুরূপ অথচ পৃথক্ এমন কিছু মানবসমাজে দেখা দিয়াছে কি না, এ বিষয়ে একটু সামান্য দৃষ্টিক্ষেপ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছু আগে কমিউনিজমের সহিত সোসিয়ালিজমের একটু তুলনা করা হইয়াছে। তাহাতে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইলেও, অন্ততঃ একটি বিষয়ে কতকটা সাদৃশ্যও দেখা যায়। সেটি হইতেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ। অবশ্য এই বিলোপ কোথাও বা পূর্ণ, কোথাও বা আংশিক। কমিউনিজম ও সোসিয়ালিজমের এই বিশেষত্বটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দুইয়ের বেলাই নিজ নিজ জমিজমা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় রাষ্ট্রের, নয় সংঙ্ঘের, করে তুলিয়া দেওয়ারই কথা। সেই সম্পত্তির অধিকার বা পরিচালনা নিজে বা পাঁচজন অংশীদারে মিলিয়া লইলে চলিবে না। উহার যাহা কিছু ভার রাষ্ট্র বা সঙ্ঘের উপরেই অর্পিত থাকিবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপকেই কমিউনিজম বা সোসিয়ালিজমের বিশেষ লক্ষণরূপে ধরা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু কথাও আছে। উহাদের স্বরূপ যতটুকু বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এমন সব সামাজিক বিপ্লবাত্মক তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা বড় ঠিক হইবে না। এখন এই কমিউনিজম জিনিশটা একই ভাবে, না বিচিত্র প্রকারে আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাই প্রথমে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। এরূপ অনুসন্ধানে কতকগুলি সম্প্রদায় বা সমবায়কে কমিউনিজমের অন্তর্গত শ্রেণী-বিভাগ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এরূপ ভ্রান্তি না ঘটিবারই কথা।

প্রথমে কমিউনিজম সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেটিকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অনেকে হয়ত বলিবেন, আচ্ছা, ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে, কতকগুলি অংশীদারে মিলিয়া যখন কোন কাজ করা হয়, তখন সে ক্ষেত্রে কি কমিউনিজমের ভাব ফুটিয়া উঠে না? সে ক্ষেত্রেও ত সম্পত্তি ব্যক্তিগত না হইয়া একটা দলের বা সমবায়ের অধিকারে থাকে। কোন সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহিত অংশীদারী অনুষ্ঠানের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও সঙ্ঘতন্ত্র ও অংশীদারী কাজ এক নয়; উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। অংশীদারী ব্যাপার হইল কোন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য একটা সুবিধাজনক উপায় মাত্র। মূলধনের অল্পতা হেতুই হৌক, কিংবা অন্য কারণেই হৌক, একাকী কোন কাজ করা অসুবিধা হওয়ায় সেই কাজ পাঁচ জনে মিলিয়া করা। একজনের দ্বারা যদি সেটা সুবিধা মত সম্পাদিত হইতে পারিত, তবে কেহ অপরের সহিত যোগ দিত না। তাহা ছাড়া, এরূপ অংশীদারী কাজের সঙ্গে রাজনীতিরও কোন সংস্রব

না। প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির সহিত উহার কোন বিরোধই থাকিতে পারে না। কারণ ওরূপ সমবায় রাষ্ট্রীয় বিধির দ্বারাই সৃষ্ট ও সংরক্ষিত। কিন্তু প্রকৃত সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহিত প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কিছু না কিছু সংঘর্ষ ঘটিবেই। যেমন ধরা যাক, পারিবারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে। প্রচলিত রাষ্ট্রবিধি যে ভাবে উহা নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, সঙ্ঘতান্ত্রিক বিধি তাহাতে অন্তরায় ঘটাইয়াই বসিবে। এতদ্ভিন্ন অংশীদারী কাজ নিতান্তই স্বেচ্ছা মূলক। অংশীদারেরা যখনই ইচ্ছা,তখনই উহা বন্ধ করিতে পারে। চিরদিন ঐ কাজ ঐরূপেই চলিতে থাকিবে, এরূপ ভাব লইয়া কেহ উহাতে প্রবৃত্ত হয় না। আবার শুধু ঐকাজটির হানিকর এমন আচরণ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে কোন অংশীদারকে দমন করিবার ক্ষমতা ঐরূপ সমবায়ের হস্তে অবশ্য কিছুই থাকিবার কথা নয়। কিন্তু এ সব বিষয়ে সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায় একেবারেই উহার বিপরীত।

কোন প্রভুর অধীনে কোন ক্রীতদাস-সম্প্রদায়কেও সঙ্ঘতান্ত্রিক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কারণ ও সম্প্রদায়েরও একটা বিশেষ লক্ষণ ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ। কিন্তু আইন বা প্রথার দ্বারা দাসসম্প্রদায় নিজের প্রভুর জমিজমার সহিত একেবারে চিরতরে আবদ্ধ। ঐ জমিজমার স্বত্বাধিকারির অনুমতি ব্যতীত এ সম্প্রদায়ের কাহারও স্থানান্তরে যাইবার বা উৎপন্ন দ্রব্য হস্তান্তরিত অথবা বিবাহাদি করিবার পর্য্যন্ত অধিকার থাকে না। এমন কি তাহাদের উপর প্রভুর রাজনৈতিক শক্তিও চালনা করিবার ক্ষমতা থাকে। তাহাদের প্রভুর মধ্যস্থতা ব্যতীত দেশের রাষ্ট্র-দেহের সহিত তাহাদের কোন সংযোগই থাকে না। খাসেই থাক, আর দাস-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলি করাই থাক, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির মালিক হইলেন

তাহাদের প্রভু। তিনি ইচ্ছা করিলে সে সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন, এবং তাহার কোন রাজনৈতিক অপরাধেও এসব সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। ফলতঃ দাসত্বের নিয়মে জমিজমা ও সন্তানাদির মত ক্রীতদাস ও প্রভুর সম্পত্তিরই একটা অংশ।

প্রাচীন স্পার্টা দেশে এমন একটা দাসত্বের রীতি প্রচলিত ছিল, যাহাতে বিলি বা বণ্টন করা সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল রাষ্ট্র। এবং ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত প্রজাদিগকে নিজ নিজ জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতাও প্রথমে প্রদত্ত হয় নাই। ইহা ছাড়া, যাহারা যত দিন খরচ জোগাইতে পারিত, তাহারা দলবদ্ধ ভাবে একত্রে আহারাদিও সমাধা করিত। বিবাহ সম্পর্কেও তেমন একটা কড়া বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু স্পার্টাবাসীরা শেষে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। তাহারা নিজ জীবদ্দশায় ইচ্ছাক্রমে নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল। এইরূপ এরিষ্টটলের পূর্ব্বেই দেশের মধ্যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছিল। কয়েকজন মাত্র ভূম্যধিকারীর হাতে দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তি আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে যতটুকুই থাকুক, শেষের ব্যবস্থায় সঙ্ঘতন্ত্রের নাম গন্ধও ছিল না।

এবার বিভিন্ন রকমের কয়েকটি সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথমে অতি প্রাচীন মানব-সমাজের বিষয় ধরিলে আমরা ইহাই লক্ষ্য করি যে, ঐ সমাজগুলি খুবই ক্ষুদ্রায়তন, পারিবারিক জীবনেরই একটু প্রসারমাত্র, কতকগুলি নিকট আত্মীয় লইয়াই গঠিত। ঠিক বলিতে গেলে এগুলি জাতীয় জীবনের বীজ ও পারিবারিক জীবনের বিকাশ ছাড়া বড় কিছু নয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে নিজ নিজ দলের মধ্যেই অবশ্য অপরাধের শাস্তি ও বিবিধ দাবী-দাওয়ার স্থাপনা একরূপে সম্পাদিত হইত। অন্তর্ভূক্ত লোকদের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারিত্ব সম্বন্ধে তেমন

একটা বিধিবদ্ধ বা নির্দ্দিষ্ট ভাবও ছিল না। তবে পার্শ্ববর্ত্তী সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে নিজের দলের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য সকলেই বদ্ধ-পরিকর থাকিত। কৃষির আদর না থাকায় তদর্থে ভূমির কোন মূল্য জন্মায় নাই। জমি হইতে কৃষিজাত পণ্য কোনরূপ ছিলনা বলিলেই চলে। তখন শ্রমবিভাগেরও বড় একটা প্রয়োজন হয় নাই। ধরিতে গেলে, সমাজ তখন বড় একটা পরিবারের মতই ছিল।

ঐরূপ সম্প্রদায়গঠনের পরযুগে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা সমাজের মধ্যে অনেক প্রকার জমিজমা,যেমন অরণ্য মাঠ প্রভৃতি, সাধারণের সম্পত্তি রূপেই পরিগণিত হইয়াছিল। অনেকস্থলে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও সাধারণের সম্পত্তিরূপেই গণ্য হইয়া আছে। মোটকথা, এই দুই প্রকার সম্প্রদায়ের মূল উৎস হইতেছে—পারিবারিক জীবন। অপর অপর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষার্থ প্রথম ধরণের সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পর যখন কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তখন ক্রমে নিজ নিজ আবাস ভূমি, চারণ ভূমি, ক্ষেতখোলা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সব ছাড়া দেশের আর যাহা কিছু, সাধারণের সম্পত্তিরূপে থাকিয়া গিয়াছে। এই সব প্রাচীন সম্প্রদায়-গঠনের আলোচনায় আমরা প্রকৃত সঙ্ঘতন্ত্র সম্বন্ধে খুব অল্প জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

এবার দ্বিতীয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকমত পরিস্ফুট রকমের সঙ্ঘ-তান্ত্রিক সমাজের কথা ধরা হইবে। এগুলি সাধারণতঃ নিজ নিজ প্রচলিত রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা মানিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যে কারণেই হোক, যখনই কতকগুলি লোক বৃহত্তর সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া একযোগে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তখনই এরূপ দলের উদ্ভব হইয়াছে। মানবের ইতিহাসে এরূপ দলের গঠন বড়

কম ঘটে নাই। কোন বিশেষ ধৰ্ম্মমত ও বৈরাগ্যগত আদর্শে জীবন-যাপনের অভিলাষ হইতেই প্রায় এরূপ সম্প্রদায় জন্মিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—বৌদ্ধ সঙ্ঘ, খৃষ্টান সঙ্ঘ ও অপরাপর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, লিডেনবাসী জনের ধর্ম্মোন্মত্ত এনাবেপ্টিষ্ট দল, নূতন আদর্শে সমাজ গঠন প্রয়াসী কেবেটের অধিনায়কত্বে টেক্সাসে কতিপয় কল্পণাপ্রবণ লোকের উপনিবেশ, শ্রমশিল্প-বিষয়ক উদ্দেশ্য লইয়া ওয়েনের সমবায় গঠন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের মধ্যে অনেকের ইতিবৃত্ত বিশেষ চিন্তাকর্ষক ও পাঠোপযোগী। পরে ইহাদের কয়েকটির বিষয়ে আরও কিছু বলা যাইতে পারে।

ইহাদের সম্বন্ধে এইটি বিশেষ লক্ষনীয় যে, এই সব সমবায়-ক্ষেত্র অপরাপর সহর বা গ্রামের মত রাষ্ট্রেরই একটা অংশমাত্র, ইহারা রাষ্ট্র-হইতে পৃথগীকৃত কোন প্রকার রাজনৈতিক সঙ্ঘ নয়। এবং এরূপ কোন রাষ্ট্র, এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, যাহা কেবল এরূপ কতকগুলি সঙ্ঘেরই সমষ্টি। বস্তুতঃ রাষ্ট্রই তাহাদের ও তাহাদের সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার লইয়া আসিয়াছে। তবে তাহারা যেমন সমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সমাজও সেইরূপ ভাবে তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া দিয়াছে। যে বৃহত্তর সমাজের ছায়ার পাশে এগুলি অবস্থিত, তাহার নিকট হইতে সঙ্ঘ পরিচালনার পদ্ধতি ইহাদের পক্ষে একেবারে কিছু না লওয়া খুবই অসম্ভব। এই জন্য তাহাদের আদর্শ ও ইতিহাস হইতে তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন ও সন্দেহাত্মক। কারণ ইহা আমাদের সর্ব্বদাই মনে হইতে থাকে, বাস্তবিক এই সব সঙ্ঘ নিজ নিজ আদর্শ পূর্ণরূপে পালন করিতে পারিয়াছে, না পার্শ্বস্থ বৃহত্তর সমাজ উহাদের নীতিগত কোন অন্যায় বা অসঙ্গতি নিজের সুনির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার প্রভাবের দ্বারা নিমন্ত্রিত করিয়া

আসিয়াছে। আবার কতকগুলি এত অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছে, যে সে গুলি পরিণত বয়সে কি ফল প্রসব করিত তাহা নির্দ্ধারণ করাই যায় না।

এবার তৃতীয় প্রকার সঙ্ঘতন্ত্রের কথা। ইহাই একেবারে খাঁটি সোসিয়ায়ালিজমের স্বরূপ। ইহা প্রচলিত সমাজকে একেবারে ওলট পালট করিয়া নিজের নীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী। কিন্তু অতীতে এরূপ আদর্শে গঠিত কোন সঙ্ঘের অভ্যুদয় ঘটে নাই। এরূপ সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারে নীরব। যেটিকে সোসিয়ালিষ্টরা এত ভীতির চক্ষে দেখে, সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি গুহাবাসী আদিম অসভ্যদের পরযুগ হইতেই মানবসমাজে এ নাগাদ চলিয়া আসিতেছে। তবু সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কথার মধ্যেই যে সোসিয়ালিজমের শক্তি ও আকর্ষণ নিহিত, সোসিয়ালিজমের পক্ষপাতিরা উহার উল্লেখ করিয়া শ্রমিক-দিগকে বলিয়া থাকেন, যদি এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ে তাহাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সমস্ত অভাব-অনাটন ঘুচিয়া সকল শ্রমিকের সৌভাগ্যের অভ্যুদয় ঘটিবেই। এই কথার বলেই জার্ম্মান পার্লামেণ্টের সভ্য মিষ্টার মষ্ট উহাদিগকে বলিতে পারেন প্রত্যেক লোকের তখন আঠার হইতে আটাশ এই দশবৎসর মাত্র কাজ করিলেই চলিবে, অবশিষ্ট জীবন সোসিয়ালিষ্টিক রাষ্ট্রের সাহায্যেই নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

এখন দেখা যাইতেছে, অন্য রকমেও সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এক, যাহা পরীক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে, অপর যাহা এখনও শুধু তত্ত্বের আকারেই রহিয়াছে। এই দুই ভাগের মধ্যে আর একটা পার্থক্য এই যে প্রথমটি কোন দার্শনিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আদর্শ হইতে উদ্ভূত এবং এই জন্য এগুলির সঙ্গে একটু গুণ ও

গৌরবও বিজড়িত। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিপ্লবকারী অপরটি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের নূতন অর্থনীতি সম্বন্ধে এতটা সাফল্যের আভাস পাওয়া যায় নাই, যাহাতে এমন ঘোর বিপ্লব ঘটান সম্ভবপর। কিন্তু যাহা পরে সম্যক্ রূপে বলা যাইতে পারিবে, সেইরূপ মতামত এখন আগে হইতে প্রকাশ না করাই ভাল। এখন যে সব সঙ্ঘতান্ত্রিক আদর্শ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদেরই ইতিহাস ও ফলাফল প্রথমে দেখা যাক। তারপর যাহা নব নব নীতির প্রচারে এখনও শুধু তত্ত্ব বা আদর্শ মাত্র রহিয়াছে, তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইবে। অবশ্য এ সব সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে তেমন বিস্তৃত আলোচনার এখানে বড় প্রয়োজন হইবে না।

২

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায়।

কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শের প্রেরনায় অতীত কালে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি ও কার্য্যাবলীর বিবরণ ইতিহাস হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই প্রকার সজ্যের অধিকাংশ সংসারবিরাগী ও ধ্যানপ্রবণ ব্যক্তিদের দ্বারাই সংগঠিত হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্যই ছিল, সমাজ হইতে এইরূপ পৃথক্ থাকিয়া কোন পারত্রিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সিদ্ধিলাভ। সময়ের ক্রম ধরিতে গেলে এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীসম্প্রদায় অপেক্ষা বিচ্ছিন্নভাবে একা একা সন্ন্যাস অবলম্বনই অবশ্য আগের কথা। একাকী বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকিয়া এরূপ সঙ্ঘ গঠনের অভিপ্রায় হইত এই যে, ইহাতে সমাজের দোষ ও দুর্নীতি হইতে পৃথক্ থাকাও চলে, অথচ কতকগুলি সমপ্রকৃতি সাধকের সংসর্গও লাভ করা যায়। এই কারণে যাঁহারা

স্বভাবতঃ সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া নিভৃত জীবন যাপনে ইচ্ছুক, অথবা যাঁহারা বিশেষ কোনরূপ ধ্যান-ধারণায় আত্মার মুক্তিকামী, অথবা যাঁহারা নিজের কর্ম্মগত ব্যর্থতায় বা অন্য প্রকারে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য ও সান্ত্বনার আশায় এইরূপ সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছেন।

এই সব সঙ্ঘ বহুল পরিমাণে সন্নাসিদের স্বাধীন সম্মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াই অবশ্য পরস্পরে মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও সঙ্ঘের মধ্যে সাধারণ মঙ্গলের জন্য যে সব নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সে সব সকলকেই পালন করিতে হইয়াছে। শরীরধারণের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, সে সব হয় অপরের নিকট হইতে ভিক্ষা দ্বারা, নয় সঙ্ঘস্থ ব্যক্তিদের নিজ নিজ পরিশ্রমেই সংগৃহীত বা উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রমিক জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় ভাবিয়া যেখানে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করা হইয়াছে, সেখানে প্রথম প্রথম জনসাধারণের উপর তেমন বেশী চাপ পড়ে নাই। কারণ যাহা না হইলে নিতান্ত চলে না, তাহারই মাত্র সংগ্রহ ছিল এই ব্রতধারীদের জীবন-যাপনের আদর্শ।

ক্রমে অনেক দেশে জনসাধারণ ইহাদের এইরূপ অসামান্য ত্যাগ ও ধর্ম্মপ্রাণতায় আকৃষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিল। ইহাদের সাহায্যকল্পে ক্রমে স্থায়ী অর্থভাণ্ডার ও বাস-গৃহের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অন্যদিকে আবার এক ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের সংযোগে একই নিয়মে পরিচালিত বৃহত্তর সঙ্ঘ গঠনের সম্ভাবনা জন্মিল।

এই সব সঙ্ঘের পরিচালনার্থ যে সকল নিয়মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে গুলি যে মানবচরিত্রের পর্য্যবেক্ষণ ও সাংসারিক

ভূয়োদর্শনের ফল, তাহা বেশ সহজেই বুঝা যায়। মানুষের মধ্যে দুইটি বৃত্তি বড় প্রবল। এক অর্থলিপ্সা, অপর ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছা বাসনার বিলোপই হোক, কিংবা একান্ত ভাবে ভাগবত যোগই হোক, কামনা জাত বিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তিই হোক, কিংবা আত্মার পরমা-শান্তিই হোক, অথবা সাধারণ সামাজিক জীবনে সুদুর্ল্লভ কোন বিশেষ সাধনার সিদ্ধিই হোক, এই সব আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের পক্ষে মানুষের ঐ দুইটি বৃত্তি বড়ই অন্তরায়। সুতরাং উহাদের দমন, এমন কি সম্ভব হয়ত বিনাশসাধনই একান্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণ সংসারজীবনে মানুষ যে উহাদেরই ক্রীতদাস হইয়া পড়ে, সেই কারণে এখানে যে সব সঙ্ঘের উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাদের সকলের মধেই পবিত্রতা ও দারিদ্র্য সম্বন্ধীয় ব্রতনিয়মাদি অবশ্য পালনীয় বলিয়া লক্ষিত হয়। এমন কি— যেখানে সঙ্ঘতান্ত্রিক ভাবে জীবন যাপিত হয় না, সেইরূপ সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষ যাজকদের মধ্যেও ঐ ব্রতনিয়মাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। সর্ব্বত্রই না হোক, সাধারণতঃ নিজেদের মধ্যে নির্ব্বাচিত একজন অধিনায়কের আদেশ মানিয়া চলাও এই সব সঙ্ঘের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘ প্রাচীনতম। নিভৃতে সাধনার সময়ে বহু ভিক্ষু সন্ন্যাসী গৌতমের সন্নিধানে একত্র হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই ঐ সঙ্ঘের সূচনা। প্রথমে ইহাদের কৌপিন কমণ্ডলু ও আর দুই একটা সামান্য জিনিশ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই খৃষ্টান মঠবাসীদের মত এই সম্প্রদায়ও নানা ব্যক্তিগত দান হইতে ভূমিসম্পত্তি, বাসস্থান ও পুস্তকাদির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। পবিত্রতা ও দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের ব্রতনিয়মাদি ইহাদের ভিতর বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পবিত্রতার নিয়ম এতটা কড়া রকমে পালন করা হইত

যে, অতি নিকট আত্মীয়াকে স্পর্শমাত্র করাও দোষ বলিয়া গণ্য ছিল। অধিনায়কের আদেশ পালনও এই সঙ্ঘের লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত আদেশ রূপে নয়, সঙ্ঘের নিয়ম বলিয়াই পালিত হইত। যখন কোন প্রতিজ্ঞা বা ব্রতের লঙ্ঘন ঘটিত, তখন কখনও বা লঙ্ঘন-কারিকে একেবারে সঙ্ঘ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত, কখনও বা ক্রটি স্বীকার করিলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত মাত্রই বিধান করা হইত। এইরূপ অভিযোগ কোনও ভিক্ষুর বিরুদ্ধে হইলে সঙ্ঘস্থ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু প্রচলিত নিয়মাদির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধনে কিংবা নিতান্ত নূতন ব্রতধারীর উপরেও ব্যক্তিগত আদেশ প্রদানে কাহারও কোনও অধিকার ছিল না।

ভারতবাসির মনে জন্মান্তর বাদের যে বিশ্বাস গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহা হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও সাফল্য। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারেই পরজন্ম নির্ণীত হয়, আবার সর্ব্বপ্রকার জন্মই মিথ্যা মায়া সম্ভূত। এই মিথ্যা মায়া হইতে মুক্তিই চরমমঙ্গল। বাসনার নিবৃত্তি হইলেই এই মুক্তিলাভ ঘটে। ধ্যান ও আত্মত্যাগই ঐ নিবৃত্তি সাধনের উপায়। নিবৃত্তি সাধিত হইলে আর জন্মের সম্ভাবনা নাই; মায়িক জীবন প্রবাহের ঐখানেই অবসান। লোকসংখ্যায় যাহা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয়, তাহার প্রচারের মূলে ছিল কয়েকদল দরিদ্র ও ধ্যানরত ভিক্ষুমাত্র। ইহা হয়ত অনেকের কাছে কিছু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহার এরূপ সাফল্যের কারণও অনেকটা ধরা যায়। প্রথম কারণ অবশ্য এই ধর্ম্মের বিশিষ্ট মতটি। এই মতানুসারে সাধক কি লাভ করিতে পারে? মায়ময় দুঃখপূর্ণ এই সংসার। ইহার হাত হইতে কে না নিষ্কৃতি চায়? বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই মুক্তির উপায়

প্রচার করিল। প্রচারিত হইল, এই ধর্ম্ম সাধন কর, আর জন্মে এ কর্ম্ম ভোগ ভুগিতে হইবে না। মহানির্ব্বাণের মাঝে সকল জ্বালার নিবৃত্তি ঘটিবে। দ্বিতীয় কারণ সমাজ নীতি, জাতিভেদের পার্থক্য ঘুচাইয়া সাম্যের উপর সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা। ইহার অর্থ ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বন্ধনচ্ছেদ। ইহা ছাড়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মের করুণ ও কল্যাণকর নীতিমালাকেও অন্যতম কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভারতে যখন এই ধর্ম্মের শৈশব অবস্থা মাত্র, তখনই বর্ণ বৈষম্যের উচ্ছেদে ইহার কুক্ষিমধ্যে সকলকেই আশ্রয় দিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এবং সাম্যগত স্বাধীনতা ও পূর্ব্বোক্ত অপরাপর কারণে ভিন্ন দেশের অন্যান্য জাতির মধ্যেও ইহার প্রচার সহজ হইয়া পড়িল। ভিক্ষুসম্প্রদায়ই এই প্রচারের কাজ করিয়াছিলেন। ইহারা বিশেষ কোন জাতি বা যাজকের দল নয়, একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী মাত্র। মূলে এই ভিক্ষুমণ্ডলীই একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে কেবল মাত্র এইরূপ সন্ন্যাসিমণ্ডলীর বহুল বিস্তার অসম্ভব। কারণ স্বভাবের নির্দ্দেশ ক্রমে সংসারের অধিকাংশ লোকই কর্ম্মগত ও পারিবারিক জীবনযাপনেই উৎসুক। কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মকেও ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইল। বৌদ্ধ নীতি মানা ও জাতিভেদ না মানা এইটাই হইল গৃহিদের কথা, ভিক্ষুদের নিয়মাদি ইহাদের উপর চাপান হইল না। এখানে ইহাও একটু উল্লেখযোগ্য যে, যখন ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইল, তখন যে সাধারণ জনসমূহ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা আবার পূর্ব্বপ্রচলিত সংস্কারে অনেকাংশে আগেকার দেবতা ও উপদেবতার পূজক হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ ঘটা বিচিত্র ছিল না। কারণ এই সব দেবতার সঙ্গে

উহার পূজকদের একটা প্রকৃতিগত ও জীবনগত বেশ সাদৃশ্য ছিল। অপর পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল নিরীশ্বর, অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মে যে ভাবে ঈশ্বরাদি মানা হয়, বৌদ্ধেরা সে ভাবে ঈশ্বর বা প্রার্থনা মানিতেন না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিরা ক্রমে বাসগৃহাদি লাভ করিয়া পরস্পরে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ দৃঢ় রকমে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বহু চেষ্টার পর তিব্বতে ইঁহারা ক্রমে একটা ধারাবাহিক সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন। নানা প্রকারে ইঁহাদের লোক বল ও অর্থবলও ঘটিল। রোমান ক্যাথলিক যাজকদের পোপের মত দালাই লামা নামধারী একজন অধিনায়কও খাঁড়া হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধদের অবতার স্বরূপ বলিয়া অতি অভ্রান্ত গুরুরূপে ইঁহারা বরণীয় হইয়া উঠিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলবাদসাহের নিকট হইতে তৎকালীন দালাইলামা তাঁহার শাসিত জনসমূহের উপর রাজকীয় ক্ষমতা চালনার অধিকারও প্রাপ্ত হইলেন। চীনের রাজশক্তির অধীনে এই বৌদ্ধ গুরুর ভাগ্যের অনেক বৈচিত্র্যও সংঘটিত হইয়াছে।

এবার আর একটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হইবে। সংখ্যায় ইঁহারা অবশ্য খুবই কম। কিন্তু তাহা হইলেও নানা ভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের নাম এসেনেস্ (Essenes) সম্প্রদায়। খৃষ্ট জন্মাইবার বহু পূর্ব্বে ইঁহারা জুড়িয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহুদী ফিলো ও জোসেফাসের গ্রন্থ হইতে ইহাদের বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইহাদের উৎপত্তি, ধর্ম্মমত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে বড় কিছু এখানে বলা হইবে না। শুধু এইটুকু মাত্র উল্লেখ যথেষ্ট যে ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর পারসিক ধর্ম্মের প্রভাব কিছু ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় মতের সহিত উহার কোন প্রকার যোগচিহ্ন লক্ষিত হয় না।

ফিলোর মতে এই 'এসেনেস্' সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় চতুঃসহস্র। ইহারা নগর অপেক্ষা গ্রামেই বেশী বাস করিতেন। কারণ নগরে পাপাচারের মাত্রা বেশী। প্লিনিও ইঁহাদের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, মরু সাগরের পশ্চিম উপকুলের সন্নিধানে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল। কিন্তু মনে হয়, ইঁহারা একত্রে একস্থলে থাকিতেন না, ছোট ছোট দলে পরস্পর হইতে দূরে দূরেই বাস করিতেন। সকল বিশেষজ্ঞেরই এই মত, যে ইঁহাদের ভিতর সম্পত্তির সহাধিকারিতা ছিল, সঙ্ঘস্থ প্রত্যেকের শ্রমজাত দ্রব্য সকলের মধ্যে বণ্টন করা হইত। কিন্তু বিভিন্ন সঙ্ঘের মধ্যে তেমন কোন ঐক্যের বন্ধন কিছু ছিল না। জোসেফাসের বর্ণনায় প্রত্যেক দলের একজন কোষাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক সঙ্ঘস্থ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা যে একজন অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইতেন, ইহাও জানা যায়। ইঁহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। বিবাহিত বা পারিবারিক জীবন দূষনীয়, এই কারণে যে ইঁহাদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান ও উত্তাধিকারিত্ব উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নয়। জোসেফাস বলেন, নারী জাতির আচরণের প্রতি অবিশ্বাসই ইঁহাদের এই পরিণয়-পরাঙ্মুখতার মূল। এই জন্য চারিদিক হইতে বালক সংগ্রহ করিয়া নিজেদের শিক্ষাদীক্ষায় তাহাদের প্রতিপালনের দ্বারাই ইঁহারা নিজেদের দলপুষ্টি করিতেন। উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে এই এসেনেস্‌দের মধ্যে এমন একটি দল ছিল, যাঁহাদের সহিত অবশিষ্টদের অপর বিষয়ে কোন মতভেদ ছিলনা বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজেদের মধ্যে বিবাহ প্রথার অনুমোদন করিতেন। ইঁহারা বলিতেন, বিবাহ না করিলে বংশের ধারাবাহিকতা থাকে না, এবং ঐ ধারা রক্ষা করা মনুষ্যজীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্য নাকি তাঁহারা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে মনোনীত

পত্নীর মাতৃত্বের সম্ভাবনা আছে কি না, সে সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া নানা লক্ষণাদি দেখিয়া তবে তাঁহাকে বিবাহ করিতেন।

ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এসেনেস্‌দের বিশেষত্ব এই ছিল যে তাঁহারা স্যাবাথ বা রবিবারের প্রতি খুব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। মন্দিরে অর্ঘ্য পাঠাইতেন বটে, কিন্তু সেখানে কোন বলি দিতেন না। সূর্য্যের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি প্রায় পৌত্তলিকতার কাছে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহাদের ভবিষ্যদ বক্তা ছিলেন, যাদুবিদ্যারও চর্চ্চা তাঁহারা করিতেন। স্নানক্রিয়ায় তাঁহাদের বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষিত হইত। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ভিতর কোন প্রকার ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল না; শান্তভাবেই তাঁহারা ধ্যান ধারণায় জীবন-যাপন করিতেন। নিজেদের সঙ্ঘের মধ্যে নিজেরাই নিজেদের ধর্ম্মপালনে যত্নবান্ থাকিতেন, অপরের কাছে নিজেদের ধর্ম্মপ্রচারে তেমন উৎসুক ছিলেন না। এইরূপে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে নিজেরা আবদ্ধ থাকিলেও বাহিরের অতিথির প্রতি তাঁহাদের আদর যত্ন যথেষ্ট ছিল। ইঁহাদের এই সব বিশেষত্ব দেখিলে মার্কিন্ যুক্তরাজ্যের শেকার (Shaker) সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে। কেবল গুণের বিষয়ে নয়, ফিলো এসেননেস্‌দের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে সংখ্যাতেও এই দুইটি সম্প্রদায় তুলনীয়।

এই এসেনেস্‌দের সহিত থেরাপিউটি (Therapeutics) সম্প্রদায়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। ফিলো বলেন, এই সম্প্রদায় মিশর দেশের সকল বিভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহারা নিশ্চয়ই ইহুদী ছাড়া আর কোন জাতি নন। ইঁহাদের মধ্যে প্লেটোর প্রভাব অনেকটা ছিল। এবং স্বয়ং ফিলোর মতে ইঁহাদের উপর কতকাংশে প্রাচ্য দর্শনেরও প্রভাব লক্ষিত হয়। ফিলোর নিবন্ধে এলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার নিকট ইঁহাদের একটি উপনিবেশের বর্ণনা আছে। এই উপনিবেশে স্ত্রী ও

পুরুষ উভয়েই বাস করিতেন। ভিন্ন প্রকৃতি লোকের ক্ষতিকর সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার মানসে ইঁহারা আত্মীয়স্বজন ও বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ইঁহাদের বাসগৃহগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সমাবিষ্ট ছিল। তাহা হইলেও সেগুলি পরস্পরে এতটা নিকটবর্ত্তী থাকিত, যাহাতে সকলে মিলিয়া দস্যুতস্করকে বাধা দেওয়া চলে। সূর্য্যোদয়কালীন প্রার্থনা হইতে সূর্য্যাস্তের প্রার্থনা পর্য্যন্ত সমগ্র দিবাভাগটি তাঁহারা হয় ধ্যানে, নয় প্রাচীন গ্রন্থপাঠে, নয় ভবিষ্যদ্-বক্তাদের বাণী শ্রবণে, অথবা ঐরূপ আর কোনও কাজে যাপন করিতেন। ইঁহাদের আহার্য্য ছিল রুটি ও লবণ। ইঁহারা ক্রীতদাস রাখিতেন না, কারণ এরূপ দাস রাখা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রত্যেক বাড়ীতেই এক একটি পূজা স্থান ছিল। সপ্তাহের ছয়দিন তাঁহারা নিজ নিজ পূজাস্থানে ঐরূপভাবে কাল কাটাইতেন। কিন্তু রবিবারে তাঁহারা একটি বড় ঘরে একত্র হইতেন। স্ত্রীলোকদিগকে দৃষ্টির বহির্ভূত রাখিবার জন্য এই ঘরের লম্বাদিকে একটা নীচু রকমের প্রাচীর তোলা থাকিত। ধর্ম্মসঙ্গীত গান করাই ছিল তাঁহাদের এই সাধারণ উপাসনার প্রধান ভঙ্গী। একজন একটি গান ধরিতেন এবং এই গানের ধুয়ার অংশে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যোগ দিতেন। ইহুদী মন্দিরে স্থাপিত কাষ্ঠমঞ্চে রাখা রুটি লবণাদির অনুকরণে ইঁহাদেরও উপাসনাগৃহে কাষ্ঠমঞ্চের উপর রুটি লবণাদি স্থাপিত হইত এবং ইঁহারা সকলে তাহা গ্রহণ করিতেন। তাহার পর লোহিত সাগরস্থ পথের স্মৃতি রক্ষার্থ রাত্রি জাগরণের ব্রত পালন করা হইত। আবার ধর্ম্মসঙ্গীত চলিত, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ প্রথমে পৃথক ভাবে পরে একসঙ্গে যোগ দিতেন। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিত। প্রভাতে সকলে যুক্তকরে ঋদ্ধি, সত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান-দৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিয়া যে যাঁহার গৃহে প্রস্থান করিতেন।

বিবাহ প্রথা ইহাদের মধ্যে ছিল না। সকলকেই কঠোর বৈরাগ্য-প্রধান জীবন যাপন করিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা যে সঙ্ঘের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই স্থান দিয়াছিল, এবিষয়ে এসেনেস্‌দের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য। এই সঙ্ঘের মধ্যে শ্রমশিল্প বা কৃষির কার্য্য হইত কিনা, সে সম্বন্ধে ফিলো কিছু উল্লেখ করেন নাই। যে কারণে এসেনেস্ দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাদের সম্প্রদায়ও যে সেই একই কারণ সম্ভূত, ইহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদের উৎপত্তির কাল বিশেষ জানা নাই। তবে ফিলোর বর্ণনা হইতে যতদূর বোঝা যায় তাহাতে মনে হয় ইহাদের অভ্যুদয় খৃষ্টের বহু পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল।

এপর্য্যন্ত যে সব সঙ্ঘের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, সেগুলি একান্তভাবে কোন বিশেষ ধর্ম্মগত বা আদর্শ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিই প্রচলিত রাষ্ট্রের প্রতিকুলে দাঁড়ায় নাই। কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ইহাদের ছিলনা। পরবর্ত্তী দৃষ্টান্ত আরও কিছু বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূমে পুরাতন ধর্ম্মগুলীর মধ্যে যেভাবে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, ধরিতে গেলে উহা খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়রূপে গণ্য। সভ্যতায় উন্নত খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে ইহা অবশ্য উদ্ভূত হয় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহার জীবনী শক্তির দৃঢ়তা এবং ইহা যে ভাল ও মন্দ উভয়েরই বিস্তৃত আকর-স্বরূপ হইয়াছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পোপদের অধীন রোমীয় চার্চ্চের মত এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানও আপাত মঙ্গলকর ও নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হওয়ায়, এমন কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে যেগুলির সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনপ্রকার যোগই দেখা যায় না। এই সকল ভ্রান্ত ধর্ম্মমত প্রাচীন কালের অনুন্নত চিন্তার সহিত খাপ খাইলেও সেগুলি হইতে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সব

এখনও কতকাংশে বিদ্যমান আছে। এই সব প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেও, এখনও অনেক ধ্বংসোন্মুখ মণ্ডলীর মধ্যে খুব বেশী না হোক, কতকটা শক্তিশালী রহিয়াছে।

সম্পত্তির সহাধিকারিতা এইরূপ সকলপ্রকার কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে যে সহাধিকারিতা প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেই পরবর্ত্তী মঠধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, এই কথার উত্তরে কি বলা যাইতে পারে? প্রথমতঃ ইহা বলা যায়, যে ঐ প্রাচীন মণ্ডলী কখনও একটা সুনির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়রূপে বিদ্যমান ছিল না, নিয়তই ইহার সভ্য সংখ্যার পরিবর্ত্তন ঘটিত। একই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস ছাড়া এই মণ্ডলীর মধ্যে সকলের পালনীয় কোনপ্রকার নিয়ম-কানুন বা ব্রতাদির প্রচলন ছিলনা। এতদ্ভিন্ন সম্পত্তির সহাধিকারিতার বিষয়টিও ছিল নিতান্ত স্বেচ্ছামূলক। এরূপ সহাধিকারিতার স্বপক্ষে সাধারণ জনমত খুব প্রবল থাকিলেও, দরিদ্রের ভরণের জন্য কাহাকেও নিজ সম্পত্তির বিক্রয়ে বাধ্য করা হইত না। আবার ঐ সহাধিকারিতার ব্যবস্থাও ছিল স্থানীয়। এক জেরুসালেম ছাড়া এ ব্যবস্থা যে অন্যত্র কোথাও প্রচলিত ছিল, এরূপ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। হিব্রু খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছিল। টিমথীর (Timothy) প্রতি পলের (Paul) লেখার মধ্যেই আছে—"তোমাদের ভিতর যাহারা ধনী তাহাদেরই উপর এই ভার অর্পণ করা হোক।" জেরুসালেমের দরিদ্রের ভরণের জন্য বাহিরের খৃষ্টানরা যে দান প্রেরণ করিত, তাহাতে তাহাদিগকে বেশ সঙ্গতিপন্ন বলিয়াই মনে হয়। শেষ কথা, ঐ সহাধিকারিতার ব্যবস্থা স্থায়ী ভাবে, না কিয়ৎকালের জন্য মাত্রই ছিল? সময়ে এই সাধারণ ভাণ্ডারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির

উৎসর্গের ব্যবস্থা ক্রমে বর্ত্তমানের জনহিতমূলক দাতব্যের আকারই ধারণ করিয়াছিল। অবিবাহিত জীবন যাপন করাটাও এই প্রাচীন ধর্ম্মমণ্ডলীর বিশেষ একটা লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হয় না। পল (Paul) অবিবাহিত ছিলেন বটে, কিন্তু পিটার (Peter) বা অপরাপর প্রচারকদের মত, যদি ভাল বুঝেন, তবে তাঁহারও বিবাহ করিবার অধিকার আছে, এ কথাও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। করিন্থবাসী খৃষ্টানদিগকে তাহাদের দুহিতাদের জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে পল উপদেশ দিয়াছেন বটে ; কিন্তু এই উপদেশ অন্ততঃ কতকাংশে সেই সময়ের সমাজিক দুরবস্থার কারণেই প্রদত্ত হইয়াছিল। অপরস্থলে, সকল স্ত্রীলোকদের, এমন কি বালবিধবাদের, পর্য্যন্ত বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। বিবাহ অনুষ্ঠানকে হেয় বলা দূরে থাক, পল খৃষ্ট ও ধর্ম্ম-মণ্ডলীর (Churchএর) যোগকে দম্পতির যোগের সহিতই তুলনা করিয়াছেন। তবে নিউ টেষ্টামেণ্টের একস্থলে অবশ্য এরূপ লেখা আছে, যাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যাহারা স্বর্গরাজ্যের প্রেরণায় জীবন যাপন করিতে প্রয়াসী, তাহাদের পক্ষে অবিবাহিত থাকাটা শুধু অনুমত নয়, পরন্তু প্রশংসার যোগ্য। আর এক স্থলে ঐকান্তিক পবিত্রতার খুবই প্রশংসা আছে। কিন্তু তাহাতে অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত জীবন নিতান্ত নিকৃষ্ট,এমন কিছু বুঝায় না। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও এমন কোন ব্রত নিয়মাদির সমর্থন দৃষ্ট হয় না, যাহা মণ্ডলীর মধ্যে এরূপ সন্ন্যাসিসঙ্ঘ সৃষ্টির অনুকূল। বাস্তবিক নিউ টেষ্টামেণ্টের উপদেশ ও উপাসনার রীতি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘ গঠনের অনুমোদন করে নাই। বিশ্বাসিগণ এক গুরুর শিষ্য ভ্রাতৃমণ্ডলীর মত একত্র হইবেন, ইহাই মাত্র তাহাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায়। সকলেই সমান, এমন কোন ব্যক্তি বা দল বা শ্রেণী থাকিতে

পারে না, যাহারা বিশেষ পবিত্রতার দাবীতে অপর সহধর্ম্মিদের হইয়া পূজা প্রার্থনাদি করিতে পারেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা যে সামাজিক ব্যাপারে অপর লোকের মতই জীবন যাপন যাপন করিত, ইহা দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত পত্রাবলী হইতে বেশই বুঝা যায়। ইহাতে আছে, খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা কি ভাষা কথনে, কি বাসগৃহ নির্ম্মাণে, কি জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে, অপর লোক হইতে কিছুই বিভিন্ন নয়। কারণ কোথাও তাহারা নিজেদের সংস্থাপিত কোন নগরে বাস করে না, তাহাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিশেষ ভাষারও প্রচলন নাই। কোন প্রকারে অপর লোক হইতে তাহারা কোন একটা বিশিষ্ট জীবন যাপন করে না।

বৈরাগী ও সন্ন্যাসী এসেনেস্ সম্প্রদায় যেমন ইহুদী ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হয় নাই, তেমনই খৃষ্টীয় ধর্ম্মকেও মঠধারী সন্ন্যাসিদের উদ্ভব-ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। সেই যুগে লোকের বিশ্বাসই ছিল, ধ্যানরত নির্জ্জন জীবনই সত্য ও সদ্‌গুণ লাভের উপায়। এই ধারণা খৃষ্টীয় যুগের কিছু পূর্ব্বে কতকগুলি গ্রীক দার্শনিকের দ্বারা প্রাচ্য ভূমি-হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহাই এই সব সঙ্ঘ সৃষ্টির মূল। মিশর দেশে কি ভাবে এই বৈরাগ্যপ্রবণতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার অভাস আমরা থেরাপিউটিদের আলোচনায় কতক পাইয়াছি। এই মিশর দেশেই ইহুদী ফিলো পুরাতন টেষ্টামেণ্টের ঐতিহাসিক অংশ গুলির একটা রূপকাত্মক রহস্যপূর্ণ অর্থ করিয়াছেন। এখানেই প্রথমে খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিরা নগর ছাড়িয়া নির্জ্জনে ধ্যানরত ও সংসারবিরাগী জীবন যাপনের পথ দেখাইয়াছেন। তৃতীয় শতাব্দীতে এণ্টনী (Anthony) এ বিষয়ের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। খৃষ্টীয় সাধক বলিয়া সে সময় তাঁহার খ্যাতি এমন প্রচারিত হইয়াছিল, যে অপর অনেক খৃষ্টান তাঁহার সংসর্গ ও উপদেশ লাভের নিমিত্ত স্থায়ী ভাবে তাঁহার সন্নিধানে বাস

করিতে প্রবৃত্ত হন। এইখানেই বৌদ্ধ ইতিহাসের পুনরভিনয় হইল। কারণ চতুর্থ শতাব্দীতে পেকোমিয়াস (Pachomius) এই নির্জ্জন স্থানবাসী সন্ন্যাসিদের ভিতর একটি উন্নততর জীবনযাত্রায় প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। ইনি পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন। সম্ভবতঃ তজ্জন্য সংঙ্ঘগঠন বিষয়ে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিরা অনেকে একত্র বাস করিতেন মাত্র। সমান ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অপর কোন ঐক্যের যোগ ছিল না। ইনিই প্রথমে তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার একটা প্রণালী স্থির করেন। এই প্রণালী অনুসারে সঙ্ঘের সকলকেই কিয়ৎকাল শিক্ষানবিশরূপে থাকিয়া পরে কতকগুলি ব্রতাদি গ্রহণ পূর্ব্বক একজন অধিনায়কের বশ্যতায় চলিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। সাধারণ পরিশ্রম জাত দ্রব্যে সকলের ভরণপোষণ হইবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। নীল নদীর একটি দ্বীপে তাঁহার এই সন্ন্যাসী দলের সংখ্যা তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সাত হাজার জন দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। পঞ্চম শতাব্দীতে ইহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার জন পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ক্রমে নানাস্থানে মঠের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, সম্প্রদায়েরও আয়তন তত বৃদ্ধি পাইল। প্রথম দলের অধ্যক্ষ সকলের আধিনায়ক হইলেন; সকল অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট পরিষদে মিলিত হইয়া সঙ্ঘের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পেকোমিয়োসের জীবদ্দশাতেই সন্ন্যাসিনীদের জন্যও মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই খৃষ্টীয় মঠের যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহা সবই প্রায় বিকাশ পাইয়াছিল,—অর্থাৎ নানা শাখাসঙ্ঘের বিস্তার, স্ত্রী পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মঠ স্থাপন, ব্রতনিয়মাদির প্রবর্ত্তন। সংক্ষেপেতঃ এ সম্বন্ধে একটা বিধিবদ্ধ শাসন ও গঠন কার্য্য সম্পাদিত হইতে বড় কিছু বাকি থাকে নাই।

কেমন করিয়া এই বিধিবদ্ধ সঙ্ঘ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এই সব ধর্ম্মালয় পরে কত বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল, এখান হইতে কত জ্ঞানের প্রচার, কত দীনের পালন ঘটিয়াছিল, এখানতার খ্যাতনামা অধ্যক্ষদের সাহিত্যচর্চ্চা, এখানকার ধর্ম্মজীবনের আলোক দ্বারা ভিক্ষামাত্র উপজীবী প্রচারক শ্রেণীর আবির্ভাব, আবার সাংসারিক সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি চালিত জেস্যুইটদের অভ্যুদয়, মঠধারী সন্ন্যাসিদের দ্বারা পোপের ধর্ম্ম প্রণালীর সমর্থন—এসব সম্বন্ধে কোনও আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিক জীবনের কতকটা যোগ আছে, এইটুকু মাত্র দেখিয়াই ক্ষান্ত রহিব।

পূর্ব্বের মত পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া সন্ন্যাসিরা এইরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতে কি সুফল হইয়াছিল, এইবার তাহাই একটু বুঝিয়া দেখা যাক। আমাদের মনে হয়, এরূপ সঙ্ঘের সৃষ্টি না হইলে সন্ন্যাসিদের ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবনে ধর্ম্মের বিকৃতি আরও বেশী সংঘটিত হইত। নির্জ্জন স্থানবাসী এক একজন সন্ন্যাসী নানা কাল্পনিক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেন। এক সঙ্গে অনেকে বাস করায় যে সব প্রলোভন এড়ান সম্ভব হইয়াছিল, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত জীবনে সেগুলি অবশ্য খুবই প্রবল হইয়াই দাঁড়াইত। এইরূপ বিচ্ছিন্ন জীবনে গর্ব্ব ও আত্মম্ভরিতা যে অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার উপর এই সন্ন্যাসিরা যদি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তবে নির্জ্জন স্থানে বাস হেতু নিজের শ্রমের উপর নির্ভরতার সুফলটুকুও নষ্ট হইয়া যাইত। যদি সমগ্র লোকসংখ্যার হিসাবে শতকরা দুই বা একজন মাত্রও ধরা যায়, তাহা হইলেও ইহাদের পোষণ করিতে গেলে, নির্দ্দিষ্ট স্থানীয় সামজিকদের দশা সম্ভবতঃ আরও খারাপ হইয়া

পড়িত। এই ভিক্ষুক সন্ন্যাসিরা লোকসমাজের সহিত মেলামেশা করিলে, তাঁহাদের পবিত্র জীবনের গৌরবের সম্মুখে, স্থানীয় যাজকদের প্রভাব খুবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। অথবা ইঁহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততা বা অন্যবিধ বিসদৃশ বিশেষত্বের বাড়াবাড়িতে ইঁহারা ধর্ম্মকে হয়ত হেয় করিয়া তুলিতেন। কিন্তু মঠে মঠে এই সন্ন্যাসিরা অনেকে একত্রে বাস করাতে ঐ সব কুফল ফলিতে পারে নাই। পরস্পরের সংসর্গে ও সান্নিধ্যে তাঁহাদের বক্তিগত খেয়াল ও যথেচ্ছাচারিতাও অনেকটা দমিত ছিল; মানসিক স্বাস্থ্যও অনেকটা সুরক্ষিত থাকিত। ইহাতে তাঁহারা লোক চক্ষুর সম্মুখে অবশ্যই উৎকৃষ্টতর আদর্শরূপে খাড়া হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মোটের উপর বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসিদের অপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসিদের প্রভাব সুফলপ্রসূই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। কারণ একাকী একজন সন্ন্যাসী নিজের ব্যক্তিগত ধারণার উপরই চলে। অপরের সংসর্গে তখন এই ধারনার আর কোনরূপ সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই তাহা কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইবারই কথা। একজন সন্ন্যাসির বৈরাগ্যমূলক ত্যাগ জনসাধারণ আকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময় উহা এত উৎকট আকারে দেখা দিয়া থাকে, যাহা সাংসারিক লোকের নিকট একেবারেই অননুকরণীয় থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে সঙ্ঘস্থ প্রত্যেক সন্ন্যাসী শুধু ব্যক্তিগত নয়, এমন একটি সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত প্রভাব বহন করেন, যে সম্প্রদায়কে লোকে জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও পবিত্র বলিয়া জানে। ইহা ছাড়া সঙ্ঘস্থ সন্ন্যাসির যতটা লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব, একজন বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসির ততটা না থাকিবারই কথা। তাই একজন সঙ্ঘস্থ সন্ন্যাসির দৃষ্টান্ত ও উপদেশ এইরূপ আকারেই দেখা দিবে যাহাতে সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে ও অনুসরণ

করিতে পারে। এই খৃষ্টীয় সঙ্ঘ হইতে যখন অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি, কতিপয় পোপ, এমন কি কতকগুলি কৌশলী মীমাংসক ও রাজনৈতিক কার্য্যাধ্যক্ষের পর্য্যন্ত আবির্ভাব দেখি, তখন ইহাদের লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, সঙ্ঘের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসিদের জীবন নবাগতদের চরিত্র গঠনের খুবই সহায়তা করে। ইহা ছাড়া, ইহারা পরস্পরেও নিজেদের দোষগুণের উপর নজর রাখে। সঙ্ঘস্থ সকলেই অবশ্য নিজেদের সঙ্ঘের উন্নতিকামী হইয়া থাকে। তবে নিজ নিজ সঙ্ঘের সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় রাখার ইচ্ছাটা অনেক সময়ে অবশ্য অমিশ্র মঙ্গল বলিয়া ধরা যায় না। বিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসির উপর পারিবারিক জীবনের কোন প্রভাব যেমন পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তেমনই তাহার মধ্যে সঙ্ঘগত প্রতিযোগিতার ভাবও কিছু দেখা দিবার কথা নাই।

কিন্তু সংঙ্ঘগত জীবন অনেকটা পারিবারিক ভাবের পোষণ করে। সঙ্ঘের যিনি অধ্যক্ষ, তিনি অনেকাংশে সকলের পিতৃস্থানীয় এবং মঠাধ্যক্ষের উপাধি এবট্ (Abbot), প্রাইয়র (Prior) প্রভৃতি শব্দের ধাতুগত অর্থও তাহাই। অপর সন্ন্যাসিরা পরস্পরে ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ। গৃহের মত সঙ্ঘেও তাহাদের সকলেরই সমান অধিকার। অর্থগত ও রাজনীতিগত প্রভাবে, ও অনেক স্থলে সাহিত্যচর্চ্চার প্রবলতায়, অনেক সঙ্ঘই নিজ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিল। একটা চিরস্থায়ী সংশোধনকারী শক্তির অভাবই অবশ্য এই সব বিকৃতির মূল কারণ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সামাজিকতার বিশেষত্বের গুণে ইহা জনসাধারণের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছে।

এবার কতকগুলি আধুনিক সঙ্ঘের আলোচনা করা যাইবে। তৎপরে দার্শনিকদের আদর্শগত সঙ্ঘের বিষয় বিবেচ্য।

বিপুলায়তন সমাজ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ে শাসননীতি কিছু বেশী উগ্র হইবারই কথা। যদি আমরা স্বজাতি প্রিয়তার বা ধর্ম্মোন্মত্তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে চাই, তবে আমাদের প্রথমটির জন্য গ্রীসীয় নাগরিক রাষ্ট্র-সমূহ ও মধ্য যুগের ইটালীর দিকে, এবং অপরটির জন্য বিকৃত ধর্ম্ম ভাবের প্রেরণায় যে সব সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদের দিকে নজর দিতে হইবে। মনষ্টারের (Munster) এনাব্যাপটিষ্ট (Anabaptist) দল এইরূপ একটি শাসন নিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘ। ইহাদের বিবরণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারের একটি বিশেষ অধ্যায়। যে সব কারণ হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক।

বহুদিন হইতে প্রচলিত কতকগুলি রহস্যপূর্ণ ধর্ম্মমতই ইহার আদি মূল। শিশু-দীক্ষা প্রভৃতি খৃষ্টীয় অনুষ্ঠানের অসারতা প্রতিপাদক একটা বিপ্লবের ভাব ঐ আদি মূলের সহিত সংযুক্ত হইয়া এনাব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সব দলের প্রবণতা ছিল একটা বিকৃত আধ্যাত্মিকতার অভিমুখে। ধরিতে গেলে, এগুলির ভাব যেন পূর্ব্বতন ইহুদী আদর্শের পুনরাবর্ত্তন। সাক্সনীর (Saxony) অন্তর্গত জুইকাউর (Zwickau) যাজক টমাস মুন্জার তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে থুরিঞ্জিয়ার (Thuringia) অন্তর্গত এলষ্টেডে (Alstedt) গিয়া আবার সেখানকার যাজকত্ব প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি শিশু-দীক্ষা প্রভৃতি অনুষ্ঠান বজায় রাখিতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁহার অশান্ত আচরণে তিনি লুথার (Luther) ও রাজকীয় শাসনকর্ত্তার অপ্রিয় হইয়া উঠেন। ফলে তাঁহাকে সেস্থান হইতে শীঘ্রই আবার সরিতে হয়। এখানে সাক্সনীর ডিউকের সম্মুখে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে যাহারা অধার্ম্মিক নির্দ্দয় ভাবে তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে রাজপুরুষদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে

বলেন। তাঁহার মতে ভগবানের বিশেষ চিহ্নিতদের অনুমতি ব্যতীত এসব অধার্ম্মিকদের বাঁচিবার কোনই দাবী নাই।

মুনজার এলেষ্টেড্ ছাড়িয়া দক্ষিণ জার্ম্মানীরা নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু সাক্সনীর অধিকার ভুক্ত মূলহসেনই (Muhlhausen) তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই স্থানের লোকেরা পূর্ব্বের যাজকদিগকে তাড়াইয়া তাঁহাকেই সেই পদে বরণ করে এবং তাঁহারই উপদেশে নগরের শাসন ব্যাপারে নানা বিপ্লব ঘটায়। অনতিবিলম্বে কৃষকদের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, এবং মূলহসেনের সর্ব্বত্র তাহা ছড়াইয়া পড়ে। মুনজার এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় বন্দী হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুনজারের রহস্যপূর্ণ ধর্ম্মমত ছিল এই যে, ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ যোগ সংঘটিত হইত। সেই কারণে ধর্ম্ম পুস্তকের লেখা কথা তিনি তেমন গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার মতে দীক্ষার্থ জলাভিষেক কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় নয়, এবং শিশু-দীক্ষা ঈশ্বরের অনুমোদিত নয়। অন্যদিকে কিন্তু তিনি বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কারণেই অধার্ম্মিকদের একান্ত উচ্ছেদই শাস্ত্রানুমত মনে করিতেন। তাঁহার ধারণায় ঈশ্বরের রাজ্য সাম্য ও সম্পত্তির সহাধিকারিতার উপরই সংস্থাপিত হওয়া চাই।

এই এনাবেপ্‌টিষ্ট দলের দমনার্থ খুবই নির্দ্দয় অত্যাচার চলিতে থাকে। ইহার ফলে এই সম্প্রদায় জার্ম্মাণী ও নেদারল্যাণ্ডের (Netherlands) চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

যে ধর্ম্মমত প্রচার করায় তাহাদের এই এনাবেপটিষ্ট নাম রটিত হইয়াছিল,তাহা ছাড়া অন্য বিষয়েও তাহাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ছিল। কেহ বলিত মানুষের রক্ত মাংসই কেবল পাপাচরণ করিয়াছে, সুতরাং উহাদের পতনে মানুষের আত্মার পতন ঘটিতে পারে না। কাহারও

ধারণা ছিল, মানুষের উদ্ধারের জন্য খৃষ্ট নিজের অনুস্থত একটা পথ মাত্র দেখাইয়া দিয়াছেন, অন্য কোন ভাবে তিনি উদ্ধারকর্ত্তা নহেন। কেহ ইহা অপেক্ষা আরও কিছু অগ্রসর হইয়া খৃষ্টের দেবত্বই স্বীকার করিত না। শিশু-দীক্ষার অসারতা সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও, কেহ উহাকে শুধু নিষ্প্রয়োজন মনে করিত, আবার কেহ এই অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ ও শপথ করা অনেকে ন্যায়সঙ্গত বোধ করিত না। কারণ প্রথমটি প্রাণিহিংসা মূলক, দ্বিতীয়টি পাপাচার। কাহারও মতে আত্মায় আত্মায় বন্ধনই একমাত্র যথার্থ বিবাহ, বাহ্য কোন অনুষ্ঠান নাই বা হইল। ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে (Ranke) বলেন, এই ধারণায় বা অছিলায় একজন পশুলোম ব্যবসায়ী নিজের বিবাহিত পত্নী ত্যাগ করিয়া অন্য একটা স্ত্রীলোকের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত। ধর্ম্ম-মণ্ডলীর উপর প্রচারক ও রাজকর্ম্মচারী উভয়েরই শাসন ছিল ইহাদের নিকট অসহনীয়। ইচ্ছা করিলে যখন প্রত্যেকেই প্রচারক হইতে পারে, তখন ইহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট যাজকের প্রয়োজন কি? প্রচলিত প্রচার-কার্য্যের প্রতিষ্ঠান একটা নূতন রকম পোপগিরির স্থাপন মাত্র। তাহাদের বিশ্বাস এসব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে। কারণ স্বর্গ-রাজ্য সমাগত।

মানষ্টারের যাজক রটম্যান (Rottmann) হইতেই এখানকার গোলযোগের সূত্রপাত। এই রটম্যান নাকি স্থানীয় একজন লোকের সুন্দরী পত্নীকে হস্তগত করিবার জন্য বিষপ্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা মিথ্যা দোষারোপ। যাহাই হউক, মানষ্টার নগরের শাসনপরিষদের সহিত এই রটম্যান ও অপর পাদ্রীদের একটা মতবিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ব্যাপারে যাজকেরা এনাবেপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। কারণ এই সময় এই সম্প্রদায়ের লোক কতিপয় নগরবাসির দ্বারা অভ্যর্থিত হওয়ায়

এখানে সংখ্যায় খুব বাড়িয়াই উঠিতেছিল। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে নেদারল্যাণ্ড হইতে আগত এই সম্প্রদায়ের লোকসমূহের দ্বারা সহর পূর্ণ হইয়া উঠিল। পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ইহারা নিজেদের দলবল-সহ বাজারের জায়গাটা অধিকার করিয়া বসিল, অন্যদিকে নাগরিক শাসন পরিষৎ ও তৎপক্ষীয় লোক প্রাচীর ও তোরণের সন্নিহিত স্থান জুড়িয়া বসিল। এই সংঘর্ষে এনাবেপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায়ই জয়লাভ করিয়াছিল। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই বন্দোবস্ত যে, শাসনকর্ত্তার আদেশ পালিত ও শান্তি রক্ষিত হইলে, ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে সকলকেই সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করা যাইবে। ইহার পর শাসনপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে এনাবেপ্‌টিষ্টরাই অধিক সংখ্যক ভোটের জোরে সহরের শাসন ব্যাপারে একাধিপত্য স্থাপন করিল। এইরূপে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা এই সম্প্রদায়ের করায়ত্ত হইলে, রটম্যানের বন্ধু নিপারডলিং (Knipper-dolling) প্রধান রাজপুরুষের পদে নির্ব্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন।

পরিষদে নিজেদের এই সাফল্যের পর অপর পক্ষকে নগর হইতে তাড়াইবার মতলবে ইহারা একটি ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাজারের সন্নিহিত স্থানে সশস্ত্র লোক দেখা যায়। একজন ভবিষদ্‌বক্তা চীৎকার করিয়া উঠে,—'ঈশ'র(Esau) সন্তানদিগকে দূর করিয়া দাও, রাষ্ট্রশক্তির উত্তরাধিকার জেকবের (Jacob) বংশধরদেরই প্রাপ্য। অবিশ্বাসী অধার্ম্মিকরা বিলুপ্ত হউক। 'বয়োবৃদ্ধ অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের ইহারা সত্যই নিকাশ করিয়া দিয়াছিল। অপর পক্ষে কেহই অন্ততঃ নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। সমস্ত চিত্র, পুস্তক, পাণ্ডু-লিপি, সঙ্গীতযন্ত্রাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যাপারে নেদারল্যাণ্ড হইতে আগত জন ম্যাথি নামক একজন ভবিষদ্ বক্তা ছিল প্রধান নেতা, এবং লিডেনের জন বলিয়া পরে বিশেষভাবে পরিচিত অপর এক ব্যক্তি ছিল

তাহার প্রধান সহকারী। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ম্যাথিই নগরের সর্ব্ব-প্রধান রাজপুরুষের পদ অধিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈষ্টার উৎসবের সময়ে পূর্ব্বতন বিশপ ও শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা নগর অবরোধ ঘটিত একটা লড়ায়ে তিনি নিহত হন। এনাবেপ্‌টিষ্টদের কর্ত্তৃক নগর অধিকার ও ম্যাথির মৃত্যুর এ অবকাশের মধ্যে বলিতে গেলে একটা নূতন রকমের শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক শতাব্দীর অধিক ধরিয়া যে ধর্ম্ম সঙ্ঘের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এই স্থলে তাহা একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে। ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইলেও, এই সঙ্ঘ অপরাজেয় স্বাধীনতায় যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা একটা বিশেষ লক্ষনীয় দৃশ্য। এনাবেপ্‌টিষ্টদের মধ্যে যাহা কিছু সবই সাধারণ বলিয়া গণ্য হয়। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নির্ব্বাসিতদের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, বিশ্বাসীদের বেলায়ও তাহা বাহাল রহিল। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচারে সকলকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধর্ম্মমণ্ডলীর হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য করা হইল। এইরূপে দেশের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার ও মুদ্রা—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি সাধারণের ব্যবহারার্থ নিয়োজিত হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যেককেই নিজ নিজ শিল্পকার্য্যে বা ব্যবসায়ে রত থাকিতে হইল। এই সঙ্ঘের সম্পর্কে এখনও এমন সব নথিপত্র পাওয়া যায়, যাহাতে জুতা নির্ম্মাতা, দরজি ও দিন মজুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোনপ্রকার নূতন ধরণের পোষাকের প্রচলন না ঘটে, দরজির উপর ইহা দেখিবার ভার ছিল। প্রত্যেক ব্যব-সায়ই রাষ্ট্রের নিয়ত বা অনুমত কার্য্যের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহা বেশই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা নগর রক্ষাই ছিল সকলের পক্ষে প্রধান কাজ। এইভাবে সকলের মিলনে ঠিক যেন একটা সামরিক

ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। সাধারণের ব্যয়ে মাংস ও মদ্যাদি সংগ্রহ করা হইত। ভোজনকালে স্ত্রী ও পুরুষ, সঙ্ঘ সম্বন্ধে ভ্রাতা ও ভগিনী, বিভিন্ন স্থানে উপবেশন করিত। বাইবেলের একটি অধ্যায়ের পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তাহারা নীরবে ভোজন ক্রিয়া শেষ করিত।

এই সময়ে লিডেন হইতে আগত জনের বয়স ত্রিশের বেশী ছিল না। ইহার মধ্যে ইনি কখনও দরজি, কখনও বিয়ার মদ বিক্রেতা, কখনও বণিক-রূপে, কাজের ভিতর দিয়া মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে বেশ একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। লেখাপড়ার চর্চ্চাও যে কিছু করেন নাই, তাহা নয়। জন ম্যাথির নিকট ইনি দীক্ষা লইয়াছিলেন। বাইবেল সম্বন্ধেও তাঁহার মোটামুটি একটা জ্ঞান ছিল। সৌম্যদর্শন রূপে ও ভাব-প্রবণতায় ইনি জনসাধারণের বেশ প্রিয় হইয়া উঠেন। সম্ভবতঃ সাধারণ নির্ব্বাচনে ইনি নিজের কৃতিত্বে মেথির স্থান অধিকার করেন। প্রথমে কিয়ৎকাল ইনি নিজের মনের ভাব কিছু প্রকাশ করেন নাই। পরে ইনি প্রচার করিলেন, প্রাচীন ইসরাইলে (Israel) যেমন প্রত্যেক গোষ্ঠী হইতে নির্ব্বাচিত বারজন প্রধান পুরুষ ছিল, তেমনই এই নব ইসরাইলেও বারজন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক ও বিচারকরূপে নিয়োগ করা হইবে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ইনি স্বয়ং মণ্ডলীকে জানাইবেন, এবং কার্য্যাধ্যক্ষ রূপে নিপারডলিং তাহা কাজে লাগাইবেন। ইহার কিছু পরেই ইনি একটা নূতন নিয়মের প্রচলনকামী হইয়া দাঁড়ান। এই নিয়মে প্রাচীন কালের ঈশ্বরবিশ্বাসিদের মত বর্ত্তমানেও প্রত্যেক ব্যক্তি সন্তান-কামনায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে। রটম্যান এই ধর্ম্মোন্মাদের দলেই যোগ দিয়াছিলেন। তিনি নিজের উপদেশেও এই মতের অনুমোদন করিলেন। এটিকে নিয়মরূপে বিধিবদ্ধ করিতে জনের একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও ছিল। ইনি বিবাহিত হইলেও, জন মেথির তরুণী বিধবার প্রতি

আসক্ত হইয়া পড়েন। এই স্ত্রীলোকটির জন্য জন মেথিও নাকি নিজের পূর্ব্ব পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, জন ইহার পর আরও নূতন নূতন পত্নী গ্রহণ করেন। ফলে তাঁহার পত্নীর সংখ্যা সতের জনে দাঁড়াইয়াছিল।

এই নিয়ম প্রচলিত হইলে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং তাহার দমনে প্রায় দুই শতটি জীবন হানি ঘটে। এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া জন আর একপা বাড়াইতে অভিলাষী হন। এবার ইনি পুরাতন টেষ্টামেণ্টের (Old Testament) প্রথানুসারে রাজা হইতে ইচ্ছা করিলেন। একজন ভবিষ্যদ্‌বক্তা প্রচার করিয়াছিল, যে ঈশ্বরের আদেশরূপে সে ইহা জানিয়াছে যে জনই এই নব ইস্রায়েলের নৃপতি হইয়া সমস্ত পৃথিবীশাসন করিবেন এবং ডেভিডের সিংহাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। জন ঐ আদেশ নিজেও পাইয়াছেন বলিয়া উহার সমর্থন করেন। এইরূপে জন রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি এবার রাজকীয় আড়ম্বরে তাঁহার প্রধানা মহিষী ও অপর অপর পত্নীসহ একটি প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এইবার ব্যাপার সংঘটিত হয়। অক্টোবরমাসে বাজারে প্রভুর ভোজ (Lord's supper) নামীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রায় চারি সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। জন পুরুষদিগকে এবং মেথির বিধবা ও জনের প্রধানা মহিষী ডিভারা স্ত্রীলোক-দিগকে রুটি বিতরণ করিতেছিলেন। জন এই সময়ে একজন অপরিচিত আগন্তককে প্রথামত বিবাহবেশে সজ্জিত না দেখিয়া গুপ্তচর ভাবিয়া তখনই তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন। আবার ভোজের উৎসব চলিতে থাকে। অপর পক্ষের দ্বারা মানষ্টারের অবরোধ এ লাগাদ চলিতেছিল। কিন্তু এই অবরুদ্ধ স্থানটা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহে পূর্ণ থাকায়, সহসা ইহা অধিকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যাণ্ড এইবার অপর পক্ষের সহায়তা করিতে মনস্থ করিলেন। যদিও অবরুদ্ধ নগরের মধ্যে ক্রমে দুর্ভিক্ষের কঠোরতা দেখা দিয়াছিল, তথাপি পর বৎসরের গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ইহাকে হস্তগত করিবার তেমন বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয় নাই। জুনমাসে দুইজন আততায়ী রাত্রিযোগে প্রাচীরের উপর দিয়া কতিপয় শত্রুপক্ষীয় সৈন্যকে কোনক্রমে ভিতরে লইয়া আসে, এবং একটা দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলে। খুব একটা দারুণ সংঘর্ষের পর নগর শেষে অবরোধকারী বিশপ ও পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাদের অধিকৃত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে রটম্যানের মৃত্যু ঘটে এবং জন বন্দী হয়। দীক্ষা, বহু বিবাহ, সম্পত্তির সহাধিকারিতা সম্বন্ধে তখনও নিজমত বাইবেলের দ্বারা সমর্থন করিয়া জন মৃত্যুর দণ্ডে দণ্ডিত হন। শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিলে মানষ্টারের অবস্থা কি দাঁড়াইত সে বিষয়ে কোন অনুমান করা এখন বৃথা। তবে সম্ভাবনা এই যে, প্রধান নেতারা নিজেদের ছলনাময় ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা ক্রমে অসহনীয় অত্যাচারী হইয়া পড়িত। তারপর যখন তাহাদের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইত, তখন নিজেদের লোকের হাতেই সমুচিত শাস্তিলাভ করিত। সম্পত্তির সহাধিকারিতা সম্বন্ধে ইহাই অনুমিত হয় যে, এই এনাবেপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায় যদি তাহাদের প্রতিবেশিদের সহিত শান্তিতেই কাল কাটাইতে পারিত, তাহা হইলেও মানষ্টারের যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহাতে ঐ সহাধিকারিতা বেশী দিন টিকিয়া থাকিত না; ভবিষ্যদ্-বক্তাদের উপর বিশ্বাসও আর বেশীদিন স্থায়ী হয়ত না।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ঐরূপ সঙ্ঘতন্ত্র সম্বন্ধে হাতে কলমে যে সব পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা হইতে ঐ বিষয়ের অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। যে দেশ ও সমাজ হইতে এই

যে সব ঔপনিবেশিকেরা প্রথমে এখানে আড্ডা গাড়িয়াছিল, স্বদেশে তাহাদের সমাজে তাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ভার্জিনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে ভূসম্পত্তির উপর যথাযথ বিভক্ত ব্যক্তিগত অধিকার কাহারও ছিল না; প্রত্যেকে যৌথ কারবারে এক এক জন অংশীদার স্বরূপ ছিল। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির খুব একটা বেজায় রকম ব্যতিক্রম না হইলেও, ব্যাপারটার ফল বড়ই খারাপ দাঁড়াইয়াছিল। তেমন ব্যক্তিগত দায়িত্ব না থাকাতে, প্রত্যেকেই সঙ্গত দৈনিক কর্ম্মের কেবল এক তৃতীয়াংশ মাত্র করিতে লাগিল। ইহার ফলে চারি বৎসর পরীক্ষার পর অংশীদারীর স্থলে ব্যক্তিগত অধিকারের স্থাপনা করিতে হইয়াছিল।

উপনিবেশের স্থাপনকাল হইতে প্রথম এক শত বৎসরের মধ্যে কোন সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল কি না, তাহার বিবরণ কিছু পাওয়া যায় নাই। প্রথমে শেকার (Shaker) সম্প্রদায়ই স্থায়িত্ব লাভ করে। উপাসনাকালে অঙ্গপ্রত্যাদি ইহারা নানাভাবে চালনা করিত বলিয়া ঐ শেকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংলণ্ড হইতে এখানে আইসে এবং বরাবর বেশ উন্নতি করিতেই থাকে। নিউইয়র্ক ও নিউ ইংলণ্ডের মধ্যে ইহাদের বারটা দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বেশীর ভাগই অল্পকাল মধ্যে ভাঙ্গিয়া যায়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিংবা কিছু পরে ফরাসী ফুরিয়ারের (Fourier) নূতন প্রণালী প্রচারিত ও পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। কতক বা অনেক অংশে তাঁহারই প্রণালী অনুসারে প্রায় ত্রিশটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদেরও সকলগুলি একেবারে লোপ পাইয়াছে। অনেকগুলি ত কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

তবে এগুলিকে ঠিক কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিকও বলা যায় না। কারণ ইহাদের প্রতিষ্ঠাতারা ইহাদের পরিচালনায় শ্রম, মূলধন ও ব্যাক্তিগত কর্ম্মকুশলতা এই তিনটিই স্বীকার করিয়াছেন।

যুক্তরাজ্যের মধ্যে সঙ্ঘতান্ত্রিক উপনিবেশ স্থাপনের এই সব বিফল প্রয়াসের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া এবার যেগুলি অপেক্ষাকৃত সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহাদেরই কথা কিছু বলিব। কোয়েকার সম্প্রদায়ের (Quakers) অন্তর্গত ভক্তিরসোন্মত্ত লোকের একদল প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোয়েকার সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মূলে ইহারাই এই শেকার সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিল। বিচ্ছিন্ন ঐ কোয়েকার দলের মধ্যে এন লী (Ann Lee) নাম্নী একটি স্ত্রীলোক ভবিষ্যদ্‌বক্ত্রী হইয়া দাঁড়ান। ইহার ভিতরে যে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়াছিল, সকলেরই এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মে। ইনি প্রচার করেন যে আমেরিকায় যাত্রা করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আদেশ পাইয়াছেন। তারপর তিনি আট জন মাত্র সঙ্গিসহ সাগর উত্তীর্ণ হন এবং এলবানীর সন্নিকটে একটি অরণ্যে আশ্রম রচনা করেন। এখান হইতে তিনি তাহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে থাকেন। তিনি নাকি অনেক প্রকার কঠিন ব্যাধিও অদ্ভূত রকমে আরোগ্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যেমন অবিবাহিতা ছিলেন, তেমন তাঁহার দলের মধ্যেও কৌমার্য্যের নিয়ম প্রচলিত হয়। ইহা ছাড়া এই নূতন সম্প্রদায়ে যিনি যোগ দিতে চাহিতেন, প্রথমেই তাঁহাকে এই দলের একজন বয়স্ক ব্যক্তির নিকট নিজের পাপ স্বীকার করিতে হইত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। দলস্থ সকলেই তাঁহাকে অধিনায়িকার পদে বরণ করিয়াছিল। এই দলস্থ লোকেরা পরে ইহাকে খৃষ্টের ন্যায় ভক্তি করিত। এন লীর দ্বিতীয়

উত্তরাধিকারীর সময়ে নিউইয়র্ক ও নিউইংলণ্ডে এই দলের প্রায় সমস্ত শাখা গঠিত হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় উত্তরাধিকারিণী লুসী রাইট (Lucy Wright) প্রায় ত্রিশ বৎসর অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে আরও কয়েকটি শাখাসমাজ গড়িয়া উঠে। ১৮৩০ সালের পর ইঁহারা আর কোন নূতন দল গঠন করেন নাই।

নরডফ সাহেব (Mr. Nordhoff) ইঁহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মমতগুলি বিবৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি খুবই অদ্ভুত। একটি মত এই যে, ঈশ্বর দ্বিলিঙ্গ অর্থাৎ একাধারে স্ত্রী ও পুরুষ দুইই। ঈশ্বরের অনুকরণে যখন এডামের সৃষ্টি, তখন তিনিও অবশ্য ঐরূপ। শুধু এডাম নহেন, সকল স্বর্গদূত অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহী জীব সম্বন্ধে ঐ একই কথা। স্বয়ং খৃষ্টও একজন উচ্চতম সূক্ষ্মদেহী জীব। তিনি প্রথমে যিশু ও পরে এন লীর দেহে আবির্ভূত হন।

আর একটি মত এই যে, বিচারের দিন অথবা খৃষ্টের স্বর্গরাজ্য ইহাদের মণ্ডলী স্থাপনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলীর পূর্ণতা লাভ পর্য্যন্ত ঐ রাজ্যের আয়তনও বাড়িতে থাকিবে। খৃষ্টীয় প্রাচীন ধর্ম্মমণ্ডলীই ইহাদের আদর্শ মণ্ডলী। এই আদর্শ হইতে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদের ক্রমে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এই সম্প্রদায় আবার সেই আদর্শে পুনরাবর্ত্তন করিয়াছে। সম্পত্তির সহাধিকারিতা, কৌমার্য্য, অপ্রতিরোধ (nonresistance) সাধারণ রাষ্ট্র হইতে শাসনগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাধি দমন করিবার শক্তি—এইগুলি ইহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মনীতি ও বল। শেষটি ছাড়া আর সব কয়টি তাহারা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। শেষটিও যে তাহারা কার্য্যে দেখাইতে পারিবে, এ আশা এখনও পোষণ করে। তাহারা ত্রিদেববাদ (Trinity), শারীরিক

পুনরুত্থান (Re-urrectio.ı of the body) এবং প্রায়শ্চিত্ত (A:onement) বিশ্বাস করে না। তাহারা খৃষ্ট কিম্বা এন লীর পূজা করে না, উঁহাদের উদ্দেশ্যে ভক্তি ও অনুরাগ অর্পণ করে মাত্র। তাহারা বিশ্বাস করে, নিষ্পাপ জীবন লাভ করা মানুষের অসাধ্য নয়। তাহাদের সম্প্রদায়ের সকল সভ্যেরই উহা লাভ করা উচিত।

বিবাহ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তাহারা পাপ বলিয়া গণ্য করে না সত্য, কিন্তু এগুলি তাহাদের নিকট নিম্নতম সমাজ-জীবনের নিদর্শন। বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ভবিষ্যতে পৃথিবী ক্রমে পবিত্রতর হইবে। প্রেতাত্মার সহিত যোগে ও তাহার আবির্ভাবে ইহারা বিশ্বাস করে। এমন কথাও বলে, তাহারা নিজেরাই প্রেতাত্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে—এমন কি জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালীন লোকের সঙ্গেও। এইরূপ ক্ষমতা তাহাদের মণ্ডলীর একটা বিশেষত্ব বলিয়া তাহারা দাবী করে।

টমাস ব্রাউন নামে একজন গ্রন্থকার ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ইঁনি প্রথমে কোয়েকার ছিলেন। কিছুদিনের জন্য এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। পরে ঐ সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হন। ইহাঁর গ্রন্থ ১৭৯৮ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে এন লীর ও তাহার ভ্রাতা উইলিয়ম লীর চরিত্র সম্বন্ধে বড়ই প্রতিকূল মত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে মণ্ডলীয় স্বার্থের জন্য উহারা মিথ্যা বলা, প্রবঞ্চনা করা, শাস্ত্রের বিকৃতি ঘটান সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করে। ইহাদের বিষয়ে আরও একটা অভিযোগ ইনি করিয়াছেন যে এই সম্প্রদায় হইতে যে ব্যক্তি চলিয়া যায়, ইহারা তাহার সম্পত্তি তাহাকে পুনরর্পণ করে না, তাহার পরিশ্রমের মূল্যও কিছু দেয় না। এই অছিলা দেখায়

যে, এই ব্যক্তিকে ঐ সব অর্থাদি দিলে, সে উহা অসৎ কার্য্যে নিয়োগ করিবে। প্রায় আশি বৎসর পরে উহাদের সম্বন্ধে ঐ সব অভিযোগ অবশ্য অনেক বাদসাদ দিয়া তবে গ্রাহ্য হইতে পারে। আর দেখিতে হইবে ঐ প্রকার অভিযোগ উহাদের দলের একজন নাম কাটা লোকই উত্থাপন করিয়াছে। যতদূর জানা যায় পরবর্ত্তী কালে কেহ কোন বিশেষ প্রমাণে উহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ অভিযোগ পুনরায় উত্থাপন করেন নাই। রাষ্ট্রপতি ডাক্তার ডুইট (Dr. Dwight) বলিয়াছেন ইহাদের এই সব ধর্ম্মোচ্ছাস খুবই অদ্ভুত, এমন কি ছেলেমানুষী বলিয়া গণনীয় হইতে পারে। তাহা হইলেও ইতিহাসে এই বিকৃত ভাবাতিশয্যের যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় এই সম্প্রদায়ের উচ্ছাস খুবই নিরীহ। তবে ইহাদের মতগুলি এতই স্থূল ভাবের যে সে গুলির বেশী বিস্তৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অপরদিকে এই ভ্রাতৃমণ্ডলী শ্রমশীলতা, কর্ম্মনৈপুণ্য, সাধু ব্যবহার ও সংযত চালচলনে সমাজের বহু হিত সাধনও করিয়াছিল বলিতে হইবে।

এই সম্প্রদায়ের পোষনার্থ দেশান্তর হইতে আনীত শিশুরা ছাড়া ইহার মধ্যে বয়স্কদের দুইটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শিক্ষার্থীর দল। ইহারা সম্প্রদায়ের পুরা সভ্যরূপে গণ্য হইত না। আর একদল হইল পুরাপুরি রকমে সভ্য। শেষোক্তদের সহিত সাক্ষাৎকার কোন আগন্তুকের পক্ষে বড় সহজ হইত না। অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া যে ভ্রমণকারী বা অপর ব্যক্তি এই উপনিবেশে আসিত, তাহাদিগকে ঐ শিক্ষার্থীদের নিকট হইতেই ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইত। যখন কেহ এই সম্প্রদায়ে যোগ দিতে ইচ্ছা করিত, তখন স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে তাহাকে সঙ্ঘস্থ একজন বয়স্ক স্ত্রী বা পুরুষের নিকট নিজের দুষ্কৃতি স্বীকার করিতে হইত। সঙ্ঘে যোগ দিবার পরেও

বোধ হয় মাঝে মাঝে আরও এইরূপ স্বীকারোক্তির ব্যবস্থা ছিল। নরটফ সাহেবের বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে, যে এরূপ স্বীকার ও অনুতাপের কার্য্য শেষ করিতে একজন ব্যক্তির অনেক সময় অনেক বৎসরই লাগিত। তিনি আরও বলেন, অন্য কিছু অপেক্ষা এইরূপ স্বীকারোক্তির উপরই একজনের স্থায়ী সভ্য হইবার সম্ভাবনা নির্ভর করে। সঙ্ঘ-প্রবেশার্থীরা তাহাদের সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া আনে এবং তাহা সম্প্রদায়ের জিম্মায় রক্ষিত হয়। সম্প্রদায় তাহার বিলি ব্যবস্থা করে। উহার পূর্ব্ব অধিকারী ইহার জন্য কোনরূপ সুদ অথবা তাহার পরিশ্রমের জন্য কোনরূপ মুজুরী পাইত না, কিন্তু সম্প্রদায় তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। যখন কেহ সঙ্ঘে প্রবেশ করিত, তখন তাহাকে তাহার সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার চিরতরে বর্জ্জন করিতে হইত। ইহা সত্য হইলে উল্লিখিত ব্রাউনের অভিযোগের অবশ্যই কোনও ভিত্তি নাই।

সম্পত্তির সহাধিকারিতার সঙ্গে সকলেরই খুব সাদাসিধা জীবন যাপনের সাধারণ ব্যবস্থা থাকিত। একজন নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের অধীনতায় সকলকে কাজ করিতে হইত। সকল কাজেই ইহারা সকলে বেশ পরিচ্ছন্ন অথচ আড়ম্বরহীন ছিল। এই সব গুণের সঙ্গে ইহাদের শ্রমশিল্প ভূয়োদর্শী ব্যক্তিদের দ্বারা লাভজনক কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় এই সম্প্রদায় বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল বলা যায়।

খ

এখন যুক্ত রাজ্যের অপর কতক গুলি সঙ্ঘের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। পরে এ সব সঙ্ঘ সম্বন্ধে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে

উপনীত হইবার চেষ্টা করা যাইবে। অপর সঙ্ঘগুলির মধ্যে প্রাচীনতমটি জর্জ্জ র্যাপ নামক উরটেম্‌বর্গ বাসী একজন কৃষকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিধিনিবিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করায় দেশের যাজকেরা ইঁহার প্রতি শাস্তি বিধান করিতে উদ্যত হন। সেই শাস্তি এড়াইবার জন্য ইনি কতকগুলি সমবিশ্বাসী লোকের সহিত আটলান্টিক পার হইয়া আসেন এবং ১৮০৫ সালে প্রথমে পেন্সিলভেনিয়ার বাটলার কৌন্টিতে এবং তৎপরে ১৮১৪ সালে ইণ্ডিয়ানায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। শেষে পুনরায় পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া পিটস্‌বর্গের নিকট ওহিও নদীর উপর একটি নূতন গ্রাম গড়িয়া তুলেন। প্রথম আবাসের তিনি 'সমন্বয়' (Harmony) এই আখ্যা প্রদান করেন। ইহাদের ইণ্ডিয়ানার আবাসটি ইঁহারা রবার্ট ওয়েনকে বেচিয়া ফেলেন। এবং শেষ আশ্রমটির নাম দেন 'মিতাচার' (Economy)। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি র্যাপের অনুচরবর্গের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের অধিনায়ক ছিল জার্ম্মানী হইতে আগত একজন অকেজো ও অযোগ্য ভবঘুরে। এই বিরোধী দল নিকটেই অপর এক স্থলে গিয়া নূতন একটি আবাস স্থাপন করে। কিছু দিনের মধ্যেই উহা লুপ্ত হইয়া যায়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে র্যাপের মৃত্যু হয়। প্রথমে কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ইনি ছিলেন তাঁহার দলের নেতা, পার্থিব বিষয় পরিচালনার ভার ছিল তাঁহার পুত্রের উপরে। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুত্রের মৃত্যু ঘটিল। সঙ্ঘের লোকেরা আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সমস্ত বিষয়ের ভার ঐ বৃদ্ধের হস্তেই সমর্পণ করিল। শেষের ব্যাপারটায় ইনি সঙ্ঘের দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সহকারী পদে বরণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে এখানকার যাহা কিছু সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য ছিল। অংশীদার রূপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই উহাতে অধিকার ছিল। কিন্তু ১৮১৮

খৃষ্টাব্দে সকলের মতানুসারে এ বিষয়ে এইটুকু পরিবর্ত্তন করা হয় যে, যখন কোন সভ্যের মৃত্যু ঘটিবে, অথবা যখন কোন সভ্য সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তখন সে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী সাধারণ সম্পত্তির উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রথমে ইহার সভ্যেরা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটা নব উন্মেষের ফলে সঙ্ঘ মধ্যে কৌমার্য্যের বিধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে কয়েক জন তরুণবয়স্ক সভ্য সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া যায়। নরডফ সাহেবের মতে জর্জ্জ র‍্যাপ নিজে এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি কিম্বা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তবে কৌমার্য্য পালনকে তিনি উচ্চতর ও পবিত্রতর আদর্শ রূপে খ্যাপন করিয়াছিলেন। ইহার সহিত র‍্যাপের আরও একটা মতের সঙ্গতি ছিল। সেটি এই যে ঈশ্বর এবং প্রথম সৃষ্ট মানব উভয়েই দ্বিলিঙ্গ। যদি মানুষের পতন না ঘটিত, তবে স্ত্রীলোকের গর্ভজাত না হইয়াই নূতন মানব ধরাধামে অবতীর্ণ হইত।

এই সম্প্রদায় বরাবরই বেশ আর্থিক উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের সাধারণ সম্পত্তি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক নিযুত ডলারে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সঙ্ঘের লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল।

আরও একদল জর্ম্মাণী হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। বর্ত্তমানে যেস্থলে তাহাদের বসবাস তাহা কোয়েকারদের সাহায্যে তাহারা ক্রয় করিয়াছিল। এই স্থলে উপনীত হইয়া শীঘ্রই তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সম্পত্তির সহাধিকারিতা তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা চাই। ইহাদের একজন প্রাচীন সভ্য নরডফ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, যখনই আমরা সম্পত্তির সহাধিকারিতা প্রবর্ত্তন করিলাম, তখন হইতেই আমরা

আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখন তাহাদের সম্পত্তির দাম নিযুত ডলার দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু লোক সংখ্যা বড় বাড়িতেছে না।

সভ্যদের বিবাহ প্রথা ইহারা সমর্থন করে। কিন্তু ইহা তাহারা পছন্দ করে কিনা নরডফ সাহেব এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, উত্তর এই দেওয়া হয় যে মোটের উপর বিবাহিত জীবন এইরূপ সঙ্ঘতান্ত্রিক জীবনের অনুকূল নহে। তাহাদের অধিনায়ক নিজে বিবাহিত হইলেও এই শিক্ষা দিয়া থাকেন যে ঈশ্বর বিবাহ প্রথাকে কোনমতে অনুমোদন করিয়া যান মাত্র। কিন্তু যথার্থ আনন্দের দৃষ্টিতে ওটিকে দেখেন না। স্বর্গরাজ্যে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কোন পরিচয় থাকেনা। সেখানে কোনরূপ লিঙ্গভেদ নাই। এই সম্বন্ধে নরডফ সাহেবের বিবরণে বেশ একটা বিশিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। শিশুরা তিন বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে পৃথক করা হয়। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে বালকদের ও বালিকাদের আলাহিদা ভাবে পালন করা হয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে পারিবারিক জীবনকে ইহারা ঠিক সঙ্ঘতান্ত্রিকতার অনুকূল বলিয়া মনে করে না। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে শিশু পালনের ঐ ব্যবস্থাটি ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

ধর্ম্মবিশ্বাসে এই সম্প্রদায়কে গোঁড়া খৃষ্টান বলিয়াই বোধ হয়। কারণ ইহারা ত্রিদেববাদ, মানবের পতন ও খৃষ্টের মধ্যস্থতায় উদ্ধার প্রভৃতিতে বিশ্বাসবান্। কিন্তু দীক্ষা ও প্রভুর ভোজ নামক অনুষ্ঠান তাহারা সমর্থন করে না। সঙ্ঘে প্রবেশকামীকে কিছুদিন শিক্ষার্থী রূপে থাকিতে হয়। সভ্য রূপে গৃহীত হইবার সময় তাহাকে তাহার সম্পত্তি একান্ত ভাবে সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করিতে হয়। র‍্যাপের

সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সংখ্যায় হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্ভবতঃ প্রধান নেতাদের প্রতিভা ও সামর্থ্যের অভাবে ইহারা বস্তা বুদ্ধিতে ও শিক্ষার পরিমার্জ্জনায় অপরাপর সঙ্ঘ অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট।

ইম্প্রেশানিষ্ট (Impressionist) বা প্রত্যাদেশ-বাদী নামে আর একটি সম্প্রদায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ জার্ম্মানী হইতে বাফেলোর নিকটে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্থ না হইয়াই ইহা তাহারা বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং ক্রমে আইওয়ার (Iowa) অন্তর্গত একটি স্থানে পুনরায় বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করে। ইহা অইওয়া নগরের কয়েক মাইল পশ্চিমে তন্নামীয় নদীর তীরে অবস্থিত। ইহারা নূতন জায়গাটির আমানা আখ্যা দিয়াছিল। এখানে তাহারা ক্রমে সাতটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে নরডফ সাহেব যখন এই স্থানে উপনীত হন, তখন তাহাদের লোক সংখ্যা ১৪৫০ জন ছিল এবং সম্পত্তি ছিল ২৫ হজার একার। তাহারা জার্ম্মানীতে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যুক্ত রাজ্যে পৌছিবার পর তবে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘতান্ত্রিক নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হয়। য়ুরোপ ত্যাগ করিবার সময়ে তাহাদের হাতে অধিক পরিমাণ অর্থ থাকায় অন্য জার্ম্মান সঙ্ঘ অপেক্ষা ইহাদিগকে প্রথম হইতেই কিছু সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইত। তাহারা মনে করে যে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ফলেই সম্পত্তির সহাধিকারিতার নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই কারণে এখন পর্য,ন্ত তাহারা একত্র থাকিতে সুক্ষম হইয়াছে। বিবাহ প্রথা অনুমোদন করিলেও কৌমার্য্যই তাহাদের নিকট প্রশংসনীয়। কয়েক জন পুরুষ সভ্যের উপর তাহাদের পার্থিব ব্যাপারের ভার ন্যস্ত আছে। স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহ তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিনেতা হইতে পারে।

অনেকাংশে তাহারা রক্ষণশীল খৃষ্টান বলিয়াই গণ্য। তবে পাপীরা যে অনন্তকাল ধরিয়া শাস্তি ভোগ করিবে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। প্রত্যাদিষ্ট নেতাদের আদেশ পাইলে ইহারা প্রচুর ভোজ উৎসবের অনুষ্ঠান করে। অপরাপর সঙ্ঘে প্রবেশার্থীর পক্ষে যে সব ব্যবস্থায় কথা বলা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ ব্যবস্থানুসারেই নূতন সভ্য গৃহীত হয়। তবে অন্য কতকগুলি সম্প্রদায় হইতে ইহাদের এইটুকু বৈশিষ্ট আছে যে কোন সভ্য প্রবেশ কালে যাহা কিছু অর্পণ করে, সঙ্ঘ ত্যাগ কালে তাহাকে উহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিনা সুদে। মোটের উপর আমানার এই সম্প্রদায়কে যুক্তরাজ্যের অপর সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের মত বেশ উন্নতিশীল বলিয়াই মনে হয়। ধরিতে গেলে প্রত্যাদৃষ্ট অধিনায়কই এই দলের ঐক্য বন্ধন স্বরূপ। যখন অধিকতর জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে, তখন এই সম্প্রদায়টির ভাঙ্গিয়া পড়িবারই বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ এই দলটি অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যবিহীন লোকের একটা সাধারণ উপনিবেশ মাত্র বলিয়াই অনুমিত হয়।

এখানে আর এক প্রকার সঙ্ঘতান্ত্রিক প্রণালী প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না করাই ভাল। কারণ উহার বেশী কিছু আলোচনা অনেকটা সুরুচিবিগর্হিত হইয়া পড়িবে। এইটি হইতেছে ওনেডা ও ওয়ালিংফোর্ডের পারফেক্‌সানিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ। যুক্তরাজ্যে শেকার ও অপরপর জাম্মাণ সম্প্রদায় অপেক্ষা এই দলের লোককে বুদ্ধিমত্তায় বরং কিছু উন্নত বলিয়াই বোধ হয়। বৈষয়িক ব্যাপারে ইহারা এযাবৎ বেশ সতর্কতা ও উন্নতিশীলতারই পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা নোয়েজ সাহেবের প্রণীত আমেরিকার সোসিয়ালিজমের ইতিহাস হইতে কো৽ও দুইটি স্থল

উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের ধর্ম্মগত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে মাত্র।

ঐ ইতিহাসে তিনি লিখিয়াছেন—প্রাচীনকালে ধর্ম্মমণ্ডলীতে সত্বাধিকারিত্বার নিয়ম কার্য্যতঃ কেবল বৈষয়িক সম্পত্তি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির উপরে আর মানুষের উপরে অধিকারের মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই। যে ভাবের প্রেরণায় একের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কীয় একান্ত অধিকার উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন যদি অবস্থা অনুকূল হয় তবে স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপরেও এরূপ একের একান্ত অধিকার কেন রদ করা যাইবে না? ফুরিয়ারের সমালোচনায় ইনি অন্যস্থানে বলিয়াছেন—পবিত্রতা, স্বাধীন প্রেম, সহকাঙ্ক্ষিতা, এবং অমরত্ব ইহাই মানুষের মুক্তির নিদর্শন। পর্য্যায়-ক্রমে ইহার সবগুলিই মানুষের করায়ত্ত হওয়া চাই। ঈশ্বরের সহিত আগে যোগস্থাপনা না করিয়া দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে কোন প্রকার বিপ্লবের প্রয়াস নিশ্চয় অসঙ্গত বিপর্য্যয় বলিয়া গণ্য। স্বাধীন প্রেমের পূর্ব্বে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

ঐ সম্প্রদায় মধ্যে ঐ সব মত স্বীকার করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা নিত্য ঘটিতেছে। নরঢফ সাহেব ইহাদের একটি রবিবাসরীয় সান্ধ্য আলোচনায় যোগদিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ইহাদের এই আলোচনাসভার কার্য্যাবলী ইনি বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এই সভার শেষভাগে অধিনায়ক নোয়েস যে বক্তৃতা করেন, তার সম্বন্ধে নরঢফ সাহেব লিখিয়াছেন—"ইহার শেষ মন্তব্যে নীতি ও কর্ত্তব্যের এমন সব অদ্ভুত ও বীভৎস ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইল, যাহা আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব।" এই সম্পর্কে আমাদের কথাও এই পর্য্যন্ত।

গ

আধুনিক যুগে যে সব সঙ্ঘ দেখা দিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত রূপ অল্প বিস্তর আলোচনার পর উল্‌সে সাহেব উহাদের বিষয়ে নিজের কতক মন্তব্য খাড়া করিয়াছেন। এই সব মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি জানাইয়াছেন, এইরূপ কাজে সমদর্শিতা রক্ষা করা খুব শক্ত। সুতরাং তাঁহার মন্তব্য গুলি অনেকে নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য না করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সব প্রতিষ্ঠানের নানা ঐতিহাসিক দিক দিয়া এই মন্তব্যগুলিকে পরীক্ষা এরূপ করা গিয়াছে যে, ওগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে বড় কিছু সন্দেহেরও তেমন অবকাশ নাই।

প্রথমতঃ, ইহাই দ্রষ্টব্য যে উভয় দিকেই ভালরূপ তত্ত্বাবধান থাকিলে পারিবারিক ভিন্ন ভিন্ন সংসার অপেক্ষা সঙ্ঘে কিছু অল্পতর ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কুটির অপেক্ষা বৃহৎ একটি সাধারণ আশ্রয়ে দরিদ্রেরা বাস করিতে পারিলে, গৃহের ব্যয় অনেক কম পড়িবেই। এইরূপ সঙ্ঘগত অবস্থায় খাদ্য ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অধিকতর মিতাচার রক্ষা করা খুব সম্ভব। এই সম্ভাবনা শুধু এই জন্য নয় যে পাঁচটি গৃহের প্রত্যেকটিতে ছয়টি করিয়া কক্ষ রাখা অপেক্ষা চারটি প্রাচীরের বেষ্টনে ত্রিশটি কক্ষ নির্ম্মান করা অনেক কম ব্যয় সাধ্য, কিম্বা কেবল এই জন্যও নয় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে বিভক্ত বহুতর রন্ধনাদি কর্ম্ম অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণে একটি ঐ সব কর্ম্মে কম খরচ হইবারই কথা। সম্ভাবনা প্রধানতঃ এই জন্যই, যে সঙ্ঘের মধ্যেই সঙ্ঘস্থ লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে ঐ সব ব্যাপারে চলিতে পারে, সামাজিক মতামতের প্রভাব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহাদের উপর বড় পড়ে না। তাই জীবনের সমস্ত ব্যাপারে

সাদাসিধা রকমে চলা এখানে খুবই সম্ভব। তাহা ছাড়া, ইহাদের গ্রাম সমূহের বহিঃস্থ বিলাসদ্রব্যাদিও ইহারা সহজেই পরিহার করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, পারিবারিক জীবন সঙ্ঘতান্ত্রিক সমবায়ের সাফল্যের অনুকূল নহে। এই দুইটি যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সঙ্ঘের মধ্যে পরিবার স্থান পাইলে সাধারণ সঙ্ঘ হইতে অনেকেরই চিত্ত স্বীয় পারিবারিক স্বার্থের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সাধারণ সম্পত্তিতে যদি প্রত্যেক পরিবারের অংশ থাকে, তবে সঙ্ঘমধ্যে পরিবারের প্রতিষ্ঠা চলিতেও পারে। তবে নূতন কোনও পরিবার সঙ্ঘে যোগ দিবার আগে এই প্রশ্ন তুলিতে পারে, আমাদের নিজেদের মধ্যে যখন একটা ঐক্যসূত্র রহিয়াছে এবং ঐ সূত্রে যখন আমরা অনেক স্নেহের আত্মীয় স্বজন পাইয়াছি, তখন আবার একটা সঙ্ঘে যোগদিবার কি প্রয়োজন? পরিবারের অর্থ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমাজ হইতে পৃথিগীভূত একেবারে নিজস্ব এক একটা জীবনকেন্দ্রের স্থাপন। সঙ্ঘের অর্থ সাধারণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে এমন একটি নবতর ঐক্যের সংঘটন যাহার সহিত বিভিন্ন পারিবারিক ঐক্যের খাপ খাওয়ান অনেকটা অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘসমূহের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, যে যখনই পারিবারিক জীবনের পরিবর্ত্তে কৌমার্য্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হইতে সেটির উন্নতিরই সূচনা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্ঘতান্ত্রিক নিয়মে আবদ্ধ পরিবারসমূহে ঐরূপ সাফল্য বড় ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, আরও দেখা গিয়াছে যে, এই সঙ্ঘগুলি যে পরিমাণে সাধারণ মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সমর্থ, সেই পরিমাণে তাহাদের স্থায়িত্বের আশাও বেশী। এই কথার অর্থ এই যে কোনও একটা স্থায়ী জিনিষ, যেমন সমান ধর্ম্ম বিশ্বাস, যদি কোনও সঙ্ঘের

ঐক্যের মূলে বিদ্যমান থাকে, তবে সেই সঙ্ঘটি টিকিবার খুবই সম্ভাবনা। ইহা অবশ্যই সত্য যে যদি তাহারা সঙ্ঘস্থাপনের পর অনিশ্চিত রকমে এটাসেটায় হাত দেয়, তবে তাহাদের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে পারে, যেমন অপর কারণেও দলের সৃষ্টি ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রথম কারণে সাধারণ সমাজ অপেক্ষা সঙ্ঘের মধ্যে দলাদলির সম্ভাবনা অনেক কম। কারণ সাধারণ সমাজের মধ্যে দল সৃষ্টির মূলে যে সব শ্লেষ বিদ্রূপ ও সামাজিক শাসন থাকে, সঙ্ঘের লোকেরা সে গুলির হাত হইতে অনেকটা মুক্ত।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মূলে অপর কারণ অপেক্ষা ধর্ম্মগত কারণ বিদ্যমান থাকিলে, সেই সঙ্ঘের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবারই সম্ভাবনা। ধর্ম্মগত কারণ বলিতে এই বুঝায় যে, যাহাতে ঈশ্বর, মানুষ এবং মানুষের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ধারণা রহিয়াছে, তা সে ধারণা সুনীতি সঙ্গত হোক আর নাই হোক। ঐ ধারণা যদি সুনীতিসঙ্গত না হয়, তবে তাহা ভিতর ও বাহির দুইদিক হইতে সঙ্ঘের প্রতিকূলে দাঁড়াইবে। শুধু বাহিরের লোকের নিকটই যে ইহা ঘৃণার্হ হইয়া উঠিবে, তাহাই নয়। সঙ্ঘের ভিতরেও উহা লইয়া বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘটি যদি শীঘ্র বিলোপ নাও পায় অনেকটা দুর্ব্বল নিশ্চয়ই হইয়া পড়িবে। কিন্তু যে ধর্ম্ম লোকে অত আগ্রহে গ্রহণ করে, যাহার জন্য লোকে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, সে ধর্ম্মের বন্ধন অবশ্য খুবই দৃঢ়। এইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাস ঐ সঙ্ঘটিকে পার্থিব জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে এবং নিজেদের মধ্যেও তাহা একটি নিবিড় ঐক্যবন্ধন হইয়া দাঁড়ায়, পার্থিব সংসার সম্বন্ধে একটা পাপভয় জন্মাইয়া দেয়। কাজেই এইরূপ অবস্থায় উহার উপর সাধারণ পার্থিব জীবনের বিশেষ একটা প্রভাব পড়িবারও বড় আশঙ্কা থাকেনা। ক্যাবেট ও রবার্ট ওয়েনের মত শিক্ষিত লোকের ধর্ম্মবিবর্জ্জিত সঙ্ঘ যে এমন বিফল ও অস্থায়ী হইল,

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়? অপর দিকে অশিক্ষিত হইলেও ধর্ম্মবিশ্বাসী জার্ম্মান অধিনায়কদের পরিচালনায় কত সঙ্ঘতান্ত্রিক উপনিবেশ বেশ ত উন্নতিশীল হইয়া উঠিল। ইহার কারণ অবশ্যই আর কিছু নয়, একের মূলে ছিল দৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস; অপরের ভিতর সূক্ষ্ম বুদ্ধির কারুগিরি যাহাই থাক না, ঐ রূপ বিশ্বাসের শক্তি কিছু ছিল না।

এই সব দেখিয়া ইহাও অনুমিত হয় যে, উন্নত ও শিক্ষিত লোকের রচিত এরূপ সঙ্ঘের সাফল্যের আশা সর্ব্বত্রই কম। কারণ, ইহাদের মধ্যে এরূপ একটা নবতর জীবনযাপনের দিকে আকর্ষণই বড় থাকে না। মোটামুটি একটা সুখের অবস্থায়ই তাহাদের জীবন কাটিতেছে। ইচ্ছানুসারে স্বজন সমাগমে ও ভোগ্যবস্তুর সংগ্রহে তাহাদের বড় বাধা ঘটিতেছে না। তবে তাহারা তেমন পরিবর্ত্তনকামী হইবে কেন? ইহা ছাড়া অশিক্ষিত লোকেদের অপেক্ষা ইহারা বেশী রকম স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের পক্ষপাতী। তাহাদের বক্তিগত স্বাধীনতা তাহারা ঐরূপে ত্যাগ করিতে যাইবে কেন?

ইহা অবশ্য সম্ভব বলিয়া মনে করা যায় যে কতকগুলি বিশিষ্ট ভাবে শিক্ষিত ধার্ম্মিক পরিবার চতুঃপার্শ্বস্থ সামাজিক দুর্নীতি হইতে দূরে থাকিয়া পরস্পরের সংসর্গের আশায় একত্র হইতে ইচ্ছা করিল। সমাজ হইতে এরূপ ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত কিনা সে বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করিব না। কিন্তু এক্ষেত্রে এইটা বেশী সম্ভব যে যদি তাঁহাদের মনে ঐরূপ ভাব প্রবল হয়। তবে তাঁহারা সঙ্ঘতান্ত্রিক জীবনের মত একটা নূতন বিপ্লবের পথে না গিয়া যতটা পারে সমাজ হইতে আলগা থাকিয়া নিজেদের আদর্শ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে।

তবেই অতীত যুগে যেরূপ ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও এরূপ সঙ্ঘগুলি প্রধানতঃ এমন সব ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হইবে, যাহাদের সামাজিক

জীবন তেমন উন্নত নয়, অথবা যাহাদের চঞ্চল মন কতকটা কোন রকমে বিগড়াইয়া গিয়াছে, অথবা যাহারা সাধারণ মানবসমাজে নিজেদের ইচ্ছানুমত শান্তির স্থান খুঁজিয়া পায় নাই।

এই সব সঙ্ঘের স্বাস্থ্য ও উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গোড়ায় দরিদ্র থাকিলেও এখন বেশ সমৃদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এ বিষয়ে এইটুকু দ্রষ্টব্য যে এখানকার ভূসম্পত্তি অতি সুলভ ছিল। তারপর সঙ্ঘগুলি যে সবই উন্নতি করিয়াছে, তাহাও নয়। অনেকগুলি একেবারে দেউলিয়া হইয়াও পড়িয়াছে। তবু ইহাদের স্বপক্ষে ইহাও লক্ষণীয় যে মিতাচার, কার্য্যের শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম পরিদর্শন ও মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন প্রভৃতিতে এই সব সঙ্ঘস্থ লোকেরা সাধারণ পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর। যদি পাঁচশত লোকের সঙ্ঘটিকে সংখ্যা সম্বন্ধে একশত পরিবারের সমান ধরা যায়, তবে ইহা খুবই সম্ভব যে একই শ্রমশিল্পে নিযুক্ত থাকিলে বর্ষশেষে ঐ সঙ্ঘটি ঐ সব পরিবার অপেক্ষা অধিকতর সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবে। তারপর পারিবারিক অধিনায়কদের দোষে ঐ পরিবারবর্গের কতকগুলির যতটা ক্ষতি ও এমন কি ধ্বংসেরও সম্ভবনা, কার্য্যাধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়কদের অনাচার বা ঔদাসীন্যে সঙ্ঘের সেরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম।

কিন্তু যে সব সম্প্রদায়ে সঙ্ঘতান্ত্রিক নিয়মপ্রণালী বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তিত, সেখানে পারিবারিক ভক্তি ও ভালবাসা তেমন বিকাশ পায় না। পারিবারিক জীবনই মানুষকে পশুজগৎ হইতে উপরে উন্নীত করিয়াছে এবং পৃথিবীতে মানবীয় সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষের সহিত মানবপরিবারের মধ্যেই ধর্ম্ম আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

এখন মনে করা যাউক, এইরূপ বহু সঙ্ঘে কোন একটা দেশকে একেবারে যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই সঙ্ঘগুলি যদি সভ্য দেশে সেচ্ছাকৃত হয়, অর্থাৎ কোন বাধ্যবাধকতার ভিতর না পড়িয়া নিজেদের ইচ্ছা বা রুচি অনুসারে যদি লোকে এই সব সঙ্ঘে যোগ দেয়, এবং ঐ সঙ্ঘগুলি যদি প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী না হইয়া বরং বর্ত্তমান পরিবারবর্গের মত ঐ নীতির রক্ষণাধীন থাকে, তাহা হইলেও এরূপ সঙ্ঘের পদ্ধতি সাধারণ সামাজিক নীতির বন্ধন সব ভাঙ্গিয়াই ফেলিবে। এই সঙ্ঘগুলি যদি নিজেদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তবুও এইরূপ ঘটিবে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নানা দিক দিয়া বিবিধ যে সামজিকযোগ আছে এবং যেরূপ সব কম্মের প্রেরণা প্রচলিত নিয়মে সমাজের দেখা যায়, সঙ্ঘের স্থাপনায় তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যাইবে। পারিবারিক জীবনের বিকাশ তখন সঙ্ঘতান্ত্রিক জীবনের নিয়ন্ত্রণে চলিবে; উহার শক্তিও অনেকটা হ্রাস পাইবে। খুবই সম্ভব, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধির দিকেও লোকের আগ্রহ অনেক কমিয়া আসিবে। সমস্ত জাতিটা তখন ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠায়, আইন-কানুনের সাধারণ প্রয়োগ পর্য্যন্ত অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। জাতীয় শক্তি তখন এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সুচারুরূপে করিতে পারিবে কিনা, কিম্বা কোন রাষ্ট্রশক্তি নিজের ব্যবস্থার দ্বারা সঙ্ঘতান্ত্রিকতার উপর সমাজকে যথাযথ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ কিনা, আধুনিক সোসিয়ালিজম ও তন্নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের আলোচনায় সময়ে ঐ সব প্রশ্নের সমাধানে হাত দিব। কিন্তু আমাদের ধারণা এই, যে কোন একটি স্বেচ্ছাকৃত বিপুলায়তন সঙ্ঘের পদ্ধতি কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

সার্ব্বজনীন সঙ্ঘতন্ত্র—ইউটোপিয়া

(ক)

এ পর্য্যন্ত যে সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল, তাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ভাবে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াস বড় লক্ষিত নাই। বরং বহিঃস্থ সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া স্বাধীন ভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শ ফুটাইয়া তোলাই ইহাদের উদ্দেশ্য। আধুনিক সোসিয়ালিষ্টদের মত ইহাদের গঠনের মূলে প্রচলিত সমাজের প্রতি কোন বিদ্বেষভাবও ছিল না। ইহাদের ধারণা এই যে, ইহারা একটা উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে সাধারণ সামাজিকগণ সমর্থও নয়, কিম্বা ইচ্ছুকও নয়। সুতরাং ইহাদের ব্যবস্থা অনেকাংশেই ইহাদের মধ্যে আবদ্ধ ও অবশিষ্ট মানবসমাজ হইতে স্বতন্ত্র রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এরূপ স্বতন্ত্র থাকিলেও ঐ সব ব্যবস্থার প্রভাব যে মানব-সমাজের উপরে কিছু পড়ে নাই, তাহা নয়। বহুদিনের পুরাতন সমাজে নানা প্রতিষ্ঠানের বিকৃতিতে নানা গলদ জন্মিবারই কথা। আবার এই সব গলদের নিরসনও বড় সহজসাধ্য নয়। কারণ, বিকৃতি হইলেও শুধু প্রাচীনত্বের দাবীতে বহু প্রতিষ্ঠান সমাজের কাছে পূজা পাইয়া আসিতেছে। তাই বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চক্ষে অবশ্য এগুলি এড়ায় না। এবং তাঁহারা পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনকে বরণ করিবার

উপদেশ দিতেও বিরত হন না। তাই বিশেষ করিয়া যে সমাজে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা সামাজিক ব্যাধিও দেখা গিয়াছে, সেখানকার অনেক চিন্তাশীল লোকের দৃষ্টি ঐ সব সঙ্ঘতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকেই আকৃষ্ট হওয়ার কথা। অনেকের মনে সহজে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, আচ্ছা, ঐ সব সহজ সঙ্ঘতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ত বেশ সুখ-শান্তি পূর্ণ। উহাদের ঐ সব ব্যবস্থা কি বিস্তৃত ভাবে সমগ্র রাষ্ট্র সমাজ পরিচালনায় প্রযুক্ত হইতে পারে না? এবং তাহাতে সমাজের বর্ত্তমান ব্যাধি ও বিরোধের কি কিছু প্রশমন হয় না? কিন্তু ভাব-প্রবণ তাত্ত্বিকদের হাতে ঐ সব প্রশ্নের সমাধান যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সুবিধাজনক হয় নাই। তাঁহারা দেখিয়াছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পারিবারিক জীবন, নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে লোকের অব্যাহত স্বাধীনতার অধিকার, ঐ সব সামাজিক রোগের মূল। সুতরাং ঐ সব মূল যতদিন না সমাজ হইতে উৎপাটিত হয়, ততদিন সামাজিক স্বাস্থ্যের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্যসমাজ ন্যায়ের পথে চালিত নয়। তাই এখানে নানা দ্বন্দ্ব, নানা সংঘর্ষ। বর্ত্তমান নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে একতা কই? নানা শ্রেণীগত নানা স্বার্থের বিরোধে যে উহা পরিপূর্ণ। এখন, কে এই সব অমঙ্গলের নিরসন করিতে সমর্থ? কোন ব্যক্তির বা শ্রেণীর শক্তিতে ত উহাদের নিরসন সম্ভব নয়। একমাত্র রাষ্ট্রশক্তিই এই কার্য্য করিতে পারে। অতএব তাহার উপরই এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা বিধেয়। রাষ্ট্রকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া না তুলিলে ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারিতার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। অবশ্য সাধারণ লোকে এই সব ব্যাপার লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় না, কারণ তাহাদের মাথায় ও সব জিনিশের স্থান তেমন নাই। উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় চিন্তাশীল ভাবুকদের মনেই চিরদিন ঐরূপ সমস্যার

উদয় হইয়াছে। তাঁহারা নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুসারে উহার সমাধানেও হাত দিয়াছেন। যাহাদের মধ্যে কর্ম্মক্ষমতা ও সাফল্যের আশা প্রবল, তাঁহারা সমাজক্ষেত্রে সংস্কারকরূপে দেখা দিয়াছেন। যাঁহারা কেবলমাত্র ভাবুক, তাহারা ভাবের বশে নানা কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার রিপাব্লিক নামক গ্রন্থে ঐরূপ একটি ন্যায়ের রাজ্য চিত্রিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ঐ চিত্র তাঁহার কাছে কেবল একটা ভাবের খেলা, অথবা তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল সে বিষয়ে অনেকে কথা আছে। তাঁহার শিষ্য এরিষ্টটল ঐ কল্পিত ন্যায়রাজ্যের আদর্শকে সমাজ-ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ অননুসরণীয় বলিয়াই মনে করিয়া তাহার তীব্র আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্লোটো নিজে আবার ইহার উপর নীতি শাস্ত্র (Book of Laws) নামক গ্রন্থে অপর একটি আদর্শ রাজ্যের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কোন ওলট-পালট ঘটান নাই। বরং উহার সমর্থনই করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভিত্তির উপরেই নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমাজকে যতদূর সম্ভব পবিত্র, ন্যায়পর ও শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এখন প্লেটোর ঐ দুইখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দুইটি সিদ্ধান্তই করা যাইতে পারে। এক, তাহার রিপাব্লিকের চিত্রটি একজন ন্যায়পর ব্যক্তির পরস্পর-সঙ্গত কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত ছাড়া আর বড় কিছু নয়। অপর, সত্যই তাঁহার আলোচিত প্রতিষ্ঠান-গুলি সমাজের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়, এবং যদি তাহাদের প্রবর্ত্তনে নানা শ্রেণীসমন্বিত রাষ্ট্রের মধ্যে একতা, নিস্বার্থপরতা ও সাধারণ মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে সেগুলি তাঁহার কাছে নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য নয়।

তাহার নীতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থের এক স্থলে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে শেষোক্ত সিদ্ধান্তটিই সমীচীন মনে হয়। তাঁহার এই উক্তিতে সর্ব্বোত্তম রাষ্ট্রনীতির স্থান কোথায়? না, যেখানে কিছুই ব্যক্তিগত নয়, সবই সাধারণ, এমন কি পুত্রকলত্র পর্য্যন্ত। "দেবতারা অথবা দেবপুত্রেরা যাঁহারাই এখানে বাস করুন না, সকলের পক্ষেই এরূপ রাজ্য প্রকৃতই সুখের আগার।" তবে যে অপর একটি প্রচলিত রকম রাষ্ট্রের কথা তুলিয়াছেন, সেটা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর, মন্দের ভাল, এই মাত্র।

যাই হৌক, প্লেটোর আদর্শ রাজ্যের চিত্র সর্ব্বপ্রকারে বেশ ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি সমগ্র অধিবাসীকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, শাসক, রক্ষক ও শ্রমিক। মানুষের প্রকৃতি গত জ্ঞান, বীর্য্য ও লোভের শক্তির তারতম্যের উপরেই এই বিভাগ তিনটি প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন উহাদের সমন্বয়ই যথার্থ সদাচার বা ন্যায়াচার, তেমনই রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐ সব গুণানুসারে বিভক্ত শ্রেণীগুলি প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে, তবে সেখানে ঐক্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। প্লেটো কিন্তু তাঁহার আলোচনায় প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নাই। প্রথম শ্রেণীর লোকসংখ্যা অবশ্য অনেক কম। হইবারই কথা এবং উহার ক্ষয় অবশ্য রক্ষক শ্রেণীস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করা হইবে। ইহাও বেশ অনুমান করা যায়, যে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত এখানেও নিম্নতম তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিতে ও পারিবারিক জীবনযাপন করিতে পারিবে। যদি উহাদের সন্তানদের ভিতর কাহারও বিশেষ সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাহাকে রক্ষক শ্রেণীতে তুলিয়া লওয়া হইবে। আবার যদি রক্ষক শ্রেণীর কোন শিশুর মধ্যে তাহার শ্রেণীগত গুণের অভাব বটে, তবে তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইবে।

রক্ষকশ্রেণীর বিশেষ কার্য্য হইল, বাহিরের শত্রু ও ঘরের বিদ্রোহ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। গৃহ বা ভূসম্পত্তি নিজের বলিতে কিছুই ইহাদের থাকিবে না। এই শ্রেণীর ধারাবাহিকতা রাখিতে যে সব স্ত্রীলোক থাকিবে, তাহারা কাহারও ব্যক্তিগত পত্নী না হইয়া সমস্ত শ্রেণীর পত্নীরূপে পরিগণিত হইবে। এবং শাসন কর্ত্তারা এ বিষয়ে খুবই দৃষ্টি রাখিবেন যে ঐ সব স্ত্রীলোকদের সন্তান জন্মাইলে কোনও পুরুষ যেন সেটিকে নিজের বলিয়া বুঝিতে না পারে। সব সন্তানগুলি হইবে সাধারণেরই। এইরূপে পুত্রকলত্র বিষয়ক ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে সমাজ হইতে অনেক বিবাদ ও বিরোধের কারণও বিলুপ্ত হইবে।

এরিষ্টটল তাঁহার সমালোচনায় প্লেটোর ঐরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে অসমর্থ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপভাবে বৈষম্যের বিলোপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেরই বিলোপের নামান্তর। আরও যাহাতে বহুর সমবেত স্বত্ব থাকে, তাহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের যত্ন অতি সামান্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া, গ্রীস বাসীর নিকট এইরূপ ব্যবস্থা খুবই অবজ্ঞেয়। রাষ্ট্র শক্তি সর্ব্বেসর্ব্বা, রাষ্ট্রপতি সকলের ভাগ্য নিয়ন্তা, প্রচলিত এই গ্রীসীয় ধারণা হইতেই সম্ভবতঃ ঐ সব পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব অবতারিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, আথেন্সের প্রধান হাস্যরসিক কবির কাছে ইহা যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহাতেই মনে হয় এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

সম্ভবতঃ প্লেটোর এই রিপাব্লিক অবলম্বনেই ইংরেজ সার টমাস মুর ইউটোপিয়া (Utopia) রচনা করিয়াছিলেন। এখানি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত হয় এবং গ্রন্থকার রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের

অষ্টম হেনেরীর রাজত্বের প্রথম ভাগে, ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে, কিম্বা কিছু পরে উহা প্রকাশিত হয়। ইহা একটা কল্পনা মাত্র বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ এই গ্রন্থের শেষে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি এই কথা তুলিয়াছেন—“ইউটোপিয়া দ্বীপের আবিষ্কর্ত্তা হিথ্‌লোডিউস্ যাহা বলিলেন, একপক্ষে তাহা অবশ্য গ্রহনীয় নয়। তবে অন্যপক্ষে ঐ দ্বীপের অনেক বিষয় যে আমাদের প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু বাঞ্ছনীয় হইলেও এখানে উহাদের প্রবর্ত্তনের আশা বড় করা যায় না” এতদ্ভিন্ন ইউটোপিয়া শব্দের অর্থই হইল ‘স্থান নয়’। সুতরাং উহা বাস্তব এই জগতের বাহিরে একটা কাল্পনিক রাষ্ট্রনীতির কাল্পনিক আশ্রয় মাত্র। আবার ঐ গ্রন্থের কতকগুলি ভাব নিতান্ত অলীক জল্পনা, গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী আচরণে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—এখানে সকল ধর্ম্মই সমান ভাবে প্রচলিত থাকিতে পারিবে এবং পরস্পরের মতের প্রতি পরস্পরের সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে সকল ধর্ম্মকেই বাধ্য করা হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্রে বিশ্বাসই এখানকার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা আত্মার অমরত্ব যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা কোন রাজকার্য্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না। রিফর্ম্মেসন বা লুথর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সংস্কারের দুই এক বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক খান মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকারের ঐ সব উক্তি সত্ত্বেও চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যখন তিনি প্রধান একজন রাজপুরুষের পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন প্রোটেস্‌টেন্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা সমর্থনে তিনি বিরত হন নাই।

ইউটোপিয়া প্রথমেই ইংলণ্ডের একটা সামাজিক দুরবস্থার চিত্র। অকর্ম্মা লোকের বৃদ্ধি, দরিদ্রের হিতাপহারী ধনীর অভ্যুদয় এবং উন্নতি-কামীর পথে আত্মপরায়ণের বাধা হইতে এই দুরবস্থা সংঘটিত

হইয়াছে। ইউটোপিয়ার আবিষ্কর্ত্তা ঐ বিবরণ শ্রবণে বলিতে লাগিলেন যে, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন আছে এবং যেখানে অর্থের দ্বারা যাহা কিছু সবই পরিমিত হয়, সে রাজ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সাধারণের উন্নতি সুদূর-পরাহত। মনুষ্য সমাজে বৈষয়িক ব্যাপারে সমতা রাখিতে হইলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা রদ করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ সম্পত্তির প্রচলন থাকিবে, ততদিন দেশের মধ্যে যাহারা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং চরিত্রে সর্ব্বোত্তম, তাহাদিগকে দুঃখ, দারিদ্র্য ও অশান্তির গুরুভার বহন করিতে হইবে। ইহার প্রতিকারের আশায় ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্কোচ সাধক নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হইলেও, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা থাকিতে ঐ আশা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহার একমাত্র যথার্থ প্রতীকার ইউটোপিয়ায় যেরূপ আছে, তদ্রূপ সম্পত্তির সহাধিকারতার প্রবর্ত্তন।

এই দ্বীপটি প্রধান স্থলভাগ হইতে একটি কৃত্রিম খালের দ্বারা বিভক্ত। এখানে প্রধান রাজধানী ছাড়া আরও চল্লিশটি সহর আছে। সবগুলিই একই ধরণে নির্ম্মিত। মোটের উপর ছয় হাজার পরিবার এই সব স্থানে বসবাস করিতে পারে। দেশের মধ্যে চতুর্দ্দিকেই বহু গোলাবাড়ী বিদ্যমান। প্রত্যেক গোলাবাড়ীতে অন্ততঃ চল্লিশজন লোকের স্থান আছে; সকল অধিবাসীকেই হয় কৃষি, নয় কোন শ্রমশিল্পের কাজ করিতে হয়। কেহ অলস থাকিতে পারে না বলিয়া প্রত্যেককের প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা মাত্র কাজ করিলে দ্বীপটির সমস্ত অভাবের পরিপূরণ হয়। দিনের অবশিষ্ট অংশ সাধারণ বিদ্যাগারে পঠন কার্য্যে ও সন্ধ্যা বেলাটি খেলাধূলায় অবাধে যাপিত হইতে পারে।

এখানে খাদ্যাদি বিনিময়ের জন্য বাজার ও পণ্য সংরক্ষণের জন্য সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপিত আছে। কোন প্রকার ব্যয় ব্যতীত প্রত্যেক

পরিবার নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ প্রাপ্ত হয়। এখানে আহার সকলে মিলিয়া একসঙ্গেই করে। সাধারণ চিকিৎসালয় ও সাধারণ শিশু-আশ্রমও আছে। এই আশ্রমে প্রসূতিরা নিজেদের সন্তান লালন পালন করিয়া থাকে। বিবাহ প্রথা এখানে আইন সঙ্গত ও সমাজপ্রচলিত। কিন্তু এই সমাজে শিশুদের সংখ্যা সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে। শিশুর সংখ্যা কোন গৃহে কম ও কোন গৃহে বেশী রাখা হয় না। এক গৃহের শিশু অপর গৃহে স্থানান্তরিত করিয়া সকল গৃহের সংখ্যা সমান রাখা হয়।

বহিঃস্থ পৃথিবীর সহিত কারবার ছাড়া কোনও আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ইউটোপিয়ায় মুদ্রার প্রচলন নাই। শাসনকর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত দেশান্তরে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। এইরূপ ভ্রমণের সময় ভ্রমণকারী যে স্থলে থাকে, সেইখানে তাহাকে নিজের পরিশ্রম দ্বারা আহার্য্য ও পাথেয় অর্জ্জন করিতে হয়।

এখানকার শাশনপ্রণালী খুবই সহজ। প্রত্যেক ত্রিশটি পরিবার মিলিয়া একজন নিম্নতর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করে, এবং এইরূপ প্রত্যেক দশটি পরিবার-সঙ্ঘের দ্বারা একজন উচ্চতর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়। ঐ সব নিম্নতর শাসনকর্ত্তারা জনসাধারণের অনুমত চারজন প্রার্থীর মধ্য হইতে একজনকে রাষ্ট্রপতির পদে বরণ করে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক নগর তিনজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকে। এই ব্যবস্থাপক সভাই রাষ্ট্র পরিচালনার্থ নিয়মাদি প্রণয়ন করে। রাজধানীতে ইহার অধিবেশন হয়। জনসাধারণকে কার্য্যে নিরত রাখাই এই শাসনকর্ত্তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু এরূপ পদ্ধতি প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মশীলতা না আলস্যের প্ররোচক? আলোচ্য কথার মধ্যে এই প্রশ্নও উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার আশানুরূপ সদুত্তর বড় মিলে নাই।

মূরের ব্যবস্থাটি এখানে কিছু সবিস্তারেই উল্লেখ করা গেল। কারণ আধুনিক সোসিয়ালিষ্টদের মধ্যেও নিজেদের পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐরূপ বাধাই উঠিয়াছে, এবং ঐরূপ জোড়াতাড়া উপায়ে উহার নিরসনও করা হইয়াছে। আধুনিক যুগে অভ্যুত্থিত বিপ্লববাদের বহু পূর্ব্বে ইউটোপিয়া রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলেও ওটি ইহারই পূর্ব্বাভাস বলিয়া গণ্য।

প্লেটোর অনুসরণকারী ঐরূপ আর একজন সংস্কারক, টমাস কেম্পেনালা মূরের এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হন। তাঁহার সৌরনগর (City of the Sun) নামক গ্রন্থখানি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি ইটালীর একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং ডমিনিসিয়ান নামে বিশিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। ইনি স্পেনীয়দের বিদ্বেষের লক্ষ্য হইয়া পড়েন, সাতবার ক্লেশদায়ক যন্ত্রে নিপীড়িত করিয়া পরে ইহাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হয়। নির্ব্বাসনে ছাব্বিশ বৎসর গত হইলে ইনি মুক্তিলাভ করিয়া জীবনের শেষ অংশ ফ্রান্সে যাপন করেন। তাঁহার সঙ্ঘতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই এবং সঙ্ঘতন্ত্রবাদীদের উপর ইঁহার প্রভাবও তেমন কিছু লক্ষিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েই বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন -"সকল প্রকার সমাজব্যবস্থার মধ্যে মঠের পদ্ধতিকেই ইনি বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। পোপের আধিপত্য এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী যাজকসঙ্ঘের উপরে ইঁহার নূতন সমাজ নিয়ন্ত্রনের প্রণালী সংস্থাপিত। সম্পত্তি ও পত্নীর সহাধিকারিতা এবং দার্শনিক বা বিজ্ঞ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের দ্বারা রাজ্য শাসন—এই দুইটি তাঁহার সঙ্ঘতান্ত্রিকতার প্রকৃষ্ট

লক্ষণ। এই উভয় ব্যাপারেই ইনি প্লেটোর অনুসরণকারী। প্রথমটিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও পারিবারিক জীবনের অবসান, এই দুয়ের সংযোগ রক্ষিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তি এই—"সমাজের মধ্যে প্রত্যেকের নিজ নিজ পুত্রকলত্র ও গৃহ আছে বলিয়া সম্পত্তিবৰ্দ্ধনের আগ্রহ এতটা বাড়িয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই মানুষ এতটা স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে যে শক্তিমান্ ও বিত্তবান্ সে যতটা পরে সাধারণ ধন ভাণ্ডারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজের উত্তরাধিকারী পুত্রের জন্য অর্থ ও অর্থগত সম্মান সংগ্রহ করিতেছে। আর যাহারা দরিদ্র, দুর্ব্বল ও পারিবারিক অভিজাত্যহীন, তাহাদের ভিতর ছলনা, বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতা বাড়িয়া উঠিতেছে।" তাহার সঙ্ঘতান্ত্রিক প্রণালীতে তিনি প্লেটোর অনুসরণে রাজকীয় ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের জন্মগত উৎকর্ষ সাধনেরও প্রয়াস পাইয়াছেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কেম্পানেলার আশঙ্কা, পূর্ব্বে এ বিষয়ে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর শাসনকর্ত্তারা প্রতিজনের বাসের জন্য জেলা বা কেন্দ্র, গৃহ ও কক্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। ইহার উদ্দেশ্য স্পষ্টত: এই যে পাছে একস্থলে বহুদিন বসবাস করিলে লোকের মনে একটা স্থানীয় আসক্তি বা গৃহস্থালীর ভাব জাগিয়া উঠে। শিল্পের কাজ স্ত্রীপুরুষ উভয়েই করিতে পারিবে। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে শাসনকর্ত্তারা বণ্টন করিয়া দিবেন। সকলই যখন মিতাচার ও দারিদ্র্যের ব্রতধারী, তখন সমগ্র অভাবের পরিমাণ খুব বেশী হইবারও কথা নয়। কেম্পানেলা মনে করেন, প্রত্যেকে প্রতিদিন চার ঘণ্টা করিয়া কাজ করিলে এ অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে।

প্লেটোর রিপাব্লিকের একটা প্রধান কথা এই যে, যতদিন রাজারা দার্শনিক না হইবেন, অথবা দার্শনিকেরা রাজা না হইবেন, ততদিন কোন রাষ্ট্র হইতে অমঙ্গল অপসারিত হইবে না। এই মত অবলম্বনে কেম্পানেলাও তাঁহার রাষ্ট্রব্যবস্থায় দার্শনিকদিগকেই শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত সৌরনগরে একজন বিশেষ বিখ্যাত দার্শনিকই 'সূর্য্য' অথবা মহাতত্ত্বজ্ঞ এইরূপ উপাধিযুক্ত হইয়া প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহার অধীনতায় শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের প্রতীকস্বরূপ তিনজন শাসনকর্ত্তা ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ বিজ্ঞান ও শিল্পের তত্ত্বাবধানের ভার পাইয়াছেন। ইঁহাদের নিম্নে যে বহু রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই কোন না কোন বিদ্যায় পারদর্শী, এবং সকলেই ঐ প্রধান শাসনকর্ত্তা ও তাহার তিনজন মন্ত্রী দ্বারা নির্ব্বাচিত। ইহাদের হস্তে বিশেষ শাসন শক্তি অর্পিত হইবে। ইহা ছাড়া এই শক্তির সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষমতা. এমন কি অপরের পাপ স্বীকার শ্রবণের অধিকার পর্য্যন্ত. যোগ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজে একান্তভাবে একটা অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং তাহাই ইহার উপযোগী।

কেম্পেনেলা তাহার কল্পিত রাষ্ট্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেন যে ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার ক্যাথলিক মত বিরোধী দুই শক্তির সম্মিলন, তাঁহার খৃষ্টীয় নীতি বিরোধী বিবাহ প্রথার প্রচলন এবং যথেচ্ছাচারিতার হাতে নিজে এতটা ভুগিয়াও সেই স্বেচ্ছাচারমূলক রাষ্ট্র নীতির সমর্থন, তাঁহাকে দার্শনিকের ইতিহাসে একটা যেন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

(খ)

সোসিয়ালিজম পূর্ব্বে কোন ক্ষুদ্র ও সমাজ হইতে বিযুক্ত সম্প্রদায়ের একটা কল্পনা বা ভাবোচ্ছ্বাসের মত থাকিলেও, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহা মানবসমাজগঠনের একটা সত্য ও সঙ্গত ভিত্তিরূপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্সে প্রথম ইহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার অবকাশ পায়। অবিচক্ষণতার ফলে এতদিন কেবল কথামাত্রেই স্থিত এই নূতন পদ্ধতিকে এখানে যে প্রথম পরীক্ষাধীন করা হয়, জগতের পক্ষে তাহার একটা মূল্য বা উপকারিতা থাকিলেও, ঐ দেশের পক্ষে তাহা খুব হানিকরই হইয়া দাঁড়ায়।

গত শতাব্দীর বিশিষ্ট নিদর্শনস্বরূপ এই নবতর চিন্তাপ্রণালী ফ্রান্সেই কেন বা এতটা অগ্রসর হইয়া পড়ে এবং কেনই বা তাহা এমন চিরস্মরণীয় বিপ্লবে পর্য্যবসিত হয়, এসব কথার আলোচনা এক্ষেত্রে কিছু করা যাইবে না। অবিচক্ষণ অথচ দুঃসাহসিক মত, কু-শাসন, রাষ্ট্র শক্তির দৌর্ব্বল্য এবং নানারূপ সামাজিক ব্যভিচার—এই সকলের সমাবেশেই যে উহা সংঘটিত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে এখানে এইটুকু মাত্রই বক্তব্য।

ঐ যুগের সোসিয়ালিষ্ট প্রবণতার জন্য কেবল মাত্র রুসো (Rousseau) মুখ্যভাবে দায়ী নহেন। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে রুসোর মত এই যে রাষ্ট্রগঠনের সময়ে প্রাকৃতিক অবস্থায় স্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এবং নিজস্ব যাহা কিছু সব একেবারে অবাধে অপরের হাতে অর্পণ করিয়াছে। সকলে সমানভাবে এইরূপ করায় সামাজিক সাম্য ও পরস্পরের সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু এরূপ ভারার্পণের সময় প্রত্যেকের কিছু না কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল। তবেই ঐরূপ সম্পত্তির সৃষ্টি মানুষের রাষ্ট্র জীবনেই ঘটে নাই বলিতে হইবে।

সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ঐ কথায় রুসোকে সঙ্ঘতন্ত্রবাদী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সাম্য শব্দটির বিকৃত অর্থে সম্পত্তির সমতাও বুঝাইতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া নিজেকে একান্তভাবে তাহার অধীন করার মানেও কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্রও বুঝাইতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপে সাধারণ সম্পত্তির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রস্বরূপ একটা রাষ্ট্রের কল্পনা রুসোর ঐ কথা হইতে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নয়। এইরূপে গত শতাব্দীতে ফ্রান্সের বিপ্লব যে ঐ প্রকার মতের অনুসরণে ঘটিয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যই অসঙ্গত নয়।

সূক্ষ্ম বিচারে রুসোকে যদি সঙ্ঘতান্ত্রিক লেখকের সামিল না ধরা যায়, তাঁহার সমসাময়িক মেব্লী ও মরেলী (Mably and Morelly) ঐ শ্রেণীর লেখকের মধ্যে গণনীয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন অনেকাংশে কেবল ভাবুক মাত্র। কিন্তু অপরজনের ভিতরে কার্য্যক্ষমতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। রুসোর অভিযোগ এই যে মেব্লী কোনরূপ সঙ্কোচ বা ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহারই আমূল অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার ইহাই মনে হয় যে, মেব্লীর বিশেষ মতগুলি কোন আধুনিক ও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক অপেক্ষা প্রাচীন প্লেটোর মতের উপরেই অধিক প্রতিষ্ঠিত। ইহাও বেশ বুঝা যায় যে, মেব্লীর সাহিত্যিক জীবনে তাঁহার মত গুলির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আগেকার লেখায় মেব্লী স্বেচ্ছাচারী শক্তিরই প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শেষের লেখায় ঐ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সমাজ বিষয়ক নীতি একরূপ বদলাইয়া গিয়াছে। এবং ইহা অপর কোন কারণে নয়, তাহার নিজের সদিচ্ছার প্রণোদনেই ঘটিয়াছে। কারণ তিনি নিজে অভিজাত বংশে জন্মিয়াও এবং ভবিষ্যৎ উন্নতিদ্যোতক বড় সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও

নিজের ইচ্ছাতেই এই সব সুযোগ ত্যাগ করিয়া সাহিত্য সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন।

মেব্লীর মতে সামাজিক অবস্থার বৈসম্যই সকল অনিষ্টের মূল। ইনি বলেন—"যখনই মানুষের মনে সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের সহিত বড় বড় ভূসম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধীয় বৈষম্য জন্মিল, তখনই রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ধনলিপ্সা ও দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয় জুড়িয়া বসিতে অবকাশ পাইল। সম্পত্তির সহাধিকারিতা প্রবর্ত্তিত কর, দেখিবে সহজে আবার অবস্থাগত সাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং এই দুই ভিত্তির উপর মানুষের সামাজিক মঙ্গল আবার নিরাপদে খাড়া রহিবে।"

বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকিলে কোন কার্য্যের প্রতি লোকের তেমন প্রবৃত্তি জন্মায় না, এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে মেব্লীর উত্তর এই, যে এইরূপ ঘটে কেন, না ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়া কার্য্যের অন্য কোন উচ্চতর লক্ষ্য মানুষ এখন তেমন যেন ধারণা করিতেই অপারগ। কিন্তু যে পরিশ্রম এখন শ্রমিকের পক্ষে ভারবহ মনে হয়, যদি ধনী-দরিদ্র বা প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া সকলেই ঐ পরিশ্রমের অংশ লয়, তবে ঐ দুঃখের ভার কি তখন সুখের খেলার মত হইয়া দাঁড়াইবে না?

কিন্তু মেব্লী ইতিহাসের সত্য যেন তেমন ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। নহিলে সম্পত্তির সহাধিকারিতার কথায় তিনি স্পার্টার দোহাই পাড়িলেন কেন? প্রথম ডোরীয় (Dorian) বিজেতাদের সময়ে যদি ভূসম্পত্তির সমভাগের নিয়ম সেখানে চলিয়াও থাকে, এরিষ্টটলের পূর্ব্বেই তাহা উঠিয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া, সেখানকার প্রণালী আগাগোড়াই বহু সাধারণ দাস রক্ষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং

সেখানে স্বত্বস্বামিত্ব ভোগী অধিবাসী ও নিম্নতর সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদও চিরদিন বিদ্যমান ছিল।

মেব্রী ছিলেন ভাবুক মাত্র। তাঁহার আলোচ্য নীতি যে সমাজে কার্য্যতঃ স্থান পাইতে পারে, এ আশাই তিনি করিতেন না। সম্পত্তির সহাধিকারিতা ও আর্থিক অবস্থাগত সাম্য যে কোনদিন সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে এটা তিনি অসম্ভবই মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "এ সম্বন্ধে সমাজে যে দুষ্ট রীতি রহিয়াছে, তাহা দুরপণেয়; সেই জন্য তিনি মধ্যপথ ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট একটা পরিমাণের অধিক ভূসম্পত্তি কাহারও থাকিবে না, কোনও ব্যয় কেহ করিতে পারিবেনা, এইরূপ সব আইনের কথাই তুলিয়াছেন। এবং কিন্তু তাহার মত পণ্ডিতের কাছে অতীতের প্রমাণে ইহা অজানা ছিল না যে, এরূপ ব্যয় সম্বন্ধীয় নিয়ম মানুষের অমিতাচারিতা ও ভোগ লালসা কোন দিন দমন করিতে পারে নাই।

সঙ্ঘতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে ইঁহার সমসাময়িক মরেলীর কতকগুলি কবিতা ও অপর লেখা আছে। কিন্তু গতশতাব্দীর গ্রন্থকার হিসাবে তাহাকে নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই একজন ফরাসী লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাই হৌক, তাঁহার লেখা পড়িয়া এটা বেশ বুঝা যায় যে, তিনি যাহা চাহিতেন সে বিষয়ে তাঁহার যথাযথ জ্ঞান ছিল এবং তাহা লোককে জানাইতে তাঁহার সাহসের অভাবও ঘটে নাই। তাহার লেখার প্রতি কিছুদিন লোকের দৃষ্টি বড় আকৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু পরে এই লেখার প্রভাব মেব্রীর সমস্ত পাণ্ডিত্য ও বিচারযুক্তিপূর্ণ রচনাপদ্ধতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

পরবর্ত্তী লোকমতের উপর মরেলীর প্রভাব এই জন্যই ঘটিয়াছিল; কেন না, এতদিন যাহা একটা স্বপ্ন বা কল্পনাবৎ ছিল, তাহাকে তিনি

একটা বিশেষ আকার দিয়াছিলেন। তাহার গোড়ার কথা হইল এই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানুষকে ভাল ও মন্দ দুইই করা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তজ্জনিত অর্থলিপ্সাই সমস্ত অনর্থের মূল। সুতরাং যেখানে এরূপ সম্পত্তির বিলোপ ঘটিবে, সেখানে ইহার কুফলও আর দেখা দিবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থই কর্ম্মের প্রণোদক, একথার তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছেন।—মানুষের যথেচ্ছ খেয়াল প্রসূত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেই আলস্য উদ্ভূত হয়। কারণ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কতকগুলি লোক নিজের সৌভাগ্য ও সম্পত্তির উপর ভর করিয়া দিব্য আরামে দিন কাটায়, অপরে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও যথেষ্ট জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। এই প্রভেদই প্রথমোক্তের মধ্যে আলস্য ও আরাম প্রিয়তা আনয়ন করিয়াছে এবং শেষোক্তেরা ঐ অপরের দ্বারা আরোপিত কর্ত্তব্যের প্রতি বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার সমাজ ব্যবস্থার প্রধান নিয়মগুলি এই—প্রথম, নিজের অভাব-পূরণ, সুখ সাধন বা কার্য্য পরিচালনার্থ দৈনিক যাহা প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন সমাজে অন্য কিছুরই উপর কাহারও বিশেষ ব্যক্তিগত অধিকার কিছু থাকিবেনা। দ্বিতীয়, প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রীয় সাধারণ নিয়মে কার্য্যে নিয়োজিত, পরিপোষিত ও সংরক্ষিত হইবে। তৃতীয়, প্রত্যেক অধিবাসীকেই বলবুদ্ধি ও বয়স অনুসারে সাধারণ মঙ্গলসাধনে ব্রতী থাকিতে হইবে। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া সকলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত থাকিবে এবং পরিবার, জাতি, নগর ও প্রদেশ অনুসারে সমস্ত অধিবাসীকে ভাগ করা হইবে। কোনও একস্থানে অধিক ধনসঞ্চয় নিবারণকল্পে সমস্ত বিক্রয় ও বিনিময়ের কাজ নিষিদ্ধ থাকিবে। বিশ হইতে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই কৃষিকার্য্যে নিরত রহিবে।

বিবাহযোগ্য বয়স হইলে সকলেই বিবাহ করিতে বাধ্য এবং চল্লিশ অবধি কেহই অবিবাহিত অবস্থায় থাকিবে না। পাঁচ বৎসরের পর বড় বড় সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। শ্রমশিল্পাগারে বয়স্কেরা তাহাদের অধীন লোকদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। এই ধর্ম্ম একটা অস্পষ্ট ঈশ্বরবাদ মাত্র।

মরেলীর কর্ম্মচারী নিয়োগ ও শাসন পদ্ধতি এইরূপ। প্রত্যেক পরিবার যে জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য একটি প্রধান ব্যক্তিকে মনোনীত করিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই সব মনোনীত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিবে। নগর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সমগ্র রাষ্ট্রের এবং সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ আজীবন নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

দণ্ড বিধিতে এই আইন থাকিবে যে, যে কোন শ্রেণীরই লোক, যদি কেহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা চালাইতে প্রয়াস পায়, তবে উচ্চতর আদালতের বিচারের পর মানুষের শত্রু বা উন্মাদ রূপে তাহাদের সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে নির্ম্মিত গুহার মধ্যে যাবজ্জীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহার নাম অধিবাসীদের তালিকা হইতে উঠিয়া যাইবে। তাহার পরিবার ও সন্তানগণ তাহার নাম ত্যাগ করিয়া বিভক্তভাবে অপর কোন সম্প্রদায় নগর বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠিয়া গেলে শ্রমিকের মধ্যে কার্য্য খুব আনন্দদায়ক হইয়া দাঁড়াইবে এই ধারণা মরেলীর থাকিলেও, তবু ঐ সম্পত্তিপ্রথার পক্ষাবলম্বী লোকও যে চিরদিন থাকিবে, ইহাও তিনি মনে করিতেন।

সকল মানুষ সমান—এই ভাবটা মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়া বসিলে সেই সঙ্গে স্বতঃই সমস্ত সামাজিক বৈষম্য উঠাইবার একটা আগ্রহও জাগিয়া উঠে। সাম্যের ভাবটিকে বিচারসঙ্গত করিতে হইলে ব্যক্তিগত

সম্পত্তি যে একটা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান, এমন কি উহা যে দুর্ব্বলের নিকট হইতে প্রবলের অপহরণ, ইহা অবশ্যই দেখান প্রয়োজন। নহিলে কোন ন্যায়পর রাষ্ট্রকে উহা উঠাইবার জন্য পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বৃসো ডি ওয়ারভিল (Brissot de Warville) ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করেন। তিনি এইরূপ প্রথাকে উঠাইবার জন্য পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিতে ছাড়েন নাই। পশুজাতির মধ্যে যেরূপ স্ত্রী পুরুষের অস্থায়ী সম্মিলন প্রচলিত, পারিবারিক জীবনের উচ্ছেদার্থ তিনি সেরূপ সম্মিলন পর্য্যন্ত অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার বার বৎসর পরে ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুরু হয়। তখন সম্পত্তির সীমা নির্দ্ধারণ এবং উইল করিবার অধিকার সম্বন্ধে প্রবল আলোচনা চলিতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক নব নব বিদ্রোহের পর ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা আরও যেন দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সাম্যবাদীদের একটা ষড়যন্ত্র ঘটে। রবস্পিয়ারের (Rob speare) পতনে যে সব জেকোবিন রাজকীয় শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারাই উহা ঘটাইয়াছিল। বিদ্রোহীদের ইহাই শেষ প্রয়াস। কারণ জনসাধারণ এরূপ উন্মাদনায় ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামই চাহিতে ছিল।

কারাবন্দী জেকোবিনরা (Jacobin) এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে। এইরূপ বিবৃত আছে যে ঐ সব বন্দীদের মধ্যে একজন মরেলীর খুব পক্ষপাতী ছিল। তাহার কাছে মরেলীর একখানা গ্রন্থও ছিল। রাষ্ট্রীয় একটা মুক্তির আইনে যখন তাহারা বন্দী দশা হইতে মুক্ত হইল, তখন সাম্যবাদীদের সম্প্রদায়টিকে আবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং সে চেষ্টা কতকাংশে সফলও হইল। কিন্তু তাহারা একত্র হইয়া শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে, তাহারা সকলেই এক মতাবলম্বী

নয়। কেহ কেহ ছিলেন পূর্ণ সাম্যের পক্ষপাতী। সম্পত্তি ও পরিশ্রম-ব্যাপারে সকলের সহাধিকারিতা ও সহযোগিতা এবং অবস্থাগত ও আরাম-বিরামগত সাম্য এই সবই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। কেহ কেহ আবার সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সম্পত্তির সীমা-নির্দ্ধারক আইনকে যথেষ্ট মনে করেন। ইঁহাদের মতে অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন কিছু সংঘটন না করিয়া কেবল ধ্বংসই করে। এই সব সাম্যবাদীদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার সভাসমিতির অধিবেশন হইত। ঐ সাধারণ প্রকাশ্য সভা ফরাসী প্রজাতান্ত্রিকশাসনসঙ্ঘের সন্দেহ উদ্রেক করে। তাহাতে ঐরূপ সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি তখন আভ্যন্তরিক সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি এই শাসকসঙ্ঘের আদেশক্রমে সাম্যবাদীদের ঐ সভা ভাঙ্গিয়া দেন, এবং তাহাদের সভা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদুপরি সীল লাগান। ইহার পর সাম্যবাদীরা দেশের কয়েকজন পুলিশকে নিজেদের সম্প্রদায় মধ্যে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ সব দলও শাসক সঙ্ঘের দ্বারা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল। তখন সাম্যবাদীরা সাধারণ স্বত্ব-সংরক্ষণ কল্পে একটা সমিতি স্থাপন করে। এই সমিতি পার্ব্বত্য সেনা-দলের যাট জনকে যখন নিজেদের মধ্যে আনে, তখন আবার একটা ষড়যন্ত্রের কল্পনা করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা সতের হাজার লড়াইয়ের লোক তাহাদের দলের মধ্যে আছে বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু ইহারা সেনা দলের একজন কর্ম্মচারীকে যখন নিজেদের মধ্যে আনিতে চেষ্টা পায়, তখন ঐ কর্ম্মচারিটি শাসকসঙ্ঘের সম্মুখে তাহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দেন। ষড়যন্ত্রের নায়কদের তখনই ধৃত করা হইল। নায়ক দুই জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অপর পাঁচজন নির্ব্বাসিত হইলেন। সিল্‌ভ্যান মারেশাল (Sylvan Mareehal) নামে এই

দলের মধ্যে একজন ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ঘোর নাস্তিক, এবং নাস্তিকতাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বষয় ও উচ্চতম কর্ত্তব্য রূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি লিখিয়া প্রচার করেন,—"তাঁহারা সকলেই হয় যথার্থ সাম্য, নয় মৃত্যু চান। ফরাসী বিপ্লব পরবর্ত্তী বৃহত্তর ও গভীরতর শেষ এক বিপ্লবের সূচকমাত্র। যদি প্রয়োজন হয়, সমস্ত শিল্প বিদ্ধস্ত হউক, তথাপি সর্ব্বগত সাম্যের প্রতিষ্ঠা চাই।"

ইনি সম্পত্তির সীমা নির্দ্ধারক আইনের তীব্র প্রতিবাদই করিয়াছেন। ইহার মতে উহা কতকগুলি নীতিহীন সৈনিকের ও বিচারযুক্তি হীন ব্যক্তিবর্গের উদ্ভাবনা। এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এই—"ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ও সঙ্গততর বস্তুই আমাদের লক্ষ্য। সে বস্তু হইল সাধারণ সুখসম্পত্তির সহাধিকারিতা। ব্যাক্তিগত ভূসম্পত্তি আর থাকিবেনা। জমিতে কাহারও ব্যাক্তিগত অধিকার নাই। ক্ষেত্রের ফল ও ফসল সকলেরই ভোগ্য বস্তু।"

ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ইটালীবাসী বোনারোটি (Buanonarotti) একজন। ইনি বহুবৎসর নির্ব্বাসনে কাটাইবার পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একখানি অর্থ নৈতিক পুস্তিকা প্রচার করেন। ইহাতে সাম্যবাদীদের উদ্ভাবিত ফ্রান্সের নূতন গঠন ব্যবস্থা প্রকাশ পায়। ঐ ব্যবস্থা মতে প্রত্যেক লোকের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি জাতীর সাধারণ ধনভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হইবে। সর্ব্বসাধারণই তাহার তত্ত্বধানের ভার লইবে, এবং সাধারণ সঙ্ঘই প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের অবস্থায় যিনি সঙ্ঘের সভ্য না হইবেন, তাঁহাকে কোন সরকারী কাজ দেওয়া হইবে না। ষাটের নীচে প্রত্যেক সভ্যকেই হয় কৃষি, নয় কোন দরকারী শিল্পকার্য্যে নিরত

থাকা চাই। ঐ সব দরকারী শিল্প অনুসারে অধিবাসীদের শ্রেণী বিভাগ থাকিবে। প্রত্যেক শ্রেণীনির্ব্বাচিত শাসন-কর্ত্তার তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক জেলা বা সঙ্ঘের বিবিধ কার্য্য চলিতে থাকিবে। এই সকল শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে যাহা পাকা মাল, তাহার কিয়ং অংশ সাধারণ ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকিবে। বাকি অংশ সকলের মধ্যে দরকার মত বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। সাধারণ সঙ্ঘই সমস্ত কল কারখানার পরিচালনা করিবে। শাসনকর্ত্তাদের নির্দ্দেশ অনুসারে আমদানী ও রপ্তানী চলিতে থাকিবে। পণ্যই কর স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। কোন প্রকার মুদ্রা আর প্রস্তুত হইবে না। স্থানান্তর হইতে যে সব মুদ্রা জাতীয় সঙ্ঘে আসিবে, তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইবে। প্রয়োজন ঘটিলে, শাসনকর্ত্তারা শ্রমিকদিগকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিবেন এবং অলসদের উপর বাধ্যতামূলক কার্য্যের ভারও অর্পণ করিতে পারিবেন।

এই উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি কিছু চিত্ত-আকর্ষণযোগ্য। কারণ ইহা অনেক বিশিষ্ট বিষয়ে আধুনিক জারম্যান সোসিয়ালিষ্টদের নবতর সমাজব্যবস্থার পূর্ব্বাভাসস্বরূপ। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর আকস্মিকভাবে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পায় নাই, কারণ ওরূপ দুঃসাহসিক চেষ্টার বিফলতা অনিবার্য্য। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপই এ ক্ষেত্রে যথাযোগ্য পন্থারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এক হিসাবে পূর্ব্বোক্ত সাম্যবাদীদের ষড়যন্ত্র সামাজিক কল্যাণই সাধন করিয়াছে। নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত সম্রাজ্যের স্থিতিকালে এবং ইহার পতনের পর এক পুরুষ পর্য্যন্ত, যত দূর বুঝা যায়, ওরূপ বিপ্লব সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ চেষ্টা কোথাও লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু

প্রাচীন রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময়ে ফ্রান্সে আবার সঙ্ঘতান্ত্রিক অথবা অর্দ্ধ সঙ্ঘতান্ত্রিক সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়। এবং ইহাই ক্রমে জনসমূহের ভিতর সংক্রামিত হইয়া বর্ত্তমান সমাজভিত্তির উপরে আক্রমণে উদ্যত হয়।

(গ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে ফ্রান্সে সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক যে সব যুক্তিতর্ক উপস্থিত হয়, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তাহার সবগুলিকেই সঙ্ঘ বা সমাজতান্ত্রিক বলা যায় না। অতএব সোসিয়ালিজমের আলোচনায় সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোন কথা তুলিবার এখানে তেমন প্রয়োজন নাই। কিম্বা ঐ সব যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে যাঁহারা বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছেন, ঐতিহাসিক-ক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধে এখানে এমন কিছু উল্লেখ করা যাইবেনা। ইহারা কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া অতি সহজ পরীক্ষাক্ষেত্রেও কিয়ৎ পরিমাণেও কেহ নামেন নাই। যদি বা কোনস্থলে কিছু পরীক্ষার চেষ্টা করা থাকে, তাহা কিন্তু কোথাও সফলতা লাভ করে নাই। এ সম্পর্কে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কেবেটের (Cabet) কল্পনা এবং ফুরিয়ারের (Fourier) বুদ্ধিকে কার্য্যে পরিণত করিবার বৃথা চেষ্টা ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যাহাই হৌক, এই সব দৃষ্টান্ত স্থলে আদি সঙ্ঘতান্ত্রিক লেখকদের নীতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া অথবা সঙ্ঘতান্ত্রিক মতের নবতর পন্থানুসরণ বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে কিছু বলাও অসঙ্গত নয়।

প্রথম সেণ্টসাইমনের (St. Simon) উদ্ভাবিত সেণ্টসাইমনবাদ (St. Simonism) বলিয়া যে নীতিটি পরিচিত হইয়াছে, সেইটি ধরা যাউক। এই নীতিটি পরে বেজার্ড (Bazord) ও এনফেণ্টিনের

(Enfantin) হাতে অনেকটা রূপান্তরিত ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা সেণ্টসাইমন একজন সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্ভূত ব্যক্তি। ঐ পরিবারের ঊর্দ্ধতন পুরুষ একজন ডিউক চতুর্দ্দশ লুইয়ের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন, এবং তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বিশিষ্ট স্মৃতিলিপি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ বয়সে সেণ্টসাইমন বিপ্লবসংঘর্ষে ফরাসী সেনাদলে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার নব খৃষ্টীয় নীতি প্রকাশের ৫ৎসর মাত্র পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে তাহার জীবন লীলা শেষ হয়। বলিষ্ঠ একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠনোদ্দেশ্য ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতকে একটা নূতন আকারে খাড়া করিয়াছেন। তিনি শিখাইয়াছেন—"দরিদ্র শ্রেণীর দৈহিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে সকল সমাজের চেষ্টা করা উচিত।" এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী রূপে সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। শ্রমশিল্প কার্য্যের মূল্য নিরূপণে তাহার উক্তি এই, যে "যাহার যেরূপ, সামর্থ্য তাহার কার্য্যের মূল্যও তদ্রূপ।" ইহা অবশ্যই কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিক নীতির পরিচায়ক নহে।

সেণ্টসাইমনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের সময় তাঁহার মতানুসারী সম্প্রদায়ের উপর সরকারের খর দৃষ্টি পড়ে। তাঁহাদের মতগুলি ভুল বুঝা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা প্রধান রাজকর্ম্মচারীর উদ্দেশ্যে একখানি পত্রে দোষক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রতি তিনটি বিষয়ে দোষ আরোপিত হয়—সম্পত্তির সহাধিকারিতা, পত্নীর সহাধিকারিতা, গণতান্ত্রিকবিপ্লববাদী সব দলের সহিত সংযোগ। শাসক সঙ্ঘের বিশিষ্ট সভ্য ম্যাগুই ও ডুঁপি (Maguin and Dupin) উঁহাদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন।

উত্তরে তাঁহারা স্বীকার করেন, যে সেণ্টসাইমনের অনুসরণকারীরা সম্পত্তি ও স্ত্রীলোকের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করে, তাহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য যে আছে, ইহা সত্য। শুধু এ বিষয়ে কেন, ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা,রাজকীয় ক্ষমতা,সংক্ষেপে এখন য়ুরোপে যে সব সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়েই এই সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ মতামত আছে। কিন্তু তাঁহাদের উপর যাহা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সম্পত্তির সহাধিকারিতা সম্বন্ধে তাঁহারা এই মত পোষণ করেন, যে মূলে অস্ত্র বা বাহুবলে সমাজে সম্পত্তিগত বৈষম্য ঘটিলেও, এখন সহসা তাহা সংশোধন করিতে যাওয়াটাই বড় কম অন্যায় ও অত্যাচার বলিয়া গণনীয় হইবে না। তাঁহারা এরূপ সাম্যের পক্ষপাতী নন। কারণ তাঁহারা মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, যে নৈতিক বিধি তাঁহারা প্রচার করিতে আসিয়াছেন, এইরূপ সাম্যগত সহাধিকারিতা বস্তুতঃ তাহার প্রতিকূল। সেই নৈতিক বিধি এই যে সমাজে প্রত্যেকেরই স্থান নিজ সামর্থ্যানুসারে নির্ণীত হইবে। প্রত্যেকেই নিজ কর্ম্মানুসারে পুরস্কার লাভ করিবে কিন্তু ঐ বিধির বলেই তাঁহারা ইহাও চান যে সমস্ত জন্মগত সুখ সুবিধা সমাজ হইতে উঠিয়া যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা ঐরূপ শ্রেষ্ঠতম সুবিধা যে পৈতৃকসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব তাহার বিলোপ একান্ত বাঞ্ছনীয়। সমাজে স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ইহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এখনও ইহারা অনেক বিষয়ে পরাধীন। সেণ্টসাইমনের অনুচরেরা নারীর শেষ মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এতদর্থে

অবশ্যই তাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত পবিত্র বিবাহ প্রথার উচ্ছেদকামী নয়। তাঁহারা ইহাই চান যে যথার্থ খৃষ্টীয়ানের মত প্রত্যেক পুরুষকে এই সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হইতে হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে কোন অধিকার-বৈষম্য থাকিবে না। ঈশ্বর নারীজাতির উপরে যে বিশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারই বলে কি ধর্ম্ম, কি রাষ্ট্র কি পরিবার সর্ব্বত্রই স্ত্রী পুরুষের সহযোগীরূপে পরিগণিত হইবে, এতদিন পুরুষই সামাজিক ব্যক্তি ছিল, ভবিষ্যতে সামাজিক ব্যাপারে উভয়েরই সমান অধিকার থাকিবে।

বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক দলের সহিত তাঁহারা একসূত্রে আবদ্ধ, এই যে অভিযোগ করা হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। ঐ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিলেও তাঁহাদের কার্য্য ক্ষেত্র অন্য পথে। তাঁহাদের কার্য্য ধ্বংসাত্মক বা বিপ্লবাত্মক নয়। তাহা শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে সমাজের সংস্কার ও গঠন।

শাসকসঙ্ঘের হস্তে ঐরূপ পত্র পেশ করিবার পরই সেণ্টসাইমনের দুইজন উত্তরাধিকারী বেজার্ড ও এনফেন্টিনের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটে। বেজার্ড ফ্রান্সে কার্বনারী (Carvonari) সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সব সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সেণ্টসাইমন কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, সে গুলির দিকে মনোযোগ দেন। ইঁহারা সকলই একভাবে মানুষের সমান অধিকার বিশ্বাস করিতেন। এখন এইরূপ সাম্যের সহিত সম্পত্তিগত বৈষম্য কিরূপে খাপ খাইতে পারে? কোন সম্পত্তির উপর কাহারও কি একান্ত অধিকার থাকা সম্ভব পর? বেজার্ড এই প্রশ্নের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা নূতন না হইলেও সেণ্টসাইমনের নির্দ্ধারণ অপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট। নিজের অর্জ্জিত সম্পত্তির উপর মানুষের একান্ত অধিকার থাকা অসঙ্গত নয়, কিন্তু উত্তরাধিকারিত্বে

প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর এরূপ অধিকার কেবল জবরদস্ত আইনেরই কাজ। সুতরাং উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপ ঘটান চাই। এখন এই বিলোপ ঘটিলে কাহারও মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি পরিচালনার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? ইহার সমাধান তিনি এইরূপ করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রথমে সাধারণ ব্যাঙ্কে গিয়া পড়িবে। তৎপরে ব্যাঙ্কের পরিদর্শকেরা বিশেষ অনুসন্ধানের পর যোগ্যতম ব্যক্তির হস্তে উহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিবে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে ঐ সম্পত্তি আবার পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত অপর কোন যোগ্যব্যক্তিকে দেওয়া হইবে। এইরূপ পুরুষানুক্রমে সম্পত্তির পরিচালনার কাজ চলিতে থাকিবে। কিন্তু ইহাকে ঠিক সম্পত্তির সহাধিকারিত্বা বলা যায় না।

এই সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা এনফেণ্টিনকে কিছু গর্ব্বিত ও স্বার্থপর লোক বলিয়া মনে হয়। এবং ইহাও সম্ভব যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সম্বন্ধে ইনি অনেকটা ফুরিয়রের মতেরই প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন। যাহাই হোক, সেণ্টসাইমন বা বেজাডের ভিতর এরূপ দেহ-মাত্র সর্ব্বস্ব নীতির কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সভা-মধ্যে এনফেন্টিন যখন তাঁহার ঐ মত ব্যক্ত করেন, তখনই বেজার্ড সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং আর কখনও সেখানে পদার্পণ করেন নাই। এই ঘটনার কিছু পরেই বেজার্ডের মৃত্যু হয়। এই দলের অপর অনেক লোকও শীঘ্রই বেজার্ডের অনুসরণ করিয়াছিল। এইরূপে দলটি ধ্বংসোম্মুখ হইলে ইহার রক্ষার্থ এনফেন্টিন পৈতৃক বাসভবনে গিয়া তথায় ইহার স্থাপনা করেন। কোন ফৌজদারী আইনের বিরুদ্ধাচরণে এনফেন্টিন ও অপর তিন জন যখন ধৃত হন, তখন হইতে এই দলটির চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐ অভিযোগে উহারা সকলেই কারারুদ্ধ

হইয়াছিল। এনফেন্টিন ইহার উপর অনেক বৎসর বাঁচিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের দলের মধ্যে প্রভু বা পিতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য হ'লেও তিনি ও তাঁহার অনুষ্ঠানাদি বিস্মৃতির গর্ভে একেবারে নিমর্জ্জিত হয়।

একটি নূতন দলের প্রতিষ্ঠাতারূপে সেণ্টসাইমন যাহা করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে ফ্রান্সের সামাজিক প্রবন্ধ লেখক খ্যাতনামা ষ্টীন সংক্ষেপে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, 'শ্রম শিল্পী সমাজের দুইটি প্রধান শ্রেণী—মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় সেণ্টসাইমনই প্রথম উত্থাপিত করেন। সমাজ সংস্কারই যে রাষ্ট্র শক্তির পক্ষে এক মাত্র প্রকৃত সমস্যা, এই কথাটি অস্পষ্টভাবে হইলেও প্রথম তিনিই তুলিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও প্রশ্নের অবতারণা তিনিই প্রথম করেন। বলা বাহুল্য, অধস্তন দুই পুরুষের মধ্যে ইউরোপের সমাজ-সংগঠন ঐ প্রশ্নের সমাধানেরই উপর নির্ভর করিবে। পরিশেষে সেণ্টসাইমন সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, কি উপাদান, কি শক্তি, কি নীতির অসামঞ্জস্য, বহু বিষয়ে সমাজ জিনিশটিকে ইনিই প্রথম কতকটা বুঝিতে ও ধারণা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফ্রান্সে ইনিই আধুনিক যুগের প্রথম সীমাস্তম্ভ।"

সেণ্টসাইমনকে একজন খুব গভীর চিন্তাশীল লোক বলিয়া মনে হয়না। তথাপি তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিরা এমন কতকগুলি তরুণ বয়স্কদের আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাহারা পরবর্ত্তীকালে বিবিধ বিভাগে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বুশেজ (Buchez) ইহাদের মধ্যে একজন। ইনি বিপ্লবের ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাদির প্রণেতা। ইনি নিজের সমিতির সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এনফান্টিন যখন নিজের নূতন মত প্রচারে ব্রতী, তখন ইনি এবং ইঁহার বন্ধু বোলান্দ (Bollard) বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন মাত্র।

মাইকেল সিভেলিয়ার (Michael Chivalier) অপর একজন। অগষ্ট কোমৎ তৃতীয়। ইনি নিজের দর্শন আলোচনায় এই সমিতির মত কিছু সংরক্ষণ করিয়াছেন।

সেণ্টসাইমনের মতের সহিত নিকট সম্বন্ধের হিসাবে ইহার পর ফুরিয়ারকেই ধরা যাইতে পারে। তবে এই সম্বন্ধ অবশ্য প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে ততটা নয়, যতটা তদীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ইনি প্রথমে ব্যবসায় বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সম্পত্তি হারাইয়া বসেন এবং পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর পদে সামান্যমাত্র সফলতা লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে জীবন লীলা অবসান করেন। তিনি ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রাম্য গার্হস্থ্য স মতি বিষয়ে প্রবন্ধই তাহার প্রধান গ্রন্থ। প্রসঙ্গান্তরে তিনি ওয়েন এবং সেণ্টসাইমনকেও আক্রমণ করেন।

সেণ্টসাইমনের মতানুযায়ী সঙ্ঘতান্ত্রিকদের সহিত ফুরিয়ারেরও পার্থক্য এই, যে ইনি ইঁহার সঙ্ঘস্থ সভ্যদের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সাম্যের সমর্থন করেন নাই। ইঁহার মতে শুধু কর্ম্মই নয়, দক্ষতা এবং মূলধনেরও যথাযোগ্য পুরস্কার থাকা দরকার। উৎপন্ন দ্রব্যের বার ভাগের পাঁচ ভাগ কর্ম্মের, তিন ভাগ দক্ষতার এবং চার ভাগ মূলধনের জন্য ইনি নির্ণয় করিয়াছেন। কার্য্যের কঠোরতা ও অরুচিকরতা অনুপাতে উহার প্রাপ্য অংশ কিছু বর্দ্ধিত করাও হইয়াছে। তিনি উত্তরাধিকারের নিয়মকেও একেবারে বাতিল করেন নাই। কারণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘে পুরুষপরম্পরায় এক শ্রেণীর সম্পত্তিধারী থাকা যে প্রয়োজন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

কর্ম্মকে রুচিকর করিয়া তোলা তাঁহার অন্যতর উদ্দেশ্য। কর্ম্মীদের প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্মের বণ্টন দ্বারা, একাধিক কার্য্যে একই লোকের

নিয়োগে এবং বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জাগাইয়া তিনি ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের নিকট নৈতিক আত্মসংযমের আশা করা ভুল। ফুরিয়ারের নীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে রাজারাজড়ার অপেক্ষা গরিব দুঃখীরা আরও বেশী ভোগসুখ লাভ করিতে পারিবে।

ফুরিয়ার বহুসংখ্যক লোককে একটী বৃহৎ আবাসে একত্র করিতে চাহিয়াছেন। এই লোকদের সংখ্যা আঠার শত হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে। এখানে সর্ব্বপ্রকার আমোদের বন্দোবস্ত থাকিবে। দৈনিক কর্ম্মের শেষে সকলেই ঐ সব আমোদে যোগ দিতে পারিবে। এতগুলি লোকের বাসোপযোগী এতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর অপেক্ষা ঐরূপ একটা মাত্র আবাসের নির্ম্মাণে খরচ অবশ্যই কম পড়িবে। ইহাতে এবং কার্য্য রুচিকর হওয়ায় উহার বর্দ্ধনে ভোগ্য বস্তুর ও ভোগের অবসরেরও বর্দ্ধন ঘটিবে। কার্য্যের সময় কার্য্য ক্রীড়ার মতনই ঠেকিবে। কার্য্যের অবসানে নূতনতর ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা এই নূতন পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের হার ও লভ্যাংশ অনেক গুণ বাড়িয়া যাইবে।

নিজ পদ্ধতি সম্বন্ধে ফুরিয়ারের ঐরূপ ধারণা অবশ্যই উপহাস জনক। তাঁহার অদ্ভুত নৈসর্গিক দর্শন সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলিব না। তাঁহার নৈতিক বিজ্ঞানে সুখই পরম মঙ্গল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার বাসনা ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই এ সুখের মূল। এতদর্থেই তিনি কর্ম্মকে যথাসম্ভব সুখকর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সতীত্ব ও দাম্পত্য-একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সেণ্টসাইমনের অতি অপদার্থ শিষ্যদের ধারণারও অনেক নীচে। বহু স্বামীত্ব ও বহু

পত্নীত্বের নিয়মও যে ইহারা অনুমোদন করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

(ঘ)

সেণ্টসাইমনের সম্প্রদায়ে এইরূপ ভাব প্রবলছিল যে সামাজিক উন্নতির সমাধান কেবল সামাজিক প্রশ্নের সমাধানেরই উপর নির্ভর করে না, পরন্তু একটা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ভুমি থাকা চাই। লেমেনই এই (Lamennais) নামে এক ব্যক্তি এই মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি প্রথমে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রচারক ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি সহানুভূতি ও ভ্রাতৃভাবের প্রেরণায় তিনি ঐ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জনসাধারণের একজন দৃঢ়ব্রত পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান। অবশেষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে তিনি একরূপ সম্পত্তির সহাধিকারিতার অনুমোদন পর্য্যন্ত করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—"স্বীয় স্বার্থ ও অধিকারের প্রতি অতৃপ্ত বাসনাই যত বিবাদ, বিরোধ ও বিদ্বেষের মূল। ভগবানের বিধানে এরূপ স্বার্থগত অধিকার অভিশপ্ত বলিয়া গণ্য। ইহাতে ধনলিপ্সা অবিরাম বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, কখনও তাহার নিবৃত্তি ঘটেনা। অপরকে ভাগ না দিয়া ভোগ্য বস্তুর ভোগে প্রকৃত সুখন ই।" আরও লেখা আছে, সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর অচল প্রতিষ্ঠার উপরেই সমাজের সংগঠন করিতে হইবে।

এই মৈত্রী ভাবাত্মক ধর্ম্ম অন্যতর আকারেও দেখা দিয়াছিল। ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা (Theosophy) বলা হইয়াছে। ইহা যে সব ভাবপ্রবণ লোকের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা কতক অংশে খৃষ্টীয়ান বটে, তবে জনতন্ত্রের প্রভাবই তাহাদের ভিতর প্রবল ছিল। আবে কনষ্টাণ্ট

(Abbé Constant) ইহাদের মধ্যে একজন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর, একটা বালিকণাও ঈশ্বর।" সম্ভবতঃ ইহাতে Pantheism বা সর্ব্বেশ্বরবাদের তেমন কোন পরিস্ফুট ভাব নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, "পৃথিবীর কোন জিনিসই ইহার বা উহার অধিকারভুক্ত নয়। সবই ঈশ্বরের অর্থাৎ সবই সকলের।" এস্থলেও তিনি যে কি বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু যখন তিনি সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন উহাতে সমাজ সম্বন্ধে সঙ্ঘতান্ত্রিকদের মতই প্রকাশ পাইয়াছে।

ইঁনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বিবাহপদ্ধতির বিলোপ সম্বন্ধে ইনি শিক্ষা দিয়াছেন। ইঁহার মতে তখন স্ত্রী ও পুরুষ অবাধে একত্র বাস করিবে। সন্তানের জন্মের দ্বারাই বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে। এবং ঈশ্বর যখন প্রেম স্বরূপ, তখন এরূপ বিবাহে প্রেমের অভাব ঘটিলেই বিবাহ বন্ধন টুটিয়া যাইবে। এস্কুইরো (Esquiros) এই প্রকার আর এক ব্যক্তি। ইনি ১৮৪০ ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ ক্রমান্বয়ে জনসাধারণের সুসংবাদ (People's Gospel) ও উহার সমর্থনকারী আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি বলিয়াছেন, খৃষ্টীয় ভাবের প্রেরণাতেই তাঁহাদিগের সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। তাঁহার মতে ইউরোপের বহু আধুনিক রাষ্ট্রনীতি খৃষ্টীয় মতের প্রতিকূল।

আমরা এখন একজন ভিন্ন-প্রকৃতির ধর্ম্মপুস্তক-প্রণেতার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইঁনি প্রথমে সেণ্টসাইমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এনফান্টিন যখন নিজের দুর্নীতি পোষক মত প্রচার করিতে থাকেন, তখন তিনি ঐ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন। পিয়েরে লেরো (Pierre Leroux) তাঁহার সময়ের একজন

বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র ও প্রশংসার্হ ছিল। বন্ধুদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার পর তিনি একান্তভাবে জ্ঞানালোচনায় ও গ্রন্থ প্রণয়নে নিরত হন। একখানি কথঞ্চিৎ অদ্ভূত অস্পষ্ট ধরণের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় দর্শন গ্রন্থ তাঁহার ঐ আলোচনার ফল। অপর একখানি সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ক, এবং ইহাতে সাম্যকেই সমাজের প্রতিষ্ঠাভূমি করা হইয়াছে। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিন্দা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষাগুরু সেণ্টসাইমনের ন্যায় ঠিক সঙ্ঘতান্ত্রিকতায় গিয়াও পৌঁছান নাই।

তাঁহার দুইজন শিষ্য তাঁহার সমাজসম্বন্ধীয় মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা হইতেছে। "সম্পত্তি সম্পর্কে সকলেরই দাবী আছে। বিধিগত ভাবে প্রত্যেক জিনিষের ব্যবহারের স্বত্বই ব্যক্তিগত অধিকার বা সম্পত্তি। সমষ্টিগত কেন্দ্ররূপে সমাজই প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষেত্র। প্রত্যেকেই সমাজের নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞানই নিজের কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে যন্ত্রাদি প্রত্যেকে ব্যবহার করে এবং যে সব উপাদান প্রত্যেকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে, সে সকল প্রত্যেকেই সমাজের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়। মূলকথা, সমাজই প্রত্যেককে কার্য্য সাধনের উপযোগী যাহা কিছু সবই প্রদান করিয়া থাকে। প্রত্যেক উৎপাদনের ব্যাপারে সমষ্টিগত ভাবে সমাজ কেন্দ্রই কার্য্য সাধনের উপযোগী আদি উপাদান সমূহ ও যন্ত্রাদির অধিকারী। এবং ঐ কেন্দ্র হইতেই কর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান ও প্রেরণা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ও কার্য্য সম্পাদনের অপরাপর উপায় উদ্ভাবিত হয়। কি শ্রমিক, কি শিল্পী, কি জ্ঞানালোচক, সকলের নিকট হইতেই সমাজ কার্য্য আদায় করিয়া থাকে।

নিজের আনুশাসনিক শক্তি দ্বারা সমাজ সর্ব্বপ্রকার শ্রমশিল্পের উপায় ও উৎপন্নদ্রব্যের বিভাগ করিয়া থাকে। সামাজিক পুরস্কারের

নিয়ম এই যে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ্য ও শ্রমের পরিমাণ এবং অভাব অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের পুরস্কার বিষয়ক কথা ছাড়া আর সকলই সঙ্ঘতান্ত্রিক ভাবাপন্ন। এই পুরস্কারের কথাটা সেণ্টসাইমনের অনুসরণ মাত্র।

এবার একজন খুব পাকা সঙ্ঘতান্ত্রিকের কথা তোলা যাইতেছে। ইহার নাম এতিয়েন ক্যাবেট (Etienne Cabet)। ইনি একজন আইনব্যবসায়ী ছিলেন, এবং প্রাচীন রাজবংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে একজন অত্যাদার (Radical) দলের লোক ছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একটা বিদ্রোহসূচক ব্যাপারে জড়িত থাকায় ইনি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সেখানে তিনি অবসর ক্রমে সামাজিক সমস্যার আলোচনায় বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হন। ইকারিয়ায় জলযাত্রা (Voyage to Icaria) নামক গ্রন্থখানি তাঁহার এই আলোচনার ফল। সার টমাস মুরের ইউটোপিয়ার অনুসরণে এখানি তিনটি ভাগে রচিত। প্রথমভাগে একটি সঙ্ঘতন্ত্রবদ্ধ জাতির বিবরণ ও বর্ণন আছে। দ্বিতীয় ভাগে কিরূপে একটি সম্প্রদায় সঙ্ঘতান্ত্রিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে তাহাই দেখান হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে মোটামুটিভাবে সঙ্ঘতন্ত্রের সমস্ত মত ও নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহার আদর্শগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায় তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় উপনীত হন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট লুই নগরে ইহধাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তথায় একটি উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাঁহার এই উপনিবেশ ও ইহার পরবর্ত্তী শাখাগুলি মোটের উপর সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে আমরা অবশ্যই মনে করিতে পারি,

এসব ব্যাপারের পরিচালনায় তাঁহার তেমন দক্ষতা ছিল না। সম্ভবতঃ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ক্যাবেট প্যারিসনগরে তাহার সঙ্ঘতান্ত্রিক মত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সেই পুস্তক হইতে নিম্নে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশে কোথাও সংক্ষেপে অনুবাদের আকারে গ্রন্থকারের মত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"আলোক, উত্তাপ ও বাতাসের মত এই পৃথিবীও যে অবিভক্তরূপে সকলেরই উপভোগ্য, ইহাই আমি প্রকৃতির নির্দ্দেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। কেবল ব্যক্তিগত অভাব মোচনার্থই নিতান্ত অবশ্যকায় দ্রব্যজাত এবং উৎপাদনের কার্য্য প্রকৃতির নির্দ্দেশ ক্রমে বিভক্ত হইতে পারে। সঙ্ঘতন্ত্রই এই বিভাগ সংঘটনের প্রকৃষ্ট স্বাভাবিক পদ্ধতি। আমি মনে করি, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ জিনিশটি নিতান্তই কৃত্রিম আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠান। এসম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে পৃথিবী যদি সকলের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হয়, তবেই ঐরূপ প্রতিষ্ঠান মঙ্গলপ্রদ। কিন্তু যেরূপভাবে সকল জাতির মধ্যে সম্পত্তিগত অধিকার বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা বড়ই ভুল, সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল। আমার বিশ্বাস ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে যে সব কুফল উৎপন্ন হয়, তাহার মুল বিদ্যমান থাকিতে ঐ সব কুফল কখনই নিরাকৃত হইবে না। ঐ সব কুফলের সম্যক্ নিরাকরণ করিতে হইলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ প্রতিষ্ঠানটি তুলিয়া দেওয়া চাই।"

বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা এই যে এইরূপ স্ত্রী-পুরুষগত সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপেই মানব প্রকৃতির উৎকর্ষানুমত এবং ইহা ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষারও উপযোগী। বর্ত্তমানে যাহা কিছু অমঙ্গল ইহার সহিত জড়িত আছে, সাম্য ও সহাধিকারিতার প্রতিষ্ঠায় তাহা দূরীভূত হইবে। সঙ্গত পরিমাণ কার্য্যের বিনিময়ে সমাজ যখন

প্রত্যেকের আবশ্যক মত জীবিকা প্রদানে সমর্থ হইবে, তখন সকলেরই যে বিবাহ করা উচিত হইবে তাহাই নয়, পরন্তু এ সম্বন্ধে সকলের মধ্যে একটা আগ্রহও দেখা যাইবে। আরও, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে অনুরাগ বন্ধন এখন আছে, তাহা যতই দৃঢ় হউক না কেন, বর্ত্তমান বৈষম্য মূলক সমাজ পদ্ধতিতে ঐ বন্ধন হইতে যে সব অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে গুলি তখন আর দেখা যাইবে না।

অবিভক্ত সম্পত্তির মত জাতীয় সম্পত্তি কেবল সমাজের অধিকার-ভুক্ত হইলে, সমাজ বা উহার প্রতিভূস্বরূপ যাঁহারা ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন এবং দেশবাসীদের দ্বারা উহার কর্ষণ করাইবেন, তাঁহারাই ঐ কর্ষণজাত সমগ্র ফল একত্র করিবেন, অসন বসন ও বাসের জন্য বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পরিমাণ নির্ণয় করিবেন এবং ঐ পরিমাণ অনুসারে সমস্ত ফল বণ্টন করিয়া দিবেন। তিনি মনে করেন, দেশের জমি এইরূপে নিয়মে কর্ষিত হইলে জমিজমার ব্যক্তিগত সীমা নির্দ্দেশ আর থাকিবে না, পতিত সব জমির চাষ আবাদ হইতে থাকিবে, কৃষিকার্য্য ও আয় ব্যয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে এবং উহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের আয় দ্বিগুণ ত্রিগুণ এমন কি দশগুণ বাড়িয়া যাইবে।

সমাজের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এই যে, এ ক্ষেত্রেও সমাজই সমস্ত কার্য্য বিভক্ত ও নির্দ্দিষ্ট করিবে, বিবিধ কর্ম্মশালার স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং কোথায় কত শ্রমিকের প্রয়োজন তাহার নির্ণয় করিবে। এইরূপ সঙ্ঘতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কলকারখানা যতই বাড়ান হউক, তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইতে পারে না; ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিই উহাদের ব্যবহারের নিয়ম স্থির করিয়া লইবে। কর্ম্মকে যথাসম্ভব সহজসাধ্য ও আনন্দায়ক করিবার জন্য নানাবিধ

চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই সম্মানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া চাই। দেশবাসী সকলকেই শ্রমিক হইতে হইবে। প্রত্যেকেই যতদূর সম্ভব নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে নিজের কার্য্য নির্ব্বাচন করিবে। সকলেই সমান সময় কার্য্য করিবে। পরিশেষে তিনি বলিতেছেন, "আমার বিশ্বাস শ্রমশিল্প এইরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলে অতিরিক্ত কাজ কাহাকেও করিতে হইবে না, ক্ষতিও বেশী কখনও হইবে না। আয়ের দিক খুবই বাড়িবে, অন্ততঃ পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে।" পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে ইনি আরও বলিয়াছেন, "আমার মনে হয়, যে ধারণায় কমিউনিজম বা সঙ্ঘতন্ত্র আকাশকুসুম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা কুসংস্কার মাত্র। অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফলে এই সংস্কার নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে।" এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন, যে বল প্রয়োগে উহা ঘটান ঠিক হইবে না। বহু সংখ্যক ছোট ও বড় সত্ত্বাধিকারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ যদি অল্পসংখ্যক লোক সমাজে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিতে প্রয়াস পায় এবং বর্ত্তমান ধনাঢ্য শ্রেণীকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে, তবে প্রচলিত আচার ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের বিপ্লবকারী ঐ প্রয়াস এরূপ বিষম বাধা প্রাপ্ত হইবে, যাহা কখনও কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের বেলায় এপর্য্যন্ত ঘটে নাই। এই স্থিতিশীলতার বাধার মুখে ঐ নব উদ্যম বিফল হইয়া যাইবে;

জনসাধারণের ইচ্ছার পরিবর্ত্তনে যখন নূতন মত গড়িয়া উঠিবে, যখন সকলে না হউক অন্ততঃ বহুসংখ্যক লোক আইনসঙ্গত ভাবে এই দিকে ঝুঁকিবে, তখনই ঐ নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সম্ভব হইবে। সংস্কার বা বিপ্লবের দিক দিয়া দেখিলে, ইহার জন্য একটা রূপান্তরিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে। গণতান্ত্রিক শাসননীতি

ক্রমশঃ বৈষম্যের পরিহার ও সাম্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারা কমিউনিজমের প্রবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ হইবে।”

এবার আমরা একজন সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতি লোকের কথা বলিব। এ সম্বন্ধে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের মধ্যে ইনি উল্লেখযোগ্য শেষ ফরাসী সংস্কারক। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লুইব্ল্যাঙ্ক (L uis Blanc) জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সম সময়ে বিখ্যাত ফরাসী সোসিয়ালিষ্টদের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ বয়স্ক ছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। লুই ফিলিপের পতনের পর ইনি ইঁহার দলের মধ্যে এমন বিশিষ্ট হইয়া উঠেন, যে ইঁহাকেই সাময়িক শাসন পরিষদের একজন সদস্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহসূচক গণ্ডগোলের মধ্যে লিপ্ত থাকায় দণ্ডবিধির কবল হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ইঁহাকে দেশ ছাড়িয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিতে হয়। এখানে ইনি বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন, এবং এইখানে ইনি তাহার ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধীয় বৃহৎ গ্রন্থ দ্বাদশ খণ্ডে পরিসমাপ্ত করেন। ইহা ছাড়া, তিনি আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। শ্রমসংগঠন (Organ sat o of Lab ur) নামক একখানি পুস্তকে ইনি তাঁহার সমাজ ও সঙ্ঘবিষয়ক মতামত প্রকাশ করেন।

তাঁহার সমাজসম্বন্ধীয় ধারণা বিশেষ নূতন কিছু নয়। তাহা এই যে নিজের ত্রুটির জন্য মানুষ নিজে দায়ী নয়, প্রত্যুতঃ সমাজই দায়ী। সুতরাং যে সমাজ উৎকৃষ্ট ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গও অবশ্য উৎকৃষ্ট। সমাজিক বৈষম্য হইতেই দাসত্বরূপ অমঙ্গল উদ্ভূত হইয়াছে। আবার এই বৈষম্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থারই ফল। তাই এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজের মহা অভিশাপস্বরূপ একটা মহাপাপ। উৎপাদন ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রশক্তির হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রের হাতে এই শক্তি এতটা থাকা দরকার যাহাতে এইকাজটা ইহা দ্বারা সুসাধিত হয়। জাতীয় শ্রমশিল্পের বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলিতে সাধারণ কর্ম্মশালার স্থাপনা করিতে হইবে। এতদর্থে সরকার বিনাসুদে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই সব কর্ম্মশালার পরিচালনার জন্য শ্রমিকেরা নিজেদের তত্ত্বাবধায়ক নির্ব্বাহ করিবে, এবং সকল শ্রমিককেই সমান বেতনে কার্য্য করিবে হইবে। ইহারা নিজেদের মধ্যে একটা জমাট ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে এবং যখন এই শ্রমশিল্পসম্বন্ধীয় কারখানার শ্রমিকদের সহিত কৃষি বিভাগের কর্ম্মীদের সমবায় ঘটিবে, তখন দেশের সমস্ত শিল্প একই কেন্দ্রে সংহত হইবে। এইরূপ ভাবের শ্রমিকসঙ্ঘের সংগঠনের জন্য যে প্রভুত অর্থের প্রয়োজন, তাহা প্রচলিত উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপের দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপে জাতীয় শ্রমিকসঙ্ঘের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিলে, কোন ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত ভাবে কেহই তার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না। সঙ্ঘগত ও ব্যক্তিগত উভয়বিধ কার্য্য আর বেশীদিন চলিবেনা, ক্রমে প্রতিযোগিতায় সাধারণ বা সঙ্ঘগত কার্য্য পদ্ধতির নিকটে ব্যক্তিগত ব্যবসায়াদি পরাভূত হইয়া বিলুপ্ত হইবে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লুই ব্ল্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতি বিশেষভাবে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বহু সাধারণ কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক প্যারিনগরে দৈনিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিককে সাধারণ কর্ম্মশালায় নিযুক্ত করা হয়। বেশী দিন এইরূপ চলিলে জাতীয় ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিত। দেশের মধ্যে এইসব শ্রমিকের দল বিশেষভাবে বিপ্লবাত্মকরূপে গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ঐ বৎসরের মে ও জুন মাসে ঐরূপ বহু শ্রমিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এই অছিলায় নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায়।

পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের উপর লুইব্ল্যাঙ্ক কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার মতে পরিবার একটা স্বভাবিক প্রতিষ্ঠান। কোন মতে এইটিকে ধ্বংস করা যাইতে পারে না। কিন্তু উত্তরাধিকারিত্ব একটা কৃত্রিম ব্যবস্থামাত্র। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই এটির বিলোপ ঘটিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "পরিবার ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে, কিন্তু উত্তরাধিকারিত্ব মনুষ্য হইতে উদ্ভূত। অতএব পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ঈশ্বরের মতই পবিত্র ও অমর। কিন্তু উত্তরাধিকারিত্বের নীতি সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত অবশ্যই রূপান্তরিত হইবে।"

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসকারী বলিয়া যখন তাঁহার উপর দোষারোপ করা হয়, তখন তিনি বলেন, পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবশ্য একটা ধ্বংসের ভাব থাকিবে। কিন্তু ওরূপ ধ্বংসের ভাব কিছু দিনের জন্য অনুভূত হইবে মাত্র। উহার মধ্য দিয়া পৃথিবী ক্রমে উৎকৃষ্টতর সমাজ শৃঙ্খলায় উপনীত হইবে। তিনি সম্পত্তির সত্বাধিকারিতা সম্বন্ধে তত বেশী কিছু বলেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে শ্রম পরিচালনার উপরেই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। তাহার প্রস্তাবের মধ্যে বিশিষ্ট নূতন এমন কিছু নাই। কিন্তু সমাজকে সহসা একেবারে ওলট পালট না করিয়া কিরূপভাবে ক্রমে উহার রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়, সেই দিকে মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করাই তাহার আলোচনার বিশেষত্ব। সম্ভবতঃ এসম্বন্ধে অপর ফরাসী সংস্কারক অপেক্ষা ইনিই পরবর্ত্তী জার্ম্মান সোসিয়ালিজমের পথ অধিক পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতি—

Interntional Working men's Association.

(ক)

ফরাসী বিপ্লবের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে এবং য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। যাহারা ফিউডাল অর্থাৎ সামন্ত ভূম্যধিকারীদের যুগে ক্রীতদাস স্বরূপ ছিল, সেই কৃষক সম্প্রদায় ফ্রান্সে বহুল সংখ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাবাড়ীর মালিক হইয়া উঠিল এবং এইরূপে জাতির মধ্যে স্বাধীন শ্রমিকদের একটা বড় শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটিল। এই নবতর স্বাধীনতার ফলে সহরে নাগরিকদের শ্রমশিল্পের বিশেষ বিস্তৃতি সাধিত হইল, এবং সেই সঙ্গে কলকব্জার বহুল প্রবর্ত্তনে ও মূল্যবদ্ধনে ঐ সব শ্রমিকদের পক্ষে মূলধনীরূপে বড় বড় ব্যবসায়ের মালিক হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ফরাসী বিপ্লবের ফলে একটা সাম্যের ভাব জাগ্রত হইয়া উঠায়, শ্রমিকেরা মনে করিতে লাগিল যে যথাযোগ্য স্থানের বহু নিম্নে তাহাদের চাপিয়া রাখা হইয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের প্ররোচনায় শ্রমিকদের এই অনুভূতি আরও যেন তীব্র হইয়া উঠিল। এইরূপে সহরে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে অনিবার্য্য একটা ভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি হইল। একপক্ষে দাঁড়াইল ব্যবসয়ের মূলধনী মালিক। অপর পক্ষে সাধারণ শ্রমিক। দুইদলের নাম হইল বুর্জ্জোয়া বা বুর্জ্জোয়াজে (Bourgeoisia)

এবং প্রোলেটারিয়েট (Proletariat)। আন্দোলনকারীরা প্রাচীন রোমক শব্দে এই শেষ দলের যে আখ্যা দিয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে ইহাদের শ্রম করিবার মত হস্তাদি অঙ্গমাত্র আছে, কিন্তু কোনরূপ সঞ্চিত মূলধন নাই। ফরাসী বিপ্লবের প্রথমভাগেই এই বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। সাম্যবাদীদের যখন ষড়যন্ত্র ঘটে, তখন ফরাসীর শাসনসঙ্ঘ মূলধনের উপর আক্রমণ ভাবিয়া উহা দমন করেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে এরূপ আক্রমণে ফরাসী প্রজাতন্ত্র ও তাহার শ্রমশিল্পের উন্নতি বিধায়ক সম্পত্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে শাসকসঙ্ঘ বিজয়ী হইলেন বটে, কিন্তু মূলধন ও শ্রমের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহা আর অন্তর্হিত হইল না এবং এখনও এই বিরোধের মধ্যে কোন মিলনের পন্থা লক্ষিত হইতেছে না। যেখানেই শ্রমশিল্পের বিকাশ দেখা যাইতেছে, সেখানেই বিরোধ অর্থাৎ শ্রমিকদের স্বার্থ যে মূলধনীদের স্বার্থ হইতে একান্ত পৃথক এইভাব ফুটিয়া উঠিতেছে এবং এই সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। ইহার ফলে কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিক মতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার জনপ্রিয় নেতৃবর্গ শ্রমিকদিগকে বেশী সঙ্ঘবদ্ধ করিতেও সক্ষম হইতেছেন। ইহাতে বহুতর দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত হইয়া উঠিয়াছে। শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা অজ্ঞাত ছিল, সেই সব ভাবে রাজনীতি প্রভাবিত হইতেছে। বিশেষ দক্ষ রাজনীতিজ্ঞেরাও এক্ষেত্রে কোন কুল কিনারা পাইতেছেন না।

এই বিরোধের ফলে এই বিভিন্ন শ্রেণীদ্বয় ও তাহাদের পক্ষাবলম্বিরা পরস্পর কিরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন, তাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়। কমিউনিজম্ বা সঙ্ঘতন্ত্রবাদী লেখকগণ আধুনিক সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে যে পার্থক্যের রেখা টানিয়া দিয়াছেন,

প্রকৃত পক্ষে ওরূপ বিশিষ্ট বিভাগ রেখা সমাজে কিছুই নাই। কয়েক বিঘা জমির মালিক, ক্ষুদ্র দোকানদার এবং অন্যান্য অনেক সামান্য রকমের শ্রমশিল্পীদের মধ্যে মূলধনী ও শ্রমিক উভয়েরই সাদৃশ্য মিলিতে পারে। সমাজের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনে ইহাদের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা বড় নাই, কিম্বা উহাতে কোন উন্নততর সমাজিক অবস্থাতেও তাহারা উপনীত হইতে পারে না। সুতরাং এই সব শ্রেণীর মধ্যে কোন সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্য যে নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। যদি দেশের সমস্ত সম্পত্তি সমপরিমাণে সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে তাহাতে এই শ্রেণীস্থ লোকের অংশের বড় কিছু বৃদ্ধি ঘটিবে না। অপর পক্ষে এই সময়ে য়ুরোপ ও আমেরিকার সকল দেশেই সাধারণ ও কার্য্যকরী শিক্ষা সমাজের সমস্ত স্তরেই বিস্তৃত হইতেছে। উহাদের নি‍েদের অপেক্ষা উহাদের সন্তানসন্ততির জীবন যে ঐ শিক্ষারগুণে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এমনও উহারা আশা করে। ধরিতে গেলে সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সমাজে ঐ শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং বেশীর ভাগ স্থানেই, যাহারা নিজের অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট, তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। যাহারা বড় কল-কারখানায় কর্ম্ম করে, প্রধানতঃ তাহারাই এইরূপ ধরণের লোক। ইহারাই সোসিয়ালিষ্ট বক্তাদের প্ররোচনায় সহজে উৎত্তেজিত হয় এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ ও সুবিধাও ইহাদের বেশী। ইহাদের সহিতই মুলধনী বা মালিকদের একটা ধারাবাহিক সংগ্রাম চলিতেছে। ঐ সংগ্রাম কখন কখন কিছু কমিলেও কোন প্রকার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছেনা। যাহাই হৌক, বিরোধের পরিণাম বড় মঙ্গলপ্রদ নয়, কারণ ধর্ম্মঘটের দ্বারা মালিক

মজুরদের মধ্যে একটা স্থায়ী সুস্থ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মালিকদের তিরোধান ঘটিলেই যে এই সামাজিক অশুভ অবস্থার বিশেষ প্রতীকার হইবে, এইরূপ আশাও কম। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উভয় পক্ষের মধ্যে সামান্য অস্থায়ী ধরণের মধ্যস্থতা করা ছাড়া প্রকৃত শান্তির সংস্থাপনা করিতে অসমর্থ। এজন্য শ্রমিকেরা এ সমস্যার সমাধানের ভার নিজেরাই নিজের হাতে লইয়াছে এবং এতদর্থে নিয়তই সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে।

আধুনিক কমিউনিষ্টিক বা সঙ্ঘতান্ত্রিক, অথবা সোসিয়ালিষ্টিক বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির বিশেষত্ব এই যে বর্ত্তমান আন্দোলনকারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংহত ভাবে দলবদ্ধ হইতেছে, এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপরেই বেশী জোর দিতেছে। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে সোসিয়ালিজম ক্রমশঃ য়ুরোপের সমস্ত ভূভাগে এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

সভা সমিতির দ্বারা কিরূপে সোসিয়ালিজমের মত এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস নির্ণয় করা বড় কঠিন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যদি না এই নির্ণয়ের কাজ করা হয়, তবে তাহা বড় জ্ঞানপ্রদ হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় সেরূপ ঐতিহাসিক নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া লেখকের উদ্দেশ্যে নয়, তাহার প্রয়োজনও এ ক্ষেত্রে নাই। বর্ত্তমানে মানুষের সমস্ত কাজে আন্তর্জ্জাতিকতার ভাব খুবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্লবযুগের প্রারম্ভ হইতে নানা প্রকারের সভাসমিতি বহুল পরিমাণে সর্ব্বত্র সংগঠিত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রমিকেরা এখন জ্ঞানবিদ্যায় অধিকতর সমুন্নত হইয়াছে। ডাক ঘরের সুব্যবস্থায় নানা বিষয়ক তত্ত্ব ও জ্ঞান চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িতেছে। সুতরাং এক দেশের মতামত যে অপর দেশে সংক্রামিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? সমস্ত দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮৪৮ অব্দে ফরাসী রাজ লুই ফিলিপ যখন সিংহাসনচ্যুত হইলেন, তখন প্যারিসবাসী কমিউনিষ্টরা বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নূতন সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য প্রবল রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কারণ এরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলে সমাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। ফ্রান্সে ইহার পর যে বিপ্লব পরম্পরা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে ঐ আশঙ্কা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল। সোসিয়ালিষ্টরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রূপে গঠিত হইতে লাগিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পরে হইতে বিখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট কার্ল মার্ক্স ফ্রান্স ও জার্ম্মানী উভয় দেশেই কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বেলজিয়ামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার বেলজিয়াম হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলোন নগরে তিনি একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু শীঘ্র তাহা সরকারের আদেশে বন্ধ হয়। কলোন হইতে তিনি প্যারিস নগরে পলায়ন করেন এবং কিছু পরেই সেইখান হইতে লণ্ডনে গিয়া বাস করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে যে প্রচলিত সমাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপ্লবকারী বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাহা যে কতক পরিমাণে কমিউনিষ্টদের সঙ্ঘতান্ত্রিক মত প্রচারেরই ফল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সেই জন্য এই সব সমাজবিপ্লবকারীদের কার্য্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি রাখিবার অভিপ্রায়ে য়ুরোপীয় মহাদেশের সমস্ত রাষ্ট্রেই পুলিশের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সোসিয়ালিজম-মতবাদী বহু সংখ্যক ব্যক্তি ইংলণ্ডকে নিরাপদস্থান ভাবিয়া সেইখানে বাস করিতে থাকিলেন। এখানে নবতর সমাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সূচক মতামতের প্রচারে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল।

সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ের মঙ্গলপ্রদ এমন কতকগুলি আইনের সংস্কার ও প্রবর্ত্তনায় সমস্ত জাতি এখানে অনেকটা শান্তভাবে একতা-বদ্ধ ছিল। সেইজন্য এখানে সকলকেই মতামত প্রচারের অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। নূতন মতবাদীদের মধ্যে ইংরেজ খুবই কমই ছিল। কিন্তু উহাদের মত দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইলেও ততটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনা হয় নাই।

লণ্ডন নগরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘ সংগঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ঐরূপ ধরণের সঙ্ঘগঠনের চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা নহে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ঐ লণ্ডনেই জার্ম্মাণ শ্রমিকদের সুবিধা-কল্পে এমন একটি সমিতি স্থাপিত হয় যাহার মধ্যে য়ুরোপের সকল দেশের প্রবাসীরাই সভ্যরূপে স্থান পাইয়াছিল, এবং ইংলণ্ডের বাহিরে য়ুরোপ খণ্ডের অনেক ঐ প্রকার সমিতির সহিত লণ্ডনের এই সমিতির সংযোগও সাধিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বেও মার্ক্‌স্ প্রমুখ সোসিয়ালিষ্টরা যে ইস্তাহার প্রচার করেন, তাহাতেও ঐরূপ সঙ্ঘগঠনার্থ আহ্বানের ভাব ছিল।

ঐ ইস্তাহারের বিষয় ছিল এইরূপ; ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ, রাষ্ট্রচালিত ব্যাঙ্কে শ্রমকারীদের প্রাপ্যাদি কেন্দ্রীভূত করা, রাষ্ট্রের দ্বারা বিভিন্ন শ্রম-বিভাগের সংযোগ সাধন, জাতীয় কর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিগত ভাবে কৃষিকার্য্যের পরিচালনা,

অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন। ইহার পর বেলজিয়ামের ব্রুসেল নগরে সকল দেশের কমিউনিষ্ট বা সঙ্ঘতান্ত্রিকদিগকে একত্র হইবার জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পর এই সব আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং ঐরূপ আন্দোলন কতকটা নরম হইয়া যায়। মার্ক্স, ইঞ্জেল্স, লিভনেক্ট্ (Marx, Engels, Lievnecht) প্রভৃতি জার্ম্মাণ সোসিয়ালিষ্ট যাঁহারা এইসব অন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাই পরে আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘের সংগঠন কালে আসিয়া দেখা দিলেন। লণ্ডনই এই সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

কোন্ কারণে যে এইরূপ সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে কিছু এখনও বলা হয় নাই। যদি ইয়োরোপে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ সংগঠিত না হয় এবং সর্ব্বদেশের শ্রমিকগণ একযোগে একসঙ্গে একই কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত না থাকে, তবে যখন শ্রমিকদের মুক্তিকাল উপস্থিত হইবে, তখন কোন একটা বিশেষ জাতি ঐ বিপ্লবে বিপন্ন হইলে তাহাকে সাহায্য প্রদানে অপর জাতিরও কোন সুবিধা ঘটিবে না। সকলে সর্ব্বত্র একযোগে কাজ না করিলে কোন একটা বিশেষ দেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইবে মাত্র, এবং তাহাতে অপরাপর দেশকে সতর্কতা অবলম্বনেরও অবসর দেওয়া হইবে।

ফরাসী সরকার ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শিল্পোন্নতির সংবাদ সংগ্রহার্থ যখন একদল দক্ষ শিল্পকারকে লণ্ডনে প্রেরণ করেন, তখনই ঐ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘগঠনের যেন একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। ইহার পর বৎসরে বিখ্যাত ইংরেজ সোসিয়ালিষ্ট ওডগার (Odger)

বিদেশ হইতে শ্রমিকদের আমদানিতে কোন দেশের বেতনের হার যেন না কমিয়া যায়, এই বিষয় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘগঠনের কথা উত্থাপন করেন। ঐ সব ফরাসী শ্রমিকেরা লণ্ডন হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্ঘগঠন সম্বন্ধে তাহাদের সহকর্ম্মীদের অনুমতি লাভ করে এবং পর বৎসরে লণ্ডনে যে ঐরূপ আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন হইবে, এরূপ নির্দ্ধারিত হয়। ঐ প্রস্তাব অনুসারে পর বৎসরে সেপ্টেম্বর মাসের আটাশ তারিখে ঐরূপ সভার অধিবেশন ঘটে। স্বনামধন্য ম্যাট্সিনি সেই সভায় বক্তৃতা করেন। তবে তাঁহার বক্তৃতার সহিত সভার উদ্দেশ্যের বড় কিছু যোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল রাজনীতির দিকে। তিনি একটা কেন্দ্রীভূত প্রবল শক্তির সংস্থাপনার প্রয়াসী, এই কেন্দ্রীভূত শক্তি সমস্ত আন্দোলনের মূলে থাকা চাই।

কিন্তু আন্তর্জাতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল বহুতর মিত্রশক্তির একত্র সমবায় ও বহুতর আন্দোলনের একত্রীকরণ। এই সব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়, পরন্তু সামাজিক। ইহারা মূলধনী মালিকদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া সমাজে শ্রমিকদিগকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিতে চায়। রাজনৈতিক শক্তি লাভ ইহাদের উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। কিন্তু ম্যাট্সিনির ছিল রাজনৈতিক শক্তি লাভই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মত সমাজবিপ্লব ঘটনার ভাব তাঁহার মনে বড় ছিল না। মার্ক্স ও এই সভায় বক্তৃতা করেন ;তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার বক্তৃতায় এই আন্দোলনের আবেগের ভাব বড় ছিল না। সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধেও তিনি বেশী কিছু বলেন নাই।

তিনি এমন একটা পদ্ধতির কথা তুলেন, যাহার অনুসরণে ভবিষ্যতে বেতন (Wages) কথাটা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। শ্রমিকেরা কাহারও বেতনভূক্ না হইয়া উৎপাদন ক্রিয়ার প্রাকৃতিক উপায়গুলি নিজেরাই পরিচালনা করিবে। এই উপায় বা সাধনগুলির একমাত্র মালিক হইবে রাষ্ট্র, এবং সোসিয়ালিষ্টদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি না আসিলে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ব্যাপার সংঘটিত হইবার নয়।

এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের উৎপত্তি ও কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। ঐ সঙ্ঘের সাধারণ নিয়মাবলী দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে, সর্ব্বদেশের শ্রমিক সমিতির মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য স্থাপনই এই সংঙ্ঘের উদ্দেশ্য। শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষণ, উন্নতিসাধন ও মুক্তিবিধানই এই সঙ্ঘের লক্ষণ। প্রতি বৎসরে ঐ সঙ্ঘের একটি অধিবেশন হইয়া থাকে। বহু শাখা সঙ্ঘ হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া ঐ অধিবেশনে সমবেত হন এবং উহারাই পর বৎসরের অধিবেশনের স্থান ও কাল নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপ নির্দ্ধারণের পর আর কোন বিশেষ আমন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। প্রতি বৎসর ঐ সঙ্ঘের পরিচালনার্থ সাধারণ কার্য্য পরিষদের স্থানও ঐ অধিবেশন ক্ষেত্রে নির্ণীত ও উহার সভ্যগণের তালিকা প্রস্তুত হয়।

পরিষৎ ইচ্ছা করিলে উহার সভ্যসংখ্যা বাড়াইতে পারে। প্রতিবৎসর পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয়। পরিষৎ প্রয়োজন বুঝিলে সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনেরও ব্যবস্থা করিতে পারেন। সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত দেশসমূহের শ্রমিকেরাই ঐ পরিষদের সভ্য। এই সভ্যদের মধ্য হইতেই এই পরিষদের কর্ম্মচারীগণ নির্ব্বাচিত হন।

বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সভাসমিতির মধ্যে সর্ব্ব প্রকার আদান প্রদান রক্ষা করাই এই পরিষদের কাজ। ইহাতে এক দেশের শ্রমিকেরা অপর দেশের শ্রমিকেদের কার্য্য কলাপের বিষয় সর্ব্বদাই অবগত থাকে। পরস্পরের সহযোগিতায় একই সময়ে য়ুরোপীয় বিভিন্ন দেশ সমূহের সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধানও চলিতে পারে। সাধারণ স্বার্থ বিষয়ক কোন সমস্যা কোন একটি বিশেষ সমাজের দ্বারা উত্থাপিত হইলেও, অপর সকল সমাজই উহার সমাধানে যোগ দিতে সক্ষম হয় এবং যখন সহসা কোন কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়—যেমন, আন্তর্জাতিক কোন বিরোধের নিষ্পত্তি—তখন একতাবদ্ধ বহু সভাসমিতি ঐ পদ্ধতি অবলম্বনের কাজ একই সময়ে একই ভাবে করিতে পারে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ঐ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ পরিচালনার নিমিত্ত সময়ে সময়ে যে সব নিয়মাদির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিষয়ে কিছু বলা হইতেছে। প্রত্যেক শাখ সমিতি বিভাগ বা দল এক একজন করিয়া সভ্য সঙ্ঘের অধিবেশনে প্রেরণ করে এবং প্রত্যেক সমিতিকেই তাহার প্রেরিত সভ্যের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ঐ সব সমিতির মধ্যে যাহার সভ্য সংখ্যা পাঁচশতেরও অধিক, সে স্থলে প্রত্যেক অতিরিক্ত পাঁচ শত সভ্যের জন্য একটি করিয়া বেশী প্রতিনিধি ঐ সমিতি পাঠাইতে পারে। যে সব দেশে আন্তর্জাতিক শাখা সঙ্ঘের অবস্থান আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, সে সব স্থান হইতেও প্রতিনিধিবর্গ আসিয়া সাধারণ সঙ্ঘের অধিবেশনের আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত শাখা সমিতিকে এক পেনি আন্দাজ সামান্য কিছু চাঁদা দিতে হয়। যে নগরে বা স্থানে

সংগঠনের ব্যবস্থা পূর্ণভাবে পালিত হইবার সুযোগ পায়, সেখানকার সভাসমিতি গুলি ছোট বড় রকমে অর্থাৎ বড়র অন্তর্গত তদপেক্ষা ছোটটি এইরূপ ভাবে, যেন ধাপে ধাপে সাজানর মত গঠিত হয়। সাধারণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘই অবশ্য এই সোপানের সর্বোচ্চ ধাপ বলিয়া গণ্য। লণ্ডন নগরে যেমন পঞ্চাশজন সভ্য লইয়া ঐ সাধারণ সঙ্ঘের একটি কার্য্যপরিচালক পরিষৎ আছে, তেমনই প্রত্যেক শাখা সমিতিরও এক একটি কার্য্যপরিচালক পরিষৎ থাকিবার কথা এবং প্রত্যেক বিশিষ্ট শাখার পরিচালনার নিমিত্ত বিশিষ্ট নিয়মাবলীও থাকিতে পারে। প্রত্যেক শাখাসঙ্ঘ স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা সমিতিগুলিকে নিজের অন্তর্ভুক্ত বা বহিভূর্ত করিতে সমর্থ, এবং প্রত্যেক শাখাকে তিন মাস অন্তর নিজ নিজ কার্য্যের বিবরণ প্রকাশ করিতে হয়। কি শাখাসঙ্ঘ কি তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ সভার অধিবেশন করিতে পারে।

এইবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা যাইতে পারে। তৎপরে উহার সাধারণ অধিবেশনে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া উহার কার্য্যাবলী ও ইতিহাসের বিষয় কিছু বিবৃত করা যাইবে।

(খ)

এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের শাখাসমূহের সভ্যের সংখ্যার বিস্তৃত বিবরণে প্রবৃত্ত হইবার এ ক্ষেত্রে তেমন কোনও প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু এই সব বিবরণে যাহা পাওয়া যায়, তাহার উপরে

নির্ভর করাও যায় না। বিভিন্ন লেখকেরা উহার সভ্যসংখ্যার যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল যে একটু আধটু গরমিল ঘটিয়াছে, তাহা নহে,—পরন্তু একের তালিকার সহিত অপরের একেবারে যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ। অনেক দেশে আবার সরকারী ইস্তাহারের নিষেধক্রমে সেখানকার অনেক শ্রমিকই ঐ সঙ্ঘে যোগ দিতে পারে নাই। জার্ম্মাণীতে এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া সেখানে ইহার প্রসার সেরূপ ঘটে নাই। কারণ পূর্ব্ব হইতেই লাসেলের (Lassalle) প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সমবায় এখানে বিদ্যমান ছিল এবং এই প্রাচীন সঙ্ঘ এই নবীন সঙ্ঘের বিস্তার পথে প্রথমে একটু অন্তরায়ের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রুসিয়ায় বিদেশীদের দ্বারা এরূপ কোন সংঘগঠন আইন মতে নিষিদ্ধ ছিল। ফ্রান্সে অবশ্য ইহা খুবই প্রবল হইয়াছিল এবং এখানে উহার রূপ ছিল বড় বেশী বিপ্লবাত্মক। সুইইজারল্যাণ্ডেও ইহার বিশেষ বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছিল। ধরিতে গেলে, এখানকার প্রায় সমস্ত শ্রমিকেরাই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। বেলজিয়ামেও ইহার সভ্য বড় কম ছিল না। কিন্তু হলাণ্ডে উহার খবরই বড় কেহ রাখে নাই। অষ্ট্রিয়ায় এরূপ সংগঠন করিবার মত শক্তিশালী নেতাই কেহ যেন ছিলেননা। তাহা ছাড়া, এখানে পূর্ব্ব হইতে জার্ম্মাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গণতান্ত্রিক শ্রমিক সম্প্রদায় ইসিনাকে (Eisinach) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রায় একলক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এখানে সমবেত হন। ফ্রান্সে ইহার অনেক সভ্য ছিল, কাহারও মতে একলক্ষ, কাহারও মতে তাহার চতুর্গুণ। ইহা আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বতন সভাসমিতির পাশে গিয়াও

আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই পূর্ব্বতন সমিতিগুলির অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল মূলধনীদের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন, এই নবীনসঙ্ঘের ন্যায় সমাজ বিপ্লব নয়। এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ও উহার শাখা সমিতিগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য ও মত যেভাবে প্রচার করিয়াছে, তাহাতে উহাদের দক্ষতা ও সতর্কতা যে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে, উহাদের অধিবেশনাদির বিবরণ পাঠে তাহা বুঝা যায়। এই সব সঙ্ঘের অধিবেশনের মূলে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য অবজ্ঞেয় নয়। শ্রমিক-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের মধ্যে বহু পরিমাণেই এই বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি সভার অধিবেশনে এইরূপ প্রশ্নও উঠে যে, ঠিক দৈহিক শ্রমজীবী ব্যতীত মানসিক শ্রমজীবীদেরও ঐ সঙ্ঘের সভ্য করা যাইবে কিনা। কিন্তু কলম পেশা ও গলাবাজি করা যাহাদের বৃত্তি, তাঁহাদের এই সঙ্ঘ মধ্যে আনিতে ফরাসীসভ্যদের বড় আপত্তি হইল। শ্রমিকদের সভার উপরে ইহাদের প্রভাব যে মঙ্গলজনক নয়, একথা তঁহারা খুব জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ ও জার্ম্মাণ সদস্যেরা ইহার সমর্থন করেন, এবং তাঁহাদের মতের জোরে এইরূপ প্রস্তাবই শেষে গৃহীত হয়।

খৃষ্টীয় ১৮৬৬ অব্দে জেনেভা নগরে এই শ্রমিক মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ব্রুসেলে এই অধিবেশন হইবার কথা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী সোসিয়ালিষ্টদের পক্ষে ইহাতে যোগ দেওয়ার অন্তরায় ঘটায় এবং নিজের সীমানার মধ্যে এরূপ সভার অধিবেশন সম্বন্ধে বেলজিয়াম সরকারের প্রতিকূল মত থাকায়, এই অধিবেশন পরবৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই অধিবেশনে সমিতির উদ্দেশ্য তেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই। এই সভায় শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রদত্ত

হয়। কলকারখানায় স্ত্রীলোকদিগের নিয়োগ অনুমোদিত হয় নাই, কারণ উহাতে দুর্নীতির পোষকতা করা হয়। ব্যবসায়-সমবায়গুলির কার্য্য এখানে নিন্দিত হইয়াছিল। কারণ উহারা মূলধন পদ্ধতির বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া কেবল উপস্থিত মত খুটিনাটি ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। এই সভা যৌথ কর্ম্মপদ্ধতির (Co operative Labour) অনুকূল ছিল বটে, কিন্তু কোন বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ইহাকে যথাসম্ভব সর্ব্বগত করা বিধেয়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিল। শ্রমিকদের সমস্ত ব্যাঙ্কের সমবায় ঘটাইবার জন্য এখানে প্রস্তাব করা হয়, উদ্দেশ্য এই সমিতির অধীনতায় ঐরূপ সকল ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা। স্থায়ীভাবে সৈন্য রাখার বিরুদ্ধে এখানে সর্ব্ববাদিসম্মত মত প্রদত্ত হয় এবং উহার পরিবর্ত্তে দেশবাসী জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষাদিবার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লসেন্ (Lausanne) নগরে হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য-নির্ব্বাহ পরিষদের সম্পাদক ইউজেন ডুপোঁ (Eugene Dupont) উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এখানে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রশ্ন দাড়াইয়াছিল এই—যে, সমাজের চতুর্থ অর্থাৎ শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল-স্বরূপ একটা পঞ্চম শ্রেণীর উৎপত্তির আশঙ্কা আছে কিনা? তাহা যদি হয়, সামাজিক অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মতই প্রবল হয় যে, যদি শ্রমিকদের সভাসমিতি বর্ত্তমান আকারে থাকিয়া যায়, তবে উহাদেম উদ্যমের ফলে ঐরূপ ঘটিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান বিপুলায়তন শ্রমশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় যেমন লোপ পাইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণও তার সঙ্গে দূর হইবে। বর্ত্তমান উৎপাদনক্রিয়ার বিপুলতার মধ্যে সমস্ত বিভক্ত

ব্যক্তিগত কর্ম্ম একত্র মিলিয়া যাইবে। সর্ব্বগত যৌথশ্রমপদ্ধতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। এইরূপ সর্ব্বগত ভাবে কার্য্য না করিলে সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটান যে অসম্ভব, এবিষয়টা সকল শ্রমিককেই বেশ বুঝিয়া নিতে হইবে।

এই অধিবেশনের অপর একটি অলোচ্য প্রশ্নে জনসাধরণের শিক্ষা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয়। তাহাতে ইহাই নির্দ্ধারিত হয়, যে বালকদিগের শিক্ষার কাজ রাষ্ট্রের উপর অর্পিত থাকিবে বটে, কিন্তু তাহার পরিচালনা রাষ্ট্রের একটা বিশেষ অধিকাররূপে গণ্য হওয়া উচিত নয়। কোন পরিবারের অভিভাবক নিজ সন্তানসন্ততির শিক্ষার ভার লইতে অসমর্থ হইলেই রাষ্ট্র অভিভাবক স্থানীয় হইয়া তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবে মাত্র। কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মশিক্ষাকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত করা ঠিক নয়। ঐ অধিবেশনের বিবরণীতে রাষ্ট্রের কার্য্য সম্বন্ধে নিম্ন মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। রাষ্ট্রশক্তির হস্তেই সমস্ত যানপত্রের রক্ষণ ও চালনের ভার অর্পণার্থে সকল জাতিরই চেষ্টা করা উচিত, রাষ্ট্রের উপর এই ভার অর্পিত হইলে, এ সম্বন্ধে বড় বড় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার দূরীভূত হইবে। এই এক চেটিয়া অধিকারের বলে এই সব কোম্পানী শ্রমিকদিগকে এমন সব খামখেয়ালী নিয়মাদির অধীন করিয়া রাখে, যাহাতে মানুষের আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা একেবারে বিনষ্ট হয়।

এই সভায় আর একটি বিবরণ পঠিত হইয়াছিল, সেটি পূর্ব্ব-গুলি অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নহে। কারণ উহাতে মুলধনী ও এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মধ্যে কিরূপ সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। লণ্ডনের ঝুড়ি ব্যবসায়ীরা তাহাদের অধীন শ্রমিকদিগকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেয় যে তাহারা যেন তিনদিনের মধ্যেই

তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সমিতি উঠাইয়া দেয় এবং নিম্নতর বেতনে কাজ করিতে সম্মত হয়, নতুবা তাঁহাদের সম্বন্ধে কারখানার দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। শ্রমিকরা এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করে নাই। এই প্রস্তাব যে গ্রাহ্য হইবে না, ইহা বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঐ শ্রমিকদের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য বেলজিয়াম হইতে লোক আনিবার বন্দোবস্ত করা হয়। উহারা যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেই উহাদিগকে এখানকার শ্রমিক-দিগের সংসর্গ হইতে যতদূর সম্ভব স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সঙ্ঘের কার্য্যপরিচালক পরিষৎ কোনরূপে এ ব্যবধান ভাঙ্গিয়া বেলজিয়াম শ্রমিকদিগের নিকট নিজেদের অবস্থা জানায়। পরদিনই এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের কি করা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া উহারা নিজেদের দেশাভিমুখে প্রতিগমন করে। তাহাদের এই আসা যাওয়ার যে বৃথা সময় নষ্ট হইয়াছিল, লণ্ডনের ঝুড়ীব্যবসায়ীরা সেই তাহার ক্ষতি পূরণ করে।

আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের নেতারা ধর্ম্মঘটকে কেহই একটা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন নাই, কিন্তু উহাকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের একটা বিশেষ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা এই ছিল যে উহা ব্যক্তিগত মূলধনের বিলোপ সাধনের বিশেষ সহায়তা করিবে। অত্যাচারী মালিকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ইহা একটা বিশেষ যন্ত্রস্বরূপ। ইহাতে শ্রমিকদিগের দৃষ্টি আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের দিকে আরও দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিবে এবং তাহাতে অবশ্যই ইহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে শ্রমিকদের চক্ষে মূলধন আরও ঘৃণার্হ হইয়া উঠিবে এবং ঐক্যবন্ধনের সুবিধার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আরও ফুটাইয়া তুলিবে। যখন উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে এবং রাষ্ট্রই একমাত্র মূলধনী হইয়া দাঁড়াইবে, তখন আর ধর্ম্মঘটের কোনই সম্ভাবনা থাকিবেন। এই

অধিবেশনের পরবর্ত্তী দুই বৎসর ব্রুসেলস ও বেলমগরে যে দুইটি সভা আহূত হয়, তাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল এবং উহাতে মতদ্বৈধও ঘটিয়াছিল। ব্রুসেলস একজন নাগরিকের বিবরণীতে প্রকাশ যে বহু সোসিয়ালিষ্ট এই সম্পত্তি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারাত্মক কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি এরূপভাবে ব্যবস্থিত হওয়া বিধেয় যাহাতে শ্রমিকেরা টাকা জমা না রাখিলেও টাকা ধার পাইতে পারে। সমস্ত জমিজমা ব্যক্তিগত না হইয়া সমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। দূর আত্মীয় সম্পর্কে উত্তরাধিকারের নিয়ম বিলোপ করা দরকার এবং যে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের নিয়ম থাকিবে সে স্থলেও উহার উপর বড় একটা কর স্থাপন করা চাই। এই বিষয়ের আলোচনা কালে টোলেন নামক অপর একজন নাগরিক বলেন, কতক প্রকার সম্পত্তি সাধারণ হওয়া বিধেয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও এমন কতকগুলি সম্পত্তি আছে, যাহা স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত থাকিবে। ইহার উত্তরে আর একজন বলেন, যে টোলেন দেশের খাল রাস্তা ও খনিকেই মাত্র সাধারনের সম্পত্তি করিতে চান; কিন্তু তিনি নিজে ভূসম্পত্তিকেও উহাদের অন্তর্গত করিবার পক্ষপাতী। ধরিতে গেলে জমিও শ্রমের একটা যন্ত্রস্বরূপ। অন্যান্য যন্ত্রের মত ইহাও শ্রমিকেরই অধিকারে থাকা উচিত। যদি জমিকে সাধারণ সম্পত্তি করা হয়, তবে অন্যান্য যন্ত্রকেও সেরূপ করা হইবে না কেন? ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা বটে; কিন্তু এরূপ করা অসম্ভব।

এই সব মতভেদ দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে চরমপন্থীরা তখনও সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাহইলেও, সেসিয়ালিজম মতের পরিণতি যে কি ইহাঁরাই ঠিক বুঝিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রুসেলের অধিবেশন

হয়। ইহাতে অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে নূতন কোন বিষয়ের কোন অবতারণা করা হয় নাই। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অধিবেশনের মতামতগুলির আবৃত্তি মাত্রই করা হইয়াছিল। ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে এই অধিবেশনের নির্দ্ধারণ এই দাঁড়ায় যে মূলধনী ও শ্রমিকদিগের কর্ম্মগত বিরোধ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজনীয় ও নিয়মানুমত। প্রত্যেক শাখা সমিতিতে মধ্যস্থের কার্য্য পরিচালনার্থ একটা পরিষৎ থাকা উচিত। এই পরিষদই ভবিষ্যতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মঘটের ঔচিত্য ও উপযোগিতা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে।

যন্ত্র ও কলের সম্বন্ধে নানা কথার সঙ্গে এই সভা এই মতই প্রচার করে যে কল কব্জা অপরাপর ছোটখাট যন্ত্রাদির মত শ্রমিকদিগের অধিকারে থাকা উচিত। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ সহযোগিতা ও পরস্পরের মধ্যে যৌথ অর্থ বিনিময় না ঘটিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমানে কারখানায় কলের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে এইটুকু ব্যবস্থাকরা যাইতে পারে যে শ্রমিকদিগকে তাহাদের কাজের গ্যারান্টি ও ক্ষতিপূরণ না দিলে তাহারা ঐরূপ কলের প্রবর্ত্তনে বাধা জন্মাইবে। সম্পত্তি সম্বন্ধে এই সভায় ইহাই মীমাংসিত হয় যে, কেবল দেশের আরণ্য সম্পদ, রেল পথ প্রভৃতি যাতায়াতের উপায়গুলি, জমিজমা, খনি প্রভৃতি সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক এবং এই অধিবেশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডুপোঁ শেষে একটি বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহারা কেবল অত্যাচারীকে নয়, অত্যাচারের মূলকেই উৎপাটিত করিতে চান। তাই কোনও গবর্মেণ্টই চাহেন না। কেন না গবর্মেণ্ট বড় বড় বরে সদাই তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করেন। তাঁহারা

সৈন্য চাহেন না। কেন না, সৈন্য তাঁহাদের প্রাণান্ত ঘটায়। তাঁহারা ধর্ম্ম চাহেন না। কেন না, ধর্ম্ম তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখে।

খৃষ্টীয় ১৮৬৯ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বেসেল (Basel) নগরে আবার একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে আশী জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সম্পত্তি সম্বন্ধে মত নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটী ঐ বিষয়টিকে দুইভাগে সাধারণ সভায় উপস্থিত করেন। প্রথম প্রস্তাব হয় এই যে জমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করিয়া উহা সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই স্থির হয় যে ইহা সকলের সমবেত অধিকারে থাকিবে। এই আলোচনা কালে কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও দুঃখকষ্টের মূল। ইহা মূলে অত্যাচার ও উপদ্রবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার তিরোধান ঘটাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। উহার পরিবর্ত্তে সাধারণ সমবায় পরিচালিত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা উচিত। এই প্রস্তাব প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত রূপেই গৃহীত হয়।

পূর্ব্বের কোন অধিবেশনেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। বেসেলেই এই বিষয়টি প্রথম উত্থাপিত হয় এবং ঐ সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি মন্তব্য পরিগৃহীত হয় যথা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহিত উত্তরাধিকারের নীতি অবশ্যই অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। সুতরাং ইহা সমবেত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। ইহাতে সমাজের কয়েকজন মাত্র লাভবান্ হয়, অধিকসংখ্যক লোক বঞ্চিত হইয়াই থাকে। যদি এই উত্তরাধিকারের ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও ইহার বৈষম্যঘটানর শক্তি একেবারে নিরাকৃত হয় না। ইহা যে সামাজিক বৈষম্যের বড় একটা

মূলকারণ এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যেহেতু ইহাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। এই সঙ্ঘ যখন সামাজিক সাধারণ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তখন সেই সঙ্গে উহাকে উত্তরাধিকার বিলোপের জন্যও বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে। শ্রমিকদের মুক্তি সাধনার্থ ঐ উভয়বিধি কার্য্যই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঐ মন্তব্যগুলি গৃহীত হইলেও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ৫কজন সভ্য একটা মাঝামাঝি রকমের পথ অবলম্বন করিবার কথা তোলেন। অপর একজন সভ্য তাঁহার সম্প্রদায়ের নামে প্রস্তাব করেন যে, উত্তরাধিকারের বিলোপ না ঘটাইয়া উহার যথাযথ সঙ্কোচ সাধন সঙ্গত। সঙ্কোচিত আকারে প্রবর্ত্তিত থাকিলে উহা সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহায়তা করিবে। যখন এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লওয়া হয়, তখন ৩২ জন ইহার পক্ষে ৩০ জন ইহার বিপক্ষে দাঁড়ায়। বাকী সকলে ভোট দিতে বিরত থাকে।

(গ)

বেসেলের সভায় নির্দ্ধারিত হয় যে পরবর্ত্তী বৎসরে পেরিস নগরে ঐ সঙ্ঘের অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাসেই হইবে। কিন্তু ঐ বৎসরের ১৫ ই জুলাই ফ্রান্স প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহাতে কি পেরিস নগরে কি অন্যত্র কোথাও ঐ অধিবেশন ঘটে নাই। মেঞ্জ (Manz) নগরে সভা আহ্বানের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের এরূপ আবির্ভাব অনেকস্থলে আপত্তিকর হইয়া ওঠায়, পরবৎসরেও ঐ সভার অধিবেশনের

সুবিধা ঘটে নাই। লণ্ডনে একটা সামান্য রকম বৈঠক বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যাবলীতে তেমন কোন প্রয়োজনীয় কথা ছিল না। ১৮৭২ সালের সভা হল্যাণ্ডের হেগ নগরে (Hague) বসিবার কথা হয়।

এই বৎসরের ভিতরে মাইকেল বাকুনিন (Michael Bakunin) নামক রুষ নিহিলিষ্ট দলের বিখ্যাত এক ব্যক্তির দ্বারা এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের একটি নূতন বিভাগ গঠিত হয়। নিজের দেশ হইতে ইনি পলাইয়া আসেন। ধৃত হইয়া স্যাকসনী ও অষ্ট্রীয়ার আদালতে বধ দণ্ডাজ্ঞা পাইবার পর রুষিয়ার কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হন। সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হইলে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করেন এবং পুনরায় পশ্চিম য়ুরোপে আবির্ভূত হন। এখানে ইনি চরমপন্থীরূপে বিশিষ্ট হইয়া উঠেন। বার্ণনগরে (Berne) তৃতীয় অধিবেশনে তিনি একটি বক্তৃতায় বলেন, যে ধর্ম্ম মানবমস্তিষ্কের কেবল একটা বিকৃতি মাত্র নয়, পরন্তু ইহা মানবের সমগ্র প্রকৃতি ও তাহার হৃদয়ের অসীম উদার ভাব-সমূহের চিরন্তন প্রতিরোধস্বরূপ। অজ্ঞান ও অন্যায় পৃথিবীতে যতদিন রাজত্ব করিবে, ততদিন ধর্ম্ম সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিবে! যদি আমরা পৃথিবীকে তাহার যথাপ্রাপ্য প্রদান করি অর্থাৎ তাহাতে সুখ ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করি, তবে সেখানে ধর্ম্মের থাকা কি দরকার? বাকুনিন সোসিয়ালিজমের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ ইহা সমাজের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা রাষ্ট্রশক্তির হস্তে অর্পণ করিতে প্রয়াসী। ইহা দেশের সমস্ত সম্পত্তিও রাষ্ট্রগত করিতে চায়। তিনি সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রের বিলোপেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

এই নূতন গণতান্ত্রিক সোসিয়ালিষ্ট সমবায় গঠিত হইলে, বাকুনিন এবং তাহার বন্ধুবর্গ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি প্রচার করেন—এই সমবায়

নিজেকে নিরাশ্বরবাদী বলিয়া স্বীকার করিতেছে। উপাসনাদির বিলোপই ইহার বাঞ্ছনীয়। ইহা বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান এবং স্বর্গীয় ন্যায়ের স্থলে মানবীয় ন্যায়েরই প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। ধর্ম্ম রাজনীতি বিচারনীতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত যে বিবাহ অনুষ্ঠান বিজড়িত, তাহা উঠাইবারই ইহা পক্ষপাতী। এই সব সিদ্ধান্তের সহিত উত্তরাধিকারের বিলোপ, সাধারণ সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সোসিয়ালিজমের সাধারণ মতগুলিও এই সমবায় কর্ত্তৃক অবশ্য গৃহীত হয়। ইহাদের মতে এইরূপ স্বাধীন সমবায়গুলির ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে সমস্ত প্রচলিত প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র ও অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের তিরোভাব ঘটিবে। প্রত্যুতঃ সকল দেশের এইরূপ আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবের অতীত ঐক্যবন্ধন ব্যতীত সামাজিক কোন প্রশ্নেরই যথার্থ সমাধান হইতে পারে না। সেই জন্য জাতীয় প্রতিযোগিতা ও তথাকথিত জাতীয় দেশ ভক্তি উপর যে রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠিত, তাহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। এই নিরীশ্বর সম্প্রদায়—সম্ভবতঃ যাহা গুপ্ত সমিতির আকারে ছিল,—অল্পসংখ্যক ভোটের আধিক্যে ঐ সঙ্ঘে স্থান লাভ করে। ইহারা এইরূপে গৃহীত হইলে, আপত্তিকারীরা ঐ সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া যায় এবং এই বিভক্ত-ভাব বহুদিন স্থায়ী হয়। হেগ নগরের সাধারণ অধিবেশনে বাকুনিনের দলকে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মধ্যে লওয়া যাইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের সমাধানের ভার একটা বিশেষ কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়। এই কমিটী ঐ দলকে গুপ্ত সমিতি বলিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাকুনিন এবং অপর একজন সভ্যকে সাধারণ সঙ্ঘের মধ্যে গ্রহণ করিতে অমত প্রকাশ করে। কমিটীর এই মত সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। কিন্তু যাহাদের গ্রহণ-সম্বন্ধে এই অমত হয়, তাহারা ভোট অমান্য করিবার

ভাব প্রকাশ করে। সেই বৎসর বার্ণের সেণ্টইমায়ার নগরে সুইস সম্প্রদায়ের যে বৈঠক বসে, তাহাতেই এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, বাকুনিনের দল সম্বন্ধে হেগের মত ইহারা গ্রাহ্য করিতে অপ্রস্তুত। ইহার পর লণ্ডনের সাধারণ পরিষদের পক্ষে এই সব সুইস সম্প্রদায়কে অস্থায়ীভাবে বর্জ্জন করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। হেগের অধিবেশনের পর অন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা আরও কিছু কমিয়া যায়। কতকগুলি লোক নিজেদের ইচ্ছাক্রমে ইহার সংস্রব ত্যাগ করে। ইহারা পেরিসনগরস্থ একটি সমিতির সভ্য ও সকলেই চরণপন্থী। ইঁহাদের মধ্যে একজন সঙ্ঘের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই লণ্ডনস্থ কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভ্য ছিলেন। ইহাদের অভিযোগ এই যে, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ নিজের কাজ ঠিক মত করিতেছে না, জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্য্যোদ্যমকে কেমন জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা ইহার নাই। এই সঙ্ঘকে কেবল শ্রমগত যৌথ সমবায় অথবা কেবল ধর্ম্মঘট আন্দোলনের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হইলেই চলিবে না। ইহাকে বিপ্লবকারী জনসাধারণের আন্তর্জাতিক অগ্রদূত স্বরূপে দণ্ডায়মান হওয়া চাই। এই কারণে উঁহারা এই সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু তাহা হইলেও উঁহারা কর্ম্মবিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিবেন না। তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ত এক। ফ্রান্স ও অপরাপর দেশে শ্রমিক সম্প্রদায়কে সুগঠিত ও ব্যবস্থিত করিয়া কিরূপে বিপ্লবের নিশানতলে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান সমাজপদ্ধতির মূলে আঘাত করা যায়, ইহাই ত সকলেরই অভিপ্রায়। বর্ত্তমানে ফ্রান্সে সমাজবিপ্লববাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বিপ্লববাদের ভবিষ্যৎ সহরের শ্রমিকদের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে। কারণ, ধরিতে গেলে দেশের মধ্যে উহারাই

যথার্থ বিপ্লবের পক্ষপাতী। মূলধনীদের সমস্ত সংস্পর্শ পরিহার করাই ইহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোন রকমেই ঐ সব দলের সহিত শ্রমিকদের কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করা নিতান্ত অবিধেয়। এই সব কথা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই সময়ে এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি একটা বিশেষ সঙ্কটের অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। যেরূপ নিয়ম প্রণালীর উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে এইরূপ সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। একদিক দিয়া দেখিলে ইহার কার্য্যপদ্ধতি অবশ্য পরিবর্ত্তনশীলই মনে হইবে। কারণ ইহা নিত্যনবতর উপায়ে অর্থাৎ নব নব সমবায়ের গঠন ও নব নব ধর্ম্মঘটের আন্দোলনের দ্বারা এবং অন্যবিধ যৌথ অনুষ্ঠানের সাহায্যে সমস্ত শ্রমিকদিগের মধ্যে সহযোগিতা ও ঐক্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিতেছিল। যুদ্ধ ব্যাপারকে অন্ততঃ ইহাদের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যরূপে ইহারা অবলম্বন বা অনুমোদন করেন নাই। বরং ফ্র্যাঙ্ক জার্ম্মাণ যুদ্ধ বিঘোষিত হইলে উহারা ঐ যুদ্ধের বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিবাদধ্বনিই তুলিয়াছিল। অপর দিকে নানা নূতন কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে একটা লক্ষ্য তাহারা স্থির রাখিয়াছিল। সেই লক্ষ্য কি? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বিদ্ধস্ত করিয়া উহাকে এমনভাবে পুনরায় গঠিত করিয়া তোলা যাহাতে বিবিধ শ্রেণী বিভাগ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, সকলেই সমান অবস্থায় আসে। এই জন্য যে কোন লোকের যেমন ভাবেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকুক, সেই সোসিয়ালিজমের বিজয়কে নিজের ও নিজ পরিবারের ধ্বংসের হেতু বলিয়াই মনে করিল। প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রপদ্ধতির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষপাতী লোকেরা সোসিয়ালিজিমের ব্যবস্থাকে ঘোর সমাজ-বিপ্লব বলিয়া বুঝিল। কারণ এই সোসিয়ালিজম্ প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানেরই ধ্বংস করিবে। থাকিবার মধ্যে থাকিবে কেবল মাত্র এক

রাষ্ট্র শক্তি এবং তাহার দ্বারা পরিচালিত ও পরিপোষিত শ্রমিক বৃন্দ। সুতরাং ইহা একেবারেই আশ্চর্য্য নয় যে, এখন এ পক্ষ ও পক্ষের অনেকেরই এই ধারণা জন্মিয়াছিল, যে কল্পিত এই সুখের অবস্থা বিনা বল প্রয়োগে আসিবার নয়। এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি অবশ্য ঐ ধারণার প্রতিকূলে এই আশার বাণী প্রচার করিতেছিল, যে রক্তপাত বা সংগ্রামের ভয় নাই, সময় আসিলে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী মত এমন প্রবল হইয়া উঠিবে যে প্রচলিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাহা স্বীকার বা সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

ইহা মনে করা অবশ্য ভুল নহে, যে আন্তর্জাতিক সমিতির মত প্রতিষ্ঠানাদির আন্দোলনের ফলে অজ্ঞ ও অবিবেচকদের প্রবৃত্তি ধীরতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অতি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আন্দোলন ছাড়া সোসিয়ালিজম বাঁচিতে ও বাড়িতে পারে না। এই আন্দোলনের বৃদ্ধি ও পুষ্টি করিতে হইলে, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে পার্থক্যের ভাবটাকে আরও বর্দ্ধিত ও স্পষ্টীকৃত করা দরকার, অন্যায়ের অনুভূতিকে বিশেষ জাগাইয়া তোলা চাই। মূলধনী মালিকদের তস্করের সমান দেখিতে হইবে। ইহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে, বৃহৎ কোন ধর্ম্মগত বা রাজনীতিগত আন্দোলনকারীদের দলের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সময়ে সকলের পক্ষে সমান সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। সোসিয়ালিজম আন্দোলনের নেতৃগণের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ উত্তেজনার সময়েও অন্ততঃ ইঁহারা যে সংযম দেখাইবেন, এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারাও এমন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা কোন সদনুষ্ঠানের পক্ষপাতীর পক্ষে লজ্জাস্কর। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্ক্স ও ইঞ্জেলস্ প্রচারিত সঙ্ঘতান্ত্রিক ইস্তাহারের কথা উল্লেখ করা

যায়। উভয়েই বিশেষ জ্ঞানী ও দক্ষব্যক্তি, যে কোন দলের অগ্রণী হইবার যোগ্য। কিন্তু ইঁহারাও সেই ইস্তাহারে এইরূপ লিখিতে দ্বিধা করেন নাই, যথা—"সোসিয়ালিষ্টদের কোন প্রকাশ্য বিবরণীতে সম্পত্তির মত পত্নীরও সহাধিকারিতার উল্লেখ দেখিয়া বর্ত্তমান বিশিষ্ট পদবীর লোকেরা বড় একটা নৈতিক আশঙ্কা দেখান। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ আশঙ্কা দেখান বড়ই হাস্যস্কর বলিয়া মনে হয়। কারণ এ সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টরা ত নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতেছেন না। ওরূপ পত্নীগত সহাধিকারিতা বর্ত্তমান সমাজে ত একরূপ প্রচলিতই রহিয়াছে। বুর্জ্জোয়া বা ধনীমালিক শ্রেণীর লোকেরা কেবল প্রোলেটারিয়েট্ বা শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের পত্নী ও দুহিতাদের লইয়া টানাটানি করিয়া ক্ষান্ত হননা, পরস্পর নিজেদের স্ত্রী কন্যা লইয়াও কাড়াকাড়ি করিতে কম আনন্দ অনুভব করেন না। প্রত্যুতঃ বর্ত্তমানে যে সিভিল ম্যারেজ বা কেবল আইনের ধারার একটা বিবাহ পদ্ধতি আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে পত্নীর সহাধিকারিত্ব ছাড়া আর কি?" এইরূপ কথা যে সব লোক পৃথিবীতে প্রচার করিতে পারে, তাহাদের অন্য কথা যে কেমন করিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইবে, এই প্রশ্ন সকলেই করিতে পারেন। অন্যরূপ বিদ্বেষের নিদর্শনও এখানে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সঙ্ঘের লণ্ডনস্থ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডুপোঁ সেডানের যুদ্ধের পর তাঁহার একখানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের হস্তেই সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ উৎপীড়ক সম্প্রদায়কে সন্ধি করিতে বাধ্য করাই শ্রমিকদের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহাদিগকে এমন লজ্জায় ফেলা হইবে, যাহা কখনও মুছিবার নয়।" অপর একটী লেখা এইরূপ—"বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায় নিজেদের বিজয়ে বড়ই মুগ্ধ হইয়া

আছে। তাহারা আমাদের সঙ্ঘের উন্নতি ও প্রভাব এখনই অনুভব করিতে পারিবে না। যথার্থ সংগ্রামের জন্য শ্রমিকদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।" তাহাদের উক্তির এইরূপ আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সিলভিস (Silvis) নামক কোন এক ব্যক্তি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয় শ্রমিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—"আমাদের শেষ যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য ধনজাত আভিজাত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধনগত অভিজাতশক্তি জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের যাহা কিছু সব শোষণ করিতেছে। আমরা উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। বিশ্বাস করি, আমরাই জয়ী হইব। আমরা প্রথমে বহুমতের সাহায্যেই জয়লাভ করিতে প্রয়াস পাইব। কিন্তু উহা যদি বিফল হয়, তবে অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিতে ছাড়িব না। এইরূপ ক্ষেত্রে কিছু রক্তপাতেরও দরকার সময়ে সময়ে হয়।"

খৃষ্টীয় ১৮৭১ সালের বসন্তকালে ফ্রান্সে যে সব ভীষণ কাণ্ড সংগঠিত হয়, তাহাতে লিপ্ত থাকার সন্দেহে এই আন্তর্জাতিক সমিতিকে বিশেষরূপে ভুগিতে হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত সে ভোগের একেবারে শেষ হয় নাই।

পেরিসের এই সব বীভৎস কাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে ন্যায়তঃ কি অসঙ্গত—যে ভাবেই হউক—এই সব ঘটনার পর এইরূপ একটা সাধারণ ধারণা জন্মিল যে, এই সঙ্ঘ সমস্ত প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের যেন রক্তপিপাসু শত্রু। এইজন্য য়ুরোপের সকল দেশেই এই সঙ্ঘের উপর পুলিসের তীব্র দৃষ্টি পতিত হইল। এই সময় হইতেই ইহা ক্রমশঃ গুপ্ত সমিতির আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং সেই কারণে যে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনিয়ন্ত্রিত, উদ্দাম এবং উদ্দেশ্য সাধনে অপেক্ষাকৃত অক্ষম হইয়া উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) কার্ল মার্ক্সের মতবাদ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর বিশিষ্ট দুইটি পরিবর্ত্তনের ধারা সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে দেখা দেয়। একটি এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহা অধিকতর আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং ইয়োরোপের শ্রমিকদিগকে একই সমবায়ের মধ্যে আনিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। আর একটি এই যে নূতন সমাজ গঠনের যাহা কিছু সংগ্রাম তাহা প্রধানতঃ অর্থনীতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল।

এই কথাতে এরূপ বলা হইতেছে না যে ইহার পূর্ব্বে মূলধনী ও শ্রমিকদের প্রচলিত সম্বন্ধের বিরুদ্ধে অর্থশাস্ত্রগত যুক্তিতর্ক খাড়া করা হয় নাই এবং ইহাও ঠিক নয় যে এ পর্য্যন্ত সকল দেশে সোসিয়ালিষ্টরা নিজ নিজ আন্দোলনের কাজকর্ম্মে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। তবে কিনা এই সময় হইতে এই দুইটি লক্ষণই সোসিয়ালিজম আন্দোলনের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত এই আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি, যে কার্লমার্ক্স ও অপরাপর জার্ম্মানরা এরূপ আন্দোলনের অনেক সহায়তা করিয়াছেন। ধরিতে গেলে বর্ত্তমানে সোসিয়ালিজম সর্ব্বত্র—বিশেষ জার্ম্মানীতে—যে আকারে দেখা দিয়াছে তাহা এই খ্যাতনামা জার্ম্মানই ইহাকে প্রদান করিয়াছে। তাই বর্ত্তমান সোসিয়ালিজমের বিশিষ্টতা বুঝিতে হইলে যতটা প্রয়োজন মার্ক্সের অর্থনৈতিক যুক্তিতর্কের ততটা আলোচনায় এখন আমরা প্রবৃত্ত হইব।

মার্ক্স ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অর্থনৈতিক সমালোচনা নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঐ গ্রন্থেরই অনুরূপ মূলধন ও অর্থনীতি সমালোচনা নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম ভাগই মাত্র বাহির হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা অতিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করে। মূলধনের উৎপত্তিই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়।

বর্ত্তমান শ্রমশিল্পের আকার এবং উহার ফল-বণ্টনের বিরুদ্ধে মার্ক্সের প্রধান আপত্তির কথা এই যে, কোন জিনিশের মূল্য কেবলমাত্র উহার উৎপাদনে প্রযুক্ত শ্রমের দ্বারাই নির্ণীত হওয়া বিধেয়। কিন্তু এখন এই মূল্যের সমস্তটাই কেবল বেতনের আকারে শ্রমিকদেরই প্রাপ্য হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, কয়েক গজ কাপড় বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ পাওয়া গেল। এখন এই অর্থের সবটা কেবল মাত্র শ্রমিকেরাই পায় না। ঐ বস্ত্র উৎপাদনের জন্য যে শ্রমিকদের নিযুক্ত করিয়াছে, সেও ঐ অর্থের কিছু অংশ লয়। হয়ত দৈনিক ৬ ঘণ্টা মজুরী করিলে কোন শ্রমিক নিজের ও তাহার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাকে ঐ উদ্দেশ্যে ১০ ঘণ্টা কার্য্য করিতে হইতেছে।

এখন ঐ উপরি কাজের ফল কোথায় যায়? অবশ্য ইহা ঐ শ্রমিকের নিয়োগকর্ত্তা ও তিনি যে মূলধনীর নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছেন, তাহাদের হাতে গিয়া পড়ে। কিম্বা নিয়োগকর্ত্তা যদি নিজেই মূলধনী হন, তবে তিনি একাই উহা সব গ্রহণ করেন। শ্রমিকরা কাজ করিয়া যাইতেছে এবং সন্তানসন্ততিরূপে পৃথিবীতে নূতন নূতন শ্রমিকের আমদানী করিতেছে। নূতন শ্রমিকেরাও সর্ব্বপ্রকারে ঐ পুরাতনদেরই অনুসরণ করিতেছে।

ইহাতে বেতনের হার এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কোন রকমে শ্রমিকদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। ভবিষ্যৎ শ্রমিক বংশের উন্নতির আশা কিছু নাই। প্রতিযোগিতা বা সহকর্ম্মিতা এই বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য করিতে অসমর্থ। মূলধনীদের সহযোগিতায় বেতনের হার যতদূর সম্ভব কমিবারই সম্ভাবনা; শ্রমিকদের সহযোগিতায় বেতনের হার সাময়িক ভাবে কিছু বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু বেতনের হারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও বাড়িয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে ঐ বর্দ্ধিত হারের হ্রাসও অনিবার্য্য। লভ্যাংশের হার কমিলে শ্রমিকেরা যে সব জিনিশ ব্যবহার করে, তাহাদেরও দাম কমে বটে, কিন্তু ইহাতে শ্রমিকদিগের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কিছু সুবিধা ঘটে না। অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে একজন শ্রমিক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার বেতনের হারও যে কমিয়া যায়। তবেই বর্ত্তমান শ্রম ও মূলধন মূলক পদ্ধতি এক প্রকার বেনামী দস্যুতা। মার্ক্স বলেন, এ বিষয়ে বর্ত্তমানে মূলধনীরাই অপহারক বা বঞ্চক, সুতরাং তাঁহাদিগকে এখন বঞ্চিত হইতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রমিক ও নিয়োগকর্ত্তার মধ্যে প্রচলিত চুক্তির নিয়মে বেতনের হার নির্দ্ধারিত হইবে, ততদিন ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা সুদূর পরাহত। অন্য কথায়, যতদিন উৎপাদনের কার্য্য ব্যক্তিগত ভাবে চলিবে, ততদিন শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কোন আশা নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির, অন্ততঃ উহার যতটুকু অংশ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হয়, তাহার বিলোপ সাধনই প্রচলিত পদ্ধতিজাত অমঙ্গলের প্রতীকারের একমাত্র উপায়। এতদর্থে উৎপাদন ক্রিয়ার ব্যক্তিগত

পরিচালনা নিরোধ করিয়া এখন উহার ভার রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। মানব ও মজুর ভেদে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে না; সকলকেই এক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহারা সকলেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের অধীন থাকিয়াই কার্য্য করিবে এবং রাষ্ট্রের নিকট হইতেই তন্নির্দ্ধারিত নিজ নিজ বেতন গ্রহণ করিবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, রাষ্ট্র নিজের কার্য্য পরিচালনার ব্যয় বাদে ভবিষ্যৎ শ্রমশিল্পের যথাযথ স্বার্থরক্ষা পূর্ব্বক শ্রমিকদের শ্রমকালের অনুপাতে তাহাদের বেতন যতটা বেশী পারে সেইরূপই নির্দ্ধারণ করিবে। এরূপ পদ্ধতির প্রচলনে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের বেতনের হার বর্ত্তমান অপেক্ষা বাড়িবে কিনা অথবা তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণের বর্দ্ধন ঘটিবে কিনা, এসব প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হইবে। এখন এ সম্বন্ধে এইটুকু অবাধেই বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রই যদি একমাত্র নিয়োগকর্ত্তা ও মূলধনী হইয়া দাঁড়ায়, তবে নিজ নিজ কার্য্যের নির্ব্বাচনে, বেতনের নির্দ্ধারণে, বাসগৃহের সংস্থাপনে, শ্রমিকদের কোনই স্বাধীন ইচ্ছা থাকিবার কথা নয়। ফলে শ্রমিকের কার্য্য বাধ্যতামূলক হইয়াই দাঁড়াইবে। প্রত্যুত ইহাতে যেন মধ্যযুগের দাসত্ব প্রথারই পুনরাবর্ত্তন ঘটিবে। কারণ তখনও কোন দাসের কোনরূপ নিজস্ব ভূসম্পত্তি ছিল না, সে নিজের ও প্রভুর ভরণ-পোষনার্থ খানিকটা সময় নিজের ও খানিকটা সময় প্রভুর কাজ করিত।

যতদূর বুঝযায়, কোথাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে অন্যায় নীতি প্রসূত ইহা প্রতিপন্ন করিতে মার্ক্স প্রয়াস পান নাই। পরন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে যে ইহা আপনিই গড়িয়া উঠিয়াছে, এইরূপই

তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আরও, বঞ্চকদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে, এই নীতির অবলম্বনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও রাষ্ট্রগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা যে একরূপ অবশ্যম্ভাবী, এ কথারও বড় বেশী আলোচনা তিনি করেন নাই। তবে এই নীতি মানিয়া লইলে বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থাগত অমঙ্গলের প্রতীকারের পথ দাঁড়ায় এই যে, হয় সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পতি একেবারেই বাজেয়াপ্ত করা চাই, নয় উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপ ঘটাইয়া ক্রমশঃ এরূপ ঘটাইতে হইবে। অথবা এই বাজেয়াপ্তের কাজ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরে এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে অধিকারীরা সহসা একেবারে নিঃস্ব হইয়া না পড়ে। এইরূপ সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-কল্পে কিরূপ কাজের পথ অবলম্বনীয় সে সম্বন্ধে মার্ক্সের লেখার ভিতর বড় কিছু পরিদৃষ্ট নয় না। তবে এ ব্যাপারটি অবশ্য বড়ই গুরুতর, পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচিত করা যাইবে।

মার্ক্স বলেন, সমাজে যে সব জিনিশের আদান প্রদান চলে, সে গুলি আসলে মানুষের মূর্ত্ত শ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজে কোন জিনিশ উৎপন্ন করিতে যে শ্রমের দরকার হয়, তাহার পরিমাণ দ্বারাই উহার মূল্য নির্ণীত হইবে। যে সব জিনিশের উৎপাদনে সম পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হয়, তাহাদের মূল্যও সমান। একটি জিনিশের উৎপাদনে যে সময়ের দরকার এবং অপর জিনিশের যে সময় লাগে এই উভয় সময়গত শ্রমের অনুপাতের দ্বারা উহাদের উভয়ের মূল্যেরও অনুপাত নির্ণীত হইবে। অবশ্য কেবল শ্রমের হিসাব ধরিলে যে সব কাজে সমান মজুরী পড়ে, তাহাদের দামও সমান দাঁড়ায়। কিন্তু প্রযুক্ত শ্রমই

যে কোন উৎপন্ন দ্রব্যের মূলের একমাত্র নিয়ামক একথা ঠিক নয়। সম মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে সময়গত শ্রম-পরিমাণের যথার্থ হিসাব রাখা একরূপ অসম্ভব। এ সম্বন্ধে একই হিসাব ধরিয়া সহজসাধ্য ও কষ্টসাধ্য উভয় রকমের কাজকে কি করিয়া এক কোঠায় ফেলা যাইতে পারে? যে কাজে বুদ্ধি ও শিল্পগত চাতুর্য্যের বিশেষ প্রয়োজন, সেই কাজের পাশে সামান্য একজন মজুরের কাজকে কি করিয়া সমান বলিয়া খাড়া করা যায়? দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্ম ও সুসংস্কৃত কাজ ও আনাড়ির মোটা কাজ এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। প্রথমটির দিকেই সকলের ঝোঁক পড়িবে। মনে করুন, একটি মোটা কাপড়ে ও একটি সুন্দর সূক্ষ্ম কাপড়ে সমানই সময় লাগিয়াছে। কোনও দেশে, এমন কি সোসিয়ালিষ্ট পরিচালিত রাষ্ট্রেও এই উভয় প্রকার দ্রব্য কি সমান বলিয়া সাধারণে গণ্য হইবে? কোন্ দ্রব্য বাজারে কত আমদানী হয় আর কোন দ্রব্য কত লোকে চায়, তাহার হিসাবেই তাহাদের মূল্য নিয়মিত হয়।

কিন্তু এসব অপেক্ষা শ্রমশিল্প সম্বন্ধে মালিক বা অধ্যক্ষের কথাটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সব কাজ সমাধা করিতে অনেক সময় লাগে, যাহা বিপুল আয়তনে পরিচালিত হয়, যাহাতে বহুতর ব্যক্তির নিয়োগ এবং সতর্ক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয়, যাহাতে জিনিশের কাট্‌তি ও সাধারণের রুচি বিষয়ক অভিজ্ঞতা থাকা চাই, সেইরূপ কাজের ব্যবসায়ে বড় কোনও মালিক বা অধ্যক্ষের কথাটা একেবারেই বাদ দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান পদ্ধতিতেই এরূপ কাজে যে অধ্যক্ষের বিশেষ দরকার, তাহাই নহে। যে কোন পদ্ধতিতেই সামাজিক কার্য্য পরিচালিত হউক না, এরূপ কোনও

অধ্যক্ষ বা তৎস্থানীয় লোককে বাদ দেওয়া অসম্ভব। কেবলমাত্র শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত যৌথকারবারেও ঐরূপ লোক থাকা প্রয়োজন। ঐরূপ যৌথ কারবারকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করিতে হয়, তবে ঐ শ্রমিকদের মধ্যে দুই একজনকে ঐ অধ্যক্ষের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কাজ করিতে হইবে, এবং রাষ্ট্রই যদি সকল অধ্যক্ষের ও মূলধনীর স্থান অধিকার করে, তবে তাহাকেও ঐরূপ অসংখ্য পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রাখিতে হইবে। নতুবা কাঁচা মাল সংগ্রহ করা, উৎপাদনের যন্ত্রগুলি ঠিক রাখা, শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া, বাজারের উপযোগী জিনিশের নির্দ্ধারণ করা, আদান প্রদান সম্পাদন, হিসাব রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য চলিবে কি প্রকারে?

অনেকে যে শ্রমশিল্পের কারবারে সাফল্য লাভ করিতে পারেনা, তাহার কারণ এই যে তাহাদের তত্ত্বাবধানের উপযোগী অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তি সেরূপ নাই। শ্রমিকদের শ্রমশীলতা ও নৈপুণ্য তত্ত্বাবধানের স্থান পূর্ণ করিতে সমর্থ নয়। ধরিতে গেলে, কাজের প্রকৃত সাফল্য যাহা কিছু, তত্ত্বাবধায়কের সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করে। যদি এই তত্ত্বাবধায়ক নিজে মূলধনী না হন, তবে কাঁচা মালের সংগ্রহের নিমিত্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের পূর্ব্বে শ্রমিকদের বেতন দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অপরের নিকট হইতে মূলধন ধার করিয়া নিতে হইবে। যাহারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহাদের সহিত যোগাযোগ ইঁহাকেই স্থাপন করিতে হইবে। কোন জিনিশ কখন উৎপন্ন করা বিশেষ সুবিধাজনক, তাহা ইনি নির্দ্ধারণ করিবেন। কোন্ প্রকারের জিনিশ কতটা উৎপন্ন করা প্রয়োজন, তাহাও ইনিই নির্ণয় করিবেন। তাঁহার রুচি ও বিচার শক্তি বহুপরিমাণে বিক্রেয়ই দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ। ইঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা থাকা নিতান্ত

দরকার। সংক্ষেপে, একজন দক্ষ সেনাপতি যেরূপ তাঁহার সমস্ত সেনার সমাবেশ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করেন, সেইরূপ এই তত্ত্বাবধায়ককেও কার্য্যসম্পাদন সম্বন্ধীয় বিষয়ের সম্যক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শ্রমিকেরা নিজেদের বেতন প্রাপ্তি সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত, যাহা কিছু ক্ষতির দায়িত্ব মালিক বা অধ্যক্ষের উপরেই বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন এই, যে লোকের উপর কাজের এতটা দায়িত্ব নির্ভর করে, তাহাকে কি অনাবশ্যক বলিয়া বাদ দেওয়া যায়? এরূপভাবে যিনি দায়ী, কার্য্যের ভাল ফল ফলিলে তবে তাঁহাকে কি ঐ ফলের যথাযোগ্য অংশ দেওয়া উচিত নয়? কারণ কার্য্যের ওরূপ সাফল্য কি তাঁহার সাহায্যেই লব্ধ হয়না? এবং অনেক স্থলে তাহার এরূপ লাভে শ্রমিকেরাও কি লাভবান্ হয় না? নিয়োগকর্ত্তাদের লভ্যাংশের বর্দ্ধন ও সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহাতে শ্রমিকেরা ও অপরাপর সকলেই কি পরিশ্রমে লাভবান্ হয় না? ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, অবশ্য সকলকেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। সে সময়ে শ্রমিকেরা তাহাদের প্রাপ্য পূর্ণভাবে পাইলেও ব্যবহার্য্য জিনিশের দাম চড়িয়া যাইবে এবং সেই হিসাবে তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মার্ক্সের পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যে ব্যয়িত সময়ই বেতনের একমাত্র নিয়ামক। ঐ বেতনের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, সামর্থ্য বা বিশেষ জ্ঞানের কথা কিছুই ধরা হইবেনা। কাজ কাজই, এক সময়ের জন্য যে ভাবে যে কোন কাজই করা হোক, তাহার মজুরী সমানই হইবে। তত্ত্বাবধায়কের বেতন নির্ণয়েও এই সাম্যনীতির কোন ব্যাঘাত ঘটিবেনা। তত্ত্বাবধায়ক যদি উপযুক্ত লোক হন, তবে এরূপ যৌথকারবারের উদ্দেশ্য তাঁহার

দ্বারাই সাধিত হয়। যখন একমাত্র তাঁহারই উপর কার্য্যের সাফল্য এতটা নির্ভর করে, তখন তাঁহার তত্ত্বাবধানের পুরস্কার কি ন্যায়ানুসারে তদনুরূপ হওয়া উচিত নয়? তবে অবশ্য যদি এরূপ নিয়ম করা হয় যে, কেবল মাত্র জীবন ধারণই প্রত্যেক কর্ম্মীর উদ্দেশ্য হইবে, তদতিরিক্ত কিছুর উপর কাহারও দাবী থাকিবেনা—সে আলাদা কথা।

এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মূলধন ও শ্রমের সমবায়ে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার সামান্য অংশ মাত্রই মূলধনী ও নিয়োগকর্ত্তাকে দেওয়া হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে মিষ্টার এডওয়ার্ড এটকিনসন (Edward Atkinson) একজন বিশিষ্ট বিচারক। তিনি বলেন, কাঁচামাল কি শ্রমশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে যাহারা কাজ করে, উৎপন্ন জিনিশের শতকরা ৯৫ কি ৯৭ অংশ তাহাদের প্রাপ্য, অবশিষ্ট ৫ বা ৩ অংশ মাত্র অধিকারী পাইবে। এবং এই অংশ হইতেই অধিকারী নিজের ব্যক্তিগত ব্যয় ও করের ভার বহন করিবে। সম্প্রতি সোসিয়ালিজম সম্বন্ধে মিল (John Stuart Mill) যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে গ্রেটব্রিটেনের মূলধনীরা সুদ স্বরূপ যাহা পায়, তাহা শতকরা তিনের কিছু বেশী মাত্র। ইহার উপর যাহা অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক পান, তাহা তত্ত্বাবধানের বেতনরূপে, সম্ভাব্য ক্ষতির পূরণে ও অন্যান্য কারণে গৃহীত হইয়া থাকে।

যদি প্রচলিত রীতি অপেক্ষা অপর কোন এমন সুপদ্ধতি থাকে, যাহাতে শ্রমিকদিগের বেতনের হার বাড়িয়া যাইতে পারে এবং সেই সঙ্গে সমাজের সকল শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হয়, তবে তাহা অচিরেই পরীক্ষিত হৌক। ধরাযাক, লভ্যাংশের সমগ্র শ্রমিকদিগকে প্রদত্ত হইল। তাহাতে কি সামাজিক সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নিরাকৃত হইবে?

কথনই নয়। সমস্ত মূলধনই তখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাহৃত হইবে। বিনা লাভে বৃথা কে টাকা খাটাইবে?

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করা যাইতে পারে যে, ন্যায়তঃ সমগ্র লভ্যাংশের উপর শ্রমিকদের দাবী থাকিতে পারে না। তবে ইহার কতটা পরিমাণ ইহাদের প্রাপ্য? সামাজিক মঙ্গল ও ন্যায় অনুসারে জীবনধারণের জন্য যতটা প্রয়োজন, কেবল তৎপরিমাণই কি উহাদিগকে দিতে হইবে, না তদপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী পরিমাণের উপর উহাদের দাবী স্থাপিত হইবে? অধ্যাপক কেয়ার্ণেস্ (Prof. Cairnes) বলেন যে, তিনি এমন কোন ধরাবাঁধা ন্যায়সঙ্গত নীতির বিষয় অবগত নহেন, যাহা শ্রমশিল্পজাত লভ্যের বণ্টনে প্রযুক্ত হইতে পারে। তাহার মতে অর্থনৈতিক যুক্তিতর্ক যে সব মূল ধারণার উপর বর্ত্তমানে সংস্থিত, কোনরূপ ন্যায়ের দোহাই দিয়া সে গুলির আলোড়ন মঙ্গলপ্রদ হইবেনা। যদি সমাজ হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবী ও শ্রমশিল্পের পরিচালনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ করা হয়, তবে উহার ফল এই হইবে যে দেশের যে ধনাগম হইতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই নিজ নিজ জীবিকোপায় প্রাপ্ত হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ বা বহুল হ্রাস ঘটিবে।

জার্ম্মান শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা সোসিয়ালিষ্টদের মত গ্রহণ করে, তাহারা বোধ হয় এইরূপ আশা করিয়াছিল, যে নবতর সোসিয়ালিষ্ট মতাবলম্বী জগতে শ্রমশিল্পজাত সমস্ত লাভই শ্রমিকেরা মাত্র পাইবে, এবং উহা হইতে তখনকার নূতন মালিক বা পরিচালক রাষ্ট্রের জন্য কিছুই কাটিয়া লওয়া হইবেনা। কিন্তু কাঁচা মাল সংগ্রহ ও কল-কারখানার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি রাষ্ট্র অন্যতর কোন অর্থ ভাণ্ডার হইতে আর্থিক সাহায্য না পায়, তবে কেমন করিয়া উহা সম্ভব হইবে?

শুধু ইহাই নয়। শ্রমশিল্পের যথাযথ পরিচালনার্থকে রাষ্ট্রকে মালিক বা পরিচালক রূপে শ্রমজাত লভ্যাংশের কিছু যেমন লওয়া চাই, তেমনই শাসনপ্রতিষ্ঠান রূপে নিজের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ও কিছু লভ্যাংশ লওয়া চাই। তারপর কেবলমাত্র সময়ের হিসাব ধরিয়া মালিক কি তত্ত্বাবধায়ক, কি দক্ষ বা অদক্ষ শিল্পী সকলকেই সমান হিসাবে বেতন দিবার পদ্ধতি সম্ভব কি হইতে পারে? কার্য্যতঃ ঐ পদ্ধতির ফল ভাল কি মন্দ হইবে সেইটাও বিশেষভাবে লক্ষনীয়। কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতির সাফল্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের অবসর আছে।

(খ)

ফার্ডিনাণ্ড লাসেল (Ferdinand Lassale) ও জার্ম্মান শ্রমিক সঙ্ঘ।

মার্ক্স এবং লাসেল জার্ম্মান সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনের দুইজন বিশিষ্ট নেতা। তবে মার্ক্সের মতগুলি অনেকটাই অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন; লাসেলের মত খাঁটি জার্ম্মান ভাবাপন্ন। চরিত্রের বিশেষত্বেও উভয়ের মধ্যে খুবই পার্থক্য। মার্ক্স আবেগহীন ও কতকটা কড়া স্বভাবের লোক। বক্তা অপেক্ষা দার্শনিকের ভাবই তাঁহার মধ্যে বেশী প্রবল। তিনি সামাজিক নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্ত্তন ও প্রচারে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সভাসমিতিতে আন্দোলনকারীরূপে তেমন কৃতিত্ব কিছু দেখাইতে পারেন নাই। অপরদিকে লাসেলের জীবন অতি ভাবপ্রবণ। ভোগাসক্তিও তাঁহার বড় কম ছিল না। তিনি যেমন প্রশংসাপ্রিয় ছিলেন, তেমনি কেমন করিয়া অপরের আবেগময় সহানুভূতি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে হয়,

তাহাও ভালরূপ জানিতেন। যুক্তিতর্কের দ্বারা যতটা সম্ভব, সোসিয়ালিজম সম্বন্ধে মার্ক্স তত্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সোসিয়ালিষ্ট আদর্শে এমন কতকগুলি নীতির প্রচার লাসেল করিয়া যান, উত্তমশীল কর্ম্মীর হাতে যাহার ক্রিয়ার ফলে সমাজ একেবারে ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ নীতির প্রবর্ত্তনা করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তদনুযায়ী ফল লাভে তিনি নিজে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মতামতের সাফল্য এখনও যেন অনেক দূরে, এই ভাবিয়াই ভবিষ্যতের জন্য সেগুলির বীজমাত্র নিহিত করিয়া গিয়াছেন। অর্থ বিজ্ঞানে মার্ক্সের মত তাহার তেমন পাণ্ডিত্য ছিল না। কিন্তু আইন ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তিনি মার্ক্স অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই ছিলেন। তিনি বিশেষ গুণশালী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তেমন আত্মসংযম ছিল না। তাঁহার জীবন যেন দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বারা চালিত হইয়াছিল। এই দ্বৈধভাব থাকাতে কোন দিকেই তিনি বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই। পরিণামে তাঁহার দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ পাইয়াছিল। যে লোক একাধারে বক্তা, শাস্ত্রজ্ঞ আবার সুখান্বেষীও হয়, সে কোন স্থায়ী কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেনা। তথাপি তাঁহার বিশেষ গুণে তাঁহার দলের মধ্যে তিনি এমন অপ্রতিবাধ্য নেতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মান সোসিয়ালিষ্টদের একপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিত। তবে অপর পক্ষ তাঁহার বিশেষত্ব কিছু অনুধাবন করে নাই। উঁহারা তাঁহাকে যেন কিছু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। লাসেল ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রেসল (Breslau) নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন ধনী ইহুদী বণিকের সন্তান। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিজের কার্য্যেই নিয়োগ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

কিন্তু পাঠার্থীর জীবন অধিকতর আকর্ষণের বস্তু হওয়ায় লাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তথায় তিনি দর্শন ও আইন অধ্যয়নে রত হয়েন। পরে বার্লিনে তিনি গৃহশিক্ষকরূপে অবস্থান করিতে মনস্থ করেন। এখানে বড় বড় কয়েকজন পণ্ডিতের বিশেষ প্রশংসাভাজন তিনি হইয়া উঠেন। একজন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, লাসেল আধুনিক যুগের একজন খাঁটি সন্তান। ইঁহারা আত্মসংযমত্ত হিসাবী বুদ্ধির বড় তোয়াক্কা রাখেন না।

বার্লিন-সুন্দরী হেজফেল্ডের কাউণ্টেসের (Countess of Hatzfeld) সহিত আলাপের পর লাসেলের জীবন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মূল উদ্দেশ্য ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে জড়িত হইয়া পড়ে। এই সুন্দরী তখন প্রৌঢ়বয়স্কা এবং পতিত্যাগের মামলায় ব্যাপৃতা। লাসেল আইনবিষয়ক পরামর্শদাতারূপে কাউণ্টেসের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং এই ব্যাপারে তাহার জীবনের দীর্ঘ আট বৎসর কাটাইয়া তবে এই মামলাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই মকদ্দমা উপলক্ষে মক্কেল ও উকিল উভয়ের মধ্যে স্থায়ী একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। লাসেল তাঁহার এই ওকালতার জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার থেলার কাউণ্টেসের নিকট হইতে পাইতেন।

যথার্থ সহানুভূতির প্রণোদনেই লাসেল ঐ মহিলাটির কাজে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে লাসেল কোনও বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে, ওরূপ ক্ষেত্রে কাউণ্টেসের পক্ষাবলম্বন করা তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনে চিরদিন একটা গর্ব্বের বিষয় বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু তিনি এই কাজের উপলক্ষে এমন একটা সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন, যাহা সমালোচকদের চক্ষে নিতান্তই দোষাবহ। সেই জন্য তাঁহার ঐ ব্যাপারে যোগ

দেওয়াটা কেহই সুনজরে দেখেন নাই। একজন খ্যাতনামা জার্ম্মান লেখক বলিয়াছেন—"অপরিমিত মদ্য ভোজ্য সম্ভারে পরিবেষ্টিত জননেতৃত্ব কি বিসদৃশ বস্তু! উৎপীড়িতের পক্ষাবলম্বনের অঁছিলায় এই লোকটি কি অপবিত্র জঘন্য জীবনই না যাপন করিয়াছে! হেজফেল্ডের সৌখীন দুর্নীতির আবেষ্টনে যাহারা গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে ফ্রান্সের বিলাসী সমাজও পশ্চাৎপদ হইত। কিন্তু জার্ম্মান সমাজনীতি এতটা অপূর্ণ ও শিথিল যে ওরূপ লোকদের সংসর্গ তাহারা অবাধে সহ্য করিতে পারে।"

১৮৫৭ অব্দের বসন্তকাল পর্য্যন্ত লাসেল ডাসেলডফ নগরে বাস করেন। এখানে তিনি এমন কতকগুলি আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, যাহাতে মার্ক্স, এঞ্জেল্স প্রভৃতি সামাজিক নেতৃগণের সহিত তাহার কিছু ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। ১৮৪৮ অব্দের বিদ্রোহের বৎসরে তিনি জনসাধারণকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। কিন্তু এ অভিযোগ টেঁকে নাই। যদিও তিনি এ ব্যাপারে তেমন কোন শাস্তি পান নাই, তথাপি তাঁহাকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পরে একটা সামান্য অপরাধের জন্য তাহাকে ছয় মাস কারাবাস ভোগ করিতে হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন কাউণ্টেসের মামলা শেষ হইয়া যায়, তখন তিনি ছদ্ম বেশে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছু পূর্ব্বে গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, সেখানি এই বৎসরে প্রকাশিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নাটক, ইতিহাস, অর্থ-নীতি ও জনতন্ত্র সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কয়েক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে ফিক্টের (Fichte) দর্শন ও জার্ম্মান জনতন্ত্র

সম্বন্ধীয় পুস্তক খানিতে তিনি জার্ম্মান জনতন্ত্র বিষয়ক তাহার নিজের ধারণাগুলি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পান। অর্জ্জিত স্বত্ব-সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি দুই ভাগে প্রকাশিত হয়। ঐরূপ কতকগুলি সামাজিক স্বত্বের আলোচনা করাই এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, এগুলি প্রকৃত পক্ষে বিধিমূলক নয়, পরন্তু ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ সামাজিক আবেষ্টনের প্রভাবে এগুলি উদ্ভূত হইয়াছে; আবার কতকগুলি সামাজিক আবেষ্টনের প্রভাবে লোপ পাইতে পারে। দ্বিতীয় ভাগখানি উত্তরাধিকারের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত। এ খানি প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ যুক্তিতর্কপূর্ণ প্রতিবাদ। সমাজতন্ত্র-মতের প্রতিষ্ঠার অনুকূল প্রমাণ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি মার্ক্সেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার বিচারে শ্রমজাত দ্রব্যের সমগ্র মূল্য একমাত্র শ্রমিকদেরই প্রাপ্য। এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরে লাসেল একটি বক্তৃতা দেন। ‘শ্রমিকদের কার্য্যতালিকা’ এই আখ্যায় এই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়। এটি বর্ত্তমান যুগের শ্রমিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা। ইহাতে ফিউডাল যুগের সময় হইতে বর্ত্তমানযুগ পর্য্যন্ত ফিউডাল পদ্ধতির বহির্ভূত সম্প্রদায় বা শ্রেণীগুলি কি ভাবে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সমাজে এই শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে। ফিউডাল যুগে এই বিশিষ্ট শ্রেণী ও মূলধনী সম্প্রদায় সামান্য অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহারাই সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে। এখন শ্রমিকেরা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথার সংস্কারের দাবী করিতেছে। আমরা এই সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন হইতে ঐরূপ দাবীর ভাব, হয় সংস্কার, নয় বিপ্লবের মধ্য দিয়া বলবত্তর হইতে থাকিবেই।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লাসেল জার্ম্মান শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের বৎসর খানেকের কিছু বেশী পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য জার্ম্মান রাষ্ট্রগুলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণভাবে সমান ভোটাধিকারের দ্বারা জার্ম্মান শ্রমিকদিগের স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে, এই ধারনার বশে এই সঙ্ঘের জন্ম। লাসেল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্ব প্রভাবে পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। একটি কমিটি বা সমিতির অধীনতায় তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ সমিতি সমগ্র জার্ম্মাণী ছড়াইয়া থাকায়, লোকের একত্র সমাবেশ বড় ঘটিতই না। এমন উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে তিনি ইহার কাজ চালাইয়াছিলেন যে, সেরূপ উৎসাহ উদ্যম আন্দোলনকারীদের মধ্যেও কম দৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার লেখনী সামাজিক সমস্যার সমাধানেই নিয়োজিত ছিল। এই সময় তিনি বহু অভিভাষণ ও বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রমিকেরা তাঁহার কথা আনন্দে শ্রবণ করিত। তিনি নিজের দলভুক্ত সোসিয়ালিষ্টদিগকে 'উন্নতিশীল সম্প্রদায়' (Progressive party) নামীয় অপর পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। ইহাতে বুর্জ্জোয়া বা উন্নত ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ ঘটে। এবং ফলে তাঁহার সাফল্য আশানুরূপ হয় নাই। তাঁহার আন্দোলনের শক্তি অধিনায়কদের মধ্যে নিবদ্ধ

ছিল। সমগ্র সভ্যদের ভিতর ইহা যথেষ্ট রূপে সঞ্চারিত হয় নাই। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ কি স্থানীয়, কি সাধারণ অধিবেশনে নিজের করণীয় সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিত। তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু লাসেলের দলের আন্দোলনকারীরা একজন শক্তিশালী বাগ্মী নেতার বক্তৃতা শ্রবণ ছাড়া কাজে কিছু তেমন করিত না। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার আন্দোলনটিকে কেবল মাত্র জার্ম্মান রাষ্ট্রসমূহে সীমাবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে কেবল জাতীয় ভাবাপন্ন করিয়া তোলাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সোসিয়ালিজম স্বতঃই সার্ব্বভৌমিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ ইহা যদি সামাজিক অমঙ্গলের যথার্থ প্রতীকার হয়, তবে ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বিধেয়। ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের সহিত এই জাতীয় সঙ্ঘের সম্বন্ধ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। জার্ম্মানীতে এই উভয় সঙ্ঘের মিলন ও উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পরিশেষে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর জার্ম্মান রাষ্ট্রমণ্ডলে যখন সার্ব্বজনীন ভোট নীতি প্রবর্ত্তিত হইল, তখন এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য একরূপ সাধিতই হইয়া গেল। কারণ, এখন হইতে নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্রীয় মহাসভাতেই এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার সহজ হইয়া পড়িল। যাহাই হউক, লাসেল নিজে তাঁহার আন্দোলনের এই অল্প সাফল্যে কিছু মাত্র সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে লিখিত একখানি পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার হতাশার ভাব বেশ পরিস্ফুট রূপেই বুঝা যায়। "নূতন অর্থের সাহায্য আর আমি পাই না। তাহা হইলেও রাজনৈতিক আকাশে যতক্ষণ একটু আশার আলো দেখা দিতেছে, ততক্ষণ এই সঙ্ঘটিকে ধুলিসাৎ হইতেও দিতে পারি না। আমি বড়ই ক্লান্ত। আমার উত্তেজনা এত প্রবল যে

রাত্রে নিদ্রা আসে না। আমি পাঁচটা পর্য্যন্ত শয্যায় গড়াগড়ি দিয়া অবসন্ন দেহে শিরঃপীড়ার সহিত প্রভাতে তাহাহইতে উঠি। আমি অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছি। মাস ত্রয়ের মধ্যে আমার এই গ্রন্থখানির [ইহা উন্নতিশীল দলের নেতার বিরুদ্ধে লিখিত] প্রণয়নে, আমার নিজ ভ্রান্তির ক্লেশকর উপলব্ধিতে এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঔদাস্থে আমার জীবন আমার কাছে যেন অসহ্য ভারবৎ হইয়া উঠিয়াছে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগদান করেন। এই উৎসব প্রুসিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রমিকদের দ্বারা তিনি বেশ আড়ম্বরেই অভ্যর্থিত হন। ইহার পর তিনি জার্ম্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের বহু স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিভ্রমণ করেন। অসংযত প্রবৃত্তি তাহার মৃত্যুর হেতু। এই প্রবৃত্তি বশে তিনি বড়ই গর্ব্ব ও উত্তেজনার অধীন ছিলেন। মিউনিচে তিনি এক তরুণীর প্রেমে অতিশয় মুগ্ধ হন। কিন্তু এই তরুণী তাঁহাকে প্রত্যাখান করিয়া অপর একজনকে ভজনা করেন। ইহার ফলে লাসেল তাঁহার প্রতিদ্বন্দীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট এই প্রতিদন্দ্বীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লাসেল যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুমোদন করেন নাই এবং রাষ্ট্র মধ্যে একমাত্র শ্রমিক সম্প্রদায় রাখিতেই তিনি যখন প্রয়াসী ছিলেন, তখন তাহাকে সোসিয়ালিষ্ট বলা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সোসিয়ালিজম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মতামত পরিস্ফুট ভাবে তেমন ব্যক্ত করেন নাই এবং সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তন যোগ্য তথনই কোন নূতনতর পরিবর্ত্তনের প্রণালীও তাঁহার কিছু ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। ভবিষ্যতে সমাজ মধ্যে কোনরূপ

বিপ্লব নয়, শান্তিপূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটনার্থ শ্রমিক সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁহার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। উৎপাদনক্ষম সমিতি সমূহের প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাহার একতম উদ্দেশ্য। ইহা ঠিক সোসিয়ালিজম-সঙ্গত নয়। লুই ব্লাঙ্কের কর্ম্মশালার সহিত তাঁহার কল্পিত এই সমিতির প্রভেদ ছিল এই যে ইহা রাষ্ট্রের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত না হইয়া রাষ্ট্রদত্ত সাহায্যে শ্রমিক সঙ্ঘের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইবে। কোন একটি স্থানীয় সমিতির ক্ষতি যাহাতে অপর স্থানের সমিতির লাভে পূরণ হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ উৎপাদক সমিতির সঙ্গে সঙ্গে বীমাসমিতির স্থাপনারও কল্পনা করেন। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক সমিতির অধ্যক্ষেরা এক বৃহত্তর সমিতির সভ্যরূপে সঙ্ঘবদ্ধ থাকিবেন। এখানে শ্রমিকদিগকে সাপ্তাহিক বেতন দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ সমিতির সাফল্য সম্বন্ধে লাসেল বলেন, তাঁহার এইসব সমিতির স্থাপনা একটা আজগবী ব্যাপার নয়। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে এইরূপ প্রকৃতির বহুতর সমিতির স্থাপনা হইয়াছে। উহাদের পরিচালনার ভার ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক সমিতির উপরেই একান্ত ভাবে ন্যস্ত। তাহা সত্ত্বেও এগুলি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই সব সন্ধান রাখেন, তাঁহারা কখনও তাঁহার কল্পিত সমিতির সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারিবেন না। আমাদের বিশ্বাস, লাসেলের এই প্রস্তাব চরম মতের সোসিয়ালিষ্টদের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

লাসেল তাঁহার আন্দোলনে অর্থনীতির অপর কোন কথা অপেক্ষা বেতনের নীতি সম্বন্ধেই অধিকতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখা ছিল এইরূপ, যে বর্ত্তমানে বেতনের হার ও নীতি, ধরিতে গেলে কেবল কাজের চাহিদা ও যোগান (demand

and supply) দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতে বেতনের হার কমিতে কমিতে শেষে দাঁড়াইয়াছে এই যে কোনরূপে যাহাতে জীবন ধারণও সন্তানাদি পালন করা যায়, তদনুরূপ মাত্রই বেতনের ব্যবস্থা ঘটিতেছে, তাহার বেশী কড়াক্রান্তিও নয়। লাসেলের এই অভিমতের প্রতিবাদে বলিবার কথা তেমন কিছু নাই। তবে এই টুকু বলা যায় যে বেতনের হার সর্ব্বত্র ঐ নিয়মে কমিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও একেবারে অতটা অল্পতা অবশ্য ঘটে নাই অর্থাৎ কাজের চাহিদা যোগানের হিসাবে যতটা অল্পতা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছায় নাই। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘে প্রদত্ত চাঁদা, অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি আলোচনা করিলে তাহারা যে কেবলমাত্র জীবনধারণ ও সন্তান-পালনের যোগ্য বেতন অপেক্ষা কিছু বেশীই পায়, একথা বলা অবশ্যই অসঙ্গত নয়। আরও বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে কেবলমাত্র কাজের চাহিদা ও যোগানের নিয়মে এবং মালিক ও শ্রমিকদের স্বাধীন চুক্তি দ্বারাই বেতনের হার নিয়ন্ত্রিত হয়, লাসেলের এই কথার মধ্যে কি একটা মস্ত ভুল নাই? শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃ সংখ্যাধিক্য ঘটায় প্রাকৃতিক নিয়মেই যে বেতনের হার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এই কথাই কি ঠিক নয়? ম্যাল্‌থাসের (Malthus) ব্যাখ্যা অনুসারে রিকার্ডোর (Ricardo) বেতন নীতি লোকসংখ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে এ সম্বন্ধে লোক সংখ্যার প্রভাব বর্ত্তমান প্রচলিত স্বাধীন চুক্তির ব্যবস্থায় যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, সরকারই যদি একমাত্র মুলধনী ও মালিক হন, তবে তখনও ঐ প্রভাব এ সম্বন্ধে এইরূপই লক্ষিত হইবে। বর্দ্ধিত বেতনের ব্যবস্থায় এখন যেমন, তখনও তেমনই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত

অধিবাসীদের মধ্যে লোকাধিক্য ঘটিবে। তাহা হইলে বরং বর্তমান ব্যবস্থার সুবিধা এই যে এখন শ্রমিকেরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুভব করে; তখন তাহারা ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপরেই নির্ভর করিবে। রাষ্ট্র যদি তখন গাজুরী রকমে উহার অননুমোদিত বিবাহকে বে আইনী বলিয়া গণ্য করে, অথবা অন্য প্রকারে বিবাহের স্বাধীন প্রচলনে বাধা দেয়, তবেই ঐ অসুবিধার কিছু প্রতিকার হইবার কথা।

(গ) লাসেলের পরে জার্ম্মাণ সোসিয়ালিজম্

লাসেলের মৃত্যুর পর শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতির পদে তেমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃত না হওয়ায় এবং হেজফেল্ডের কাউণ্টেসের গুপ্তমন্ত্রনার সভ্যদের মধ্যে দলাদলি ঘটায়, সঙ্ঘের উন্নতি কিছু ব্যাহত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঐ পদে এলেকজাণ্ডার সুইজরের (Alexander Schweitzer) মনোনয়নে আবার উহার অবস্থা কিছু ফিরিল। ইনি ছিলেন ফ্র্যাঙ্কফোর্টবাসী। ইনি আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের মুখপত্র 'সোসাল ডেমক্রাট' (Social Democrat) কাগজের ইনি সম্পাদক হন। মেরিং (Mehring) তাঁহার জার্ম্মান সামাজিক গণতন্ত্র (German Social Democracy) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে ইনি একজন ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ সৌখীন লোক ছিলেন বটে, তাহা হইলেও ঐরূপ ইন্দ্রিয় সুখে নিজেকে একেবারে নষ্ট না করিয়া ফেলার মত বিচক্ষণতা ও ও চরিত্রের দৃঢ়তা ও তাঁহার ছিল। সঙ্ঘের সহিত তাঁহার পঞ্চবর্ষ-ব্যাপী কার্য্যগত সংযোগকালে সঙ্ঘের বাহিরে ও ভিতরে অনেক শত্রু তাঁহার হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের সভ্যেরা এই সময়ে

অনেকে অনুভব করিতেছিলেন, যে ঐ দেশের সমস্ত সোসিয়ালিষ্টদের এখন ঐক্যবদ্ধ হইবার কাল আসিয়াছে। তাঁহারা অনেকেই সন্দেহ করেন যে, সুইজার প্রুসীয় সরকারের সহিত গুপ্তমন্ত্রনায় আবদ্ধ। রাজনৈতিক মতে অন্যান্য সোসিয়ালিষ্ট নায়কদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন সঙ্ঘের বাহিরে উহার প্রতিকূল একটা দল গঠন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী লিবনেক ও তাঁহার বন্ধুবর্গের দ্বারা সামাজিক গণতান্ত্রিক শ্রমিক সঙ্ঘ (Social Democratic Workingmen's Party) নামক একটি নূতন দল গঠিত হইল। তবে পূর্ব্বতর প্রতিষ্ঠানে সুইজার বহুবৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানাদিকে শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপনা ছিল সুইজারের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ ইহাতে ধর্ম্মঘটের কার্য্য বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শ্রমিকসঙ্ঘের কার্য্য পদ্ধতি ইচ্ছাক্রমেই যেন কিছু অস্পষ্ট রাখা হয়। এই অস্পষ্টতার মধ্যে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর দলের প্রতি এমন ইসারা ইঙ্গিত দিল যাহাতে লাসেলের মতাবলম্বী অনেকে তাহাদের পূর্ব্বমত পরিহার করিয়া ইহার সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ অস্পষ্টতার দরুণ তাহারা তেমন যেন বুঝিতে পারে নাই যে তাহারা প্রকৃতই নিজের পক্ষ ত্যাগ করিতেছে। এই নূতন দলের প্রত্যেক সভ্যকে যে সব নিয়ম প্রণালী পালনে বাধ্য করা হইত, তাহার মধ্যে এই সব কথা ছিল;— সকলেরই অধিকার সমান, কর্ত্তব্য সমান, সর্ব্বপ্রকার ভেদ দূর করিতে হইবে, এবং সর্ব্বপ্রকার উৎপাদনের কাজে প্রচলিত বেতনব্যবস্থার উৎখাত করিয়া শ্রমলব্ধ সমস্ত অর্থ যাহাতে শ্রমিকদেরই প্রাপ্য হয়, তদর্থে ঐ পুরাতন ব্যবস্থার

পরিবর্ত্তে সঙ্ঘচালিত কর্ম্ম-পদ্ধতির স্থাপনাই একান্ত প্রয়োজনীয়। সামাজিক সমস্যা যখন রাজনৈতিক সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা অসম্ভব, তখন পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই এ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল। কারণ এরূপ রাষ্ট্র ভিন্ন ঐ সমাজ সমস্যার পূরণ সম্ভবপর নহে। কার্য্যগত স্বাধীনতা কোন বিশেষ স্থান, জাতি বা সমাজগত হইলেই চলিবে না, পরন্তু সর্ব্বদেশেই ইহার প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। এই ধারনায় এই নূতন শ্রমিকসঙ্ঘ নিজের নিয়মাদি লঙ্ঘন না করিয়া নিজেকে যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘের শাখারূপে বিবেচনা করিবে এবং ঐ বৃহৎ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিতেও কুন্ঠিত হইবে না।

এই দলের আন্দোলনে নিম্ন লিখিত দাবী গুলির প্রতি প্রথমে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে এইরূপ স্থির হয়। (১) রাজনৈতিক মহাসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় সমস্ত প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-মূলক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনে বিংশ বৎসর বয়স্ক সমস্ত লোকেরই সমান অধিকার থাকিবে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের যথেষ্ট বেতনের ব্যবস্থা চাই। (২) ব্যবস্থাপক সভা সমূহে যে সব আইন বিধিবদ্ধ হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে প্রজাবর্গের সংশোধক প্রস্তাব করিবার ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা থাকা চাই। (৩) সমস্ত শ্রেণীগত, জন্মগত ও পদগত বিশেষ দাবী দাওয়ার বিলোপ সাধন। (৪) স্থায়ী বেতনভুক সৈন্যের পরিবর্ত্তে নাগরিক সেনা-প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন। (৫) রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মমণ্ডলীর এবং ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে বিদ্যায়তনের বিভাগ করণ। (৬) সমস্ত সাধারণ বিদ্যালয়ে বাধ্যতা মুলক শিক্ষার প্রচলন এবং উচ্চতর প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা। (৭) বিচারালয় সমূহের স্বাধীনতা, জুরিপদ্ধতির প্রবর্ত্তন, সুদক্ষ অধিবাসীদের

লইয়া আদালত গঠন, সাধারণতঃ মৌখিকভাবে বিচার কার্য্য সম্পাদন এবং বিচারের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ না করা। (৮) মুদ্রাযন্ত্র, সভা সমিতি সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার নিষেধক আইনের বিলোপ; স্ত্রীলোক-দিগের কার্য্য-পরিমাণের সীমা নির্দ্ধারণ, বালকদের কার্য্যে না লাগান। (৯) সমস্ত গৌণ করের বিলোপ এবং কেবল একমাত্র আয়কর ও উত্তরাধিকার-করের প্রবর্ত্তন। (১০) শ্রমিকদের সমবায়সমূহে সরকারের সাহায্য প্রদান এবং গণতান্ত্রিক দায়িত্বে পরিচালিত উৎপাদন-সমবায় সমূহে সরকারের অগ্রিম ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা।

শেষ দাবিগুলির মধ্যে অনেকই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নবম দাবিতে করভার ধনীদের উপর চাপান হইয়াছে। এই দাবি অনুসারে উত্তরাধিকারের উপর কর এমন পরিমাণে বাড়ান যাইতে পারে যে ঐ অধিকার অনেকাংশে ক্রমে রাষ্ট্রেরই হস্তগত হইবে। অবশেষে উভয় দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা একটা ঐক্যমূলক পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয় এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গোথায় (Gotha) সাধারণ সভার অধিবেশনে উভয় পক্ষীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা উহা গৃহীত হয়।

এই পদ্ধতির আরম্ভেই আছে, "শ্রমই সকল ধন ও সভ্যতার মূল। সমাজবন্ধনের মধ্যেই শ্রম এইরূপ সার্থকতা লাভ করিতে পারে। অতএব শ্রমলব্ধ সমস্ত ফল সমাজের অর্থাৎ সমাজের অন্তর্গত সকল লোকেরই প্রাপ্য। সকলেই পরিশ্রম করিতে সমান ভাবে বাধ্য এবং এই শ্রমের ফল প্রত্যেকেরই যথাযথ অভাব অনুসারে লভ্য। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমশিল্পের সমস্ত যন্ত্র ও উপকরণে মূলধনীদের একচেটিয়া অধিকার। এই ব্যবস্থাসম্ভূত পরমুখাপেক্ষিতাই শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও দাসত্বের একমাত্র কারণ।"

"এই ব্যবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত করিতে হইলে শ্রমশিল্পের সমস্ত উপকরণ কোন বিশেষ শ্রেণীর অধিকার ভুক্ত না রাখিয়া উহাকে সমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিণত করা চাই। এতদর্থে সমস্ত উৎপাদনের কার্য্য সমবেতশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং ঐ কার্য্যসম্ভূত সমগ্র ফল যথাযথরূপে সকলের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। এইরূপ মুক্তির কাজ সমাজের অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা শ্রমিকদেরই বিশেষ ভাবে সম্পাদ্য।"

এইরূপ নীতির প্রেরণায় জার্ম্মাণীর সোসিয়ালিষ্ট শ্রমিকসম্প্রদায় বিধিসঙ্গত প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা লাভে উন্মুখ। এতদর্থে উহারা বর্ত্তমান বেতনপদ্ধতির উচ্ছেদকামী। এই পদ্ধতির উচ্ছেদ ঘটিলে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রাপ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তখন সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বৈষম্য বিলুপ্ত হইবে।

জার্ম্মাণীর সোসিয়ালিষ্ট শ্রমিক সম্প্রদায়ের কার্য্য স্বীয় জাতীয় ভাবে পরিচালিত হইলেও, উহাদের আন্দোলনে যাহাতে আন্তর্জাতিক ভাব থাকে সে বিষয়েও উহারা খুবই সজাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাফেল ও সোসিয়ালিজমের মর্ম্মকথা—

Schaflle's Quintessence of Socialism.

জার্ম্মান অধ্যাপক সাফেলের কথা পূর্ব্বে একটু উল্লেখ করা গিয়াছে। এখন ইহার মত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। অধ্যাপক সাফেলের গ্রন্থখানি (Quintessence of Socialism) অতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও তিনি আধুনিক বিশেষতঃ জার্ম্মাণ সোসিয়ালিজমের মত-সমূহ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ ও ফলাফলের বিষয় অল্পের মধ্যে বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন। গ্রন্থকার দক্ষিণ জার্ম্মানীর একজন বিশিষ্ট অর্থ-নীতিবেত্তা। তাঁহার লেখা পড়িয়া অনেকেরই মনে হইবে যে, যে আন্দোলনের তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি বিমুখ নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার লেখায় উত্তেজনার অধৈর্য্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে কেবল সাধারণ জনসমাজেরই নয়, পরন্তু অর্থশালী শিক্ষিত শ্রেণীরও স্বার্থ বিজড়িত। আধুনিক শ্রমশিল্পগত আন্দোলনের সংগ্রামের মধ্যে কোন ধনীবংশই বোধ হয় একান্ত ভাবে নিশ্চিত নহেন যে, তাঁহাদের অবস্থা দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই সাধারণ লোকের সমান হইবে না। চতুর্দ্দিকের ব্যাপার যেরূপ, তাহাতে তাঁহাদের সম্পত্তিগত ও পরিবারগত জীবনে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবার খুবই আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছে।

ইহার পর সাফেল সোসিয়ালিজম বলিতে যথার্থ কি বুঝায়, এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকৃত সোসিয়ালিজমের অর্থ উৎপাদন ব্যাপারে ব্যক্তিগত মূলধনের পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত মূলধনের স্থাপনা। এইরূপ সমষ্টিগত মূলধনের প্রতিষ্ঠায় সমস্ত উৎপাদন ও বণ্টনের কার্য্য সরকারী তত্বাবধানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইলে, জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত পার্থক্যের ভাব একেবারেই তিরোহিত হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাঁহাদের উপর ঐ উৎপাদন ও বণ্টনের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারাই প্রত্যেক উৎপাদ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করিবেন। কারণ এইরূপ পরিমাণের একটা মোটামুটি আভাস জানা না থাকিলে, বণ্টনের কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা ছাড়া কোনও জিনিশের সাময়িক অভাব ও চাহিদা পুরনার্থ সাধারণ ভাণ্ডারে সেই জিনিশ কিছু মজুদ রাখাও চাই।

ঐ পদ্ধতিক্রমে কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ যে জানা দরকার, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ও বিভক্ত মূলধনে চালিত বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি অপেক্ষা এই নূতন কার্য্যপদ্ধতিতে যে ঐ সামাজিক অভাব পুরণের কাজ অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, এক কথাতেই ইহা বলা যায় না।

নূতন ব্যবস্থায় দেশের উৎপাদনের কার্য্যে, ধরিতে গেলে দেশের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে, রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা। কারণ দেশের সমস্ত শিল্প ও কৃষির তত্ত্বাবধানের ভার এবং লোক সমাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহের কাজ একমাত্র রাষ্ট্রের উপরই অর্পিত। প্রচলিত বিভক্ত ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হইতে ইহা যতদূর সম্ভব পৃথক্। সাফেল বলেন—"যিনি এই বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান

ও আলোচনা না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহাকে সম্যক্‌রূপ অনুধাবন করা বড়ই দুরূহ। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া ইহাকে সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি। সাধারণের কাছে এতটা দুর্ব্বোধ্য হইলেও, ইহার স্বপক্ষে এমন একটা প্রবল দল গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার জলন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ অদমনীয়, যাহা সংহত গঠনে ও আন্তর্জ্জাতিক প্রসারে অপরাপর বহু দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার অনুগামীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং যাহা ভবিষ্যতে নিজের বিজয় সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র হীন। তবে জার্ম্মান সোসিয়ালিষ্টরা সকলেই বুঝেন যে, যে সমষ্টিগত পদ্ধতির উপর তাঁহারা সমাজকে খাঁড়া করিতে চাহেন, বর্ত্তমান আন্দোলনে তাহার সূচনা মাত্র দেখা দিয়াছে। ক্রমে প্রচলিত ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্বাধিকারীদের বিলোপে যতদিন না সমগ্র লোক সমাজ কতিপয় ধনকুবের ও অসংখ্য নগণ্য জনসমষ্টি এই দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, ততদিন জনসাধারণ বিশেষত: কৃষিজীবী গ্রামবাসীরা এই নূতন সমষ্টিগত পদ্ধতির সমর্থনে উদগ্রীব হইবে না। কোন আন্দোলনের এরূপ অপরিণত প্রথমাবস্থায় যদি উহার সংঘটন সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বর্ণিত না হয়, তবে সেটা কিছু অদ্ভুত বা অসঙ্গত নয়। সমস্ত বিপ্লবকামী দলের নেতারা আন্দোলনের প্রথম যুগে তাঁহাদের ভাবী কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ একটু প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

এরূপ সতর্কতা যে অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যক তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ ভাবী কার্য্যপ্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনার ভিতর এমন সব কথা থাকিতে পারে, যাহাতে সেই প্রণালীর প্রতি লোকের অবজ্ঞা ও সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু অপর পক্ষে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যে প্রণালী বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থাকে এমন আমূলভাবে ওলট-পালট

করিতে উন্মুখ, তাহা সমাজের যথার্থ মঙ্গল না ধ্বংসের কারণ, তাহা শুধু কথায় নয় কাজেও সম্ভবপর কিনা এবং তাহাতে প্রচলিত ব্যবস্থার কুফল অপেক্ষা বেশী কুফল ফলিবে কিনা।

যদিও সোসিয়ালিষ্টরা এই নবতর পদ্ধতির কতকগুলি স্থূল নীতি ছাড়া উহার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বড় কিছু এখন বলিতে পরাঙ্মুখ, তথাপি তাঁহারা উহার সম্বন্ধে এই দাবিও করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময় তাঁহাদের আন্দোলনের অনুকূলেই কার্য্য করিতেছে। নির্ভাজ ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারিত্বের দিন অর্থাৎ যে সময়ে একজন কর্ম্মী তাহার কর্ম্মগত যন্ত্র ও উপকরণাদির একাই অধিকারী ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প উঠিয়া গিয়া তাঁহার স্থলে বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে শ্রমিকেরা বহুসংখ্যার বৃহৎ কর্ম্মশালায় মিলিত হওয়ায় অতি শক্তিশালী দলে গঠিত ও কেন্দ্রীভূত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় সৈনিক বিভাগও ভবিষ্যতে সোসিয়ালিজমের পক্ষে বিপদের কারণ নয়। কেননা, সোসিয়ালিষ্টরা মনে করেন, এক পক্ষে এখানে উহারই অনুকুল সৈন্যদল গঠিত হইতেছে, অপর পক্ষে সৈনিক বিভাগের অত্যধিক ব্যয় বাহুল্যে সমগ্রজাতি তাহার শাসন কর্ত্তাদের উপর বিমুখ হইয়া উঠিতেছে। যাহাতে জনসাধারণকে একটা পৃথক সমষ্টিরূপে পরিণত করে, যাহাতে ব্যক্তিগত শক্তিসমূহের সমবায়ে একটা মহতী সমষ্টিশক্তি গঠিত করে, এক হিসাবে তাঁহারই সহিত সোসিয়ালিজমের কিছু না কিছু সাদৃশ্য বর্ত্তমান। এই ভাবে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণ ও সামরিক শক্তি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নিরাপদ আশ্রয় নয়, কারণ সোসিয়ালিজম ভবিষ্যতে বাধ্য হইয়া ঐ শক্তি নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বর্ত্তমান রাষ্ট্র অপেক্ষা আরও বিশেষ ভাবে নিজের কাজে লাগাইতে

পারে। ব্যক্তিগত মূলধনকে সমষ্টিগত মূলধনে পরিণত করাই সোসিয়ালিজমের মূলমন্ত্র। কতদিনে এই মতপরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, সে সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্ট নেতাদের ধারণা তেমন আশান্বিত না হোক, কিন্তু তদর্থে যে সব উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ নাই। উৎপাদনশীল সমবায়ের বিস্তৃতি সোসিয়ালিষ্ট মতের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও, ঐ সব উপায়ের অন্যতম বলিয়াই গণ্য। কেন না, উহা শ্রমিকদিগের একত্রীকরণের সহায়ক। আন্দোলনের অপরাপর উপায়, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে মার্ক্স যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রধানতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। সাফেল দেখাইয়াছেন, যখন ঐ আন্দোলন মূলধনের বিরুদ্ধে চৌর্য্যের অপরাধ পর্য্যন্ত আরোপ করিয়াছে, তখন উহা ব্যক্তিগত ভাবে মূলধনীদের বিরুদ্ধে আরোপ করে নাই, প্রত্যুতঃ প্রচলিত পদ্ধতিরই উপর উহা আরোপিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত মূলধন কালে যে সমষ্টিগত মূলধনে পরিণত হইবে, ইহাতে সোসিয়ালিষ্টদের কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পথে যে অসামান্য বাধাবিপত্তি রহিয়াছে, সে বিষয়েও তাহারা বিশেষ চিন্তিত নহেন। কারণ তাহারা অদূর ভবিষ্য লোক সমাজে একদিকে অসংখ্য বঞ্চিত জন সমষ্টি ও অপরদিকে কতিপয় ধনশালী মূলধনীর অস্তিত্বই কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এইরূপ ভাবিবার হেতু এই যে পরিণামে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর বিলোপ ঘটিবেই ঘটিবে এবং ক্রমে অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের দ্বারা কতিপয় ধনশালীর ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালান অসম্ভব হইয়া পড়িবেই।

ইহার পরের প্রশ্ন এই যে, যখন মূলধনীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটিবে, তখন তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু

প্রদত্ত হইবে কি না। এ সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টরা এইরূপভাবে কথা বলেন—"প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন মূলধনী যাহা অর্জ্জন করিবেন, তাহার উপর তাঁহার দাবী থাকা অসঙ্গত নয়। পূর্ব্বে ফিউডাল পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সময় যেমন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু দিতে হইয়াছে, তেমন এখন মূলধনীকেও তাহার ব্যক্তিগত মূলধনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু দেওয়া বিধেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীরা যদি সহজেই তাহাদের সম্পত্তিগত দাবি পরিহার করিতে সম্মত হন, তবে তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু দিতে সোসিয়ালিজম পরান্মুখ নয়। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ সোসিয়ালিষ্ট নীতির অনুগতভাবেই প্রদত্ত হইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বসম্পত্তির সুদ স্বরূপ কিছু পাইবেন না। এমন কি তাঁহাদের সম্পত্তির পুরা মূল্যও যদি দেওয়া হয়, তবু তাহা মূলধনরূপে নয়, তাঁহাদের ভোগ্যবস্তু রূপেই প্রদত্ত হইবে। রথচাইল্ডের মত বিপুল ধনশালীদের সম্বন্ধে ঐরূপ পুরামূল্যের ক্ষতিপূরণও অত্যধিক। কিন্তু এরূপ প্রাচুর্য্যও মূলধনগত কোনও আয় না থাকিলে কিছু সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ধন যতই বিপুল হোক না কেন, তাহা তখন ত আর মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং কিছু দিনের মধ্যে ভোগার্থ সম্পত্তিরূপেও তাহা নিঃশেষিত হইবে। এ বিষয়ে ব্যাপার যে কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, উল্‌সে সাহেব তাহার এইরূপ আভাস দিতেছেন। প্রথমতঃ, উচ্চতর শ্রেণী যদি তাহাদের দাবি ত্যাগ করিতে অসম্মত হন, এবং এতদর্থে সংগ্রাম করিয়া যদি পরাভূত হন, তবে তাঁহাদের সম্পত্তি শেষে সরকারেই বাজেয়াপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আপোষমীমাংসার ভাবে যদি উচ্চতর শ্রেণীকে তাঁহাদের সম্পত্তির যোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া

নির্দ্ধারিত হয়, তবে কথায় হইলেও কাজে তাহা বড় ঘটিয়া উঠিবে না।

ধরা যাক, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র যেন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের সমস্ত উৎপাদন, স্থানীয় আমদানী রপ্তানী ও অভাবপূরণের কাজ একমাত্র সরকারের হাতেই ন্যস্ত। এমন ধারা ব্যবস্থায় দ্রব্যাদির সরবরাহ যে ব্যক্তিগত রুচি ও ইচ্ছায় নিয়মিত হইতে পারে না, ইহা সহজেই বোধগম্য। সরকার নিজেই উৎপাদয়িতা ও নিজেই বিক্রেতা ; তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সরকার নিজের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ভাণ্ডারে যাহা মজুত রাখিবে, তাহাই নিজ নিজ কার্য্যের টিকিটের বদলে প্রত্যেককে গ্রহণ করিতে হইবে। ভাল, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রাধীন শ্রমিক ও কর্ম্মচারীবর্গ মানুষ ত বটে। তাহারা কি আজীবন নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি পরিহার করিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রিত অশন বসনেই সন্তুষ্ট থাকিবে? ইহাতে কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হইবে না? সাফেল এই আপত্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"এসম্বন্ধে সোসিয়ালিজম লোককে আকর্ষণ করা দূরে থাক, লোকের কাছে অপ্রীতিকরই হইয়া দাঁড়াইবে। সোসিয়ালিষ্ট মতানুসারী অনেকে জনসাধারণের সম্মুখে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে লভ্য সর্ব্বসাধারণের প্রচুর ভোগ ও বিবিধ কলাবিদ্যার বিপুল আনন্দ চিত্রিত করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সুখসুবিধা ও স্বাধীনতার কথা একেবারেই ভাবেন নাই।"

যাহাই হৌক, গ্রন্থকার কিন্তু সমষ্টিগত পদ্ধতিতেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির হিসাব রাখিয়া প্রচলিত বাজারের কাটতি ও আমদানী ব্যবস্থার মতই ঐ সব দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা

সম্ভব, ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ধারণায় সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অভাবাদির কেন যথাযোগ্য পূরণ ঘটিতে পারে না, তাহার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন—"সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে যদি এরূপ ব্যক্তিগত অভাব পূরণের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সোসিয়ালিজম সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সভ্যতা এবং সর্ব্বপ্রকার আর্থিক ও জ্ঞানচর্চ্চাগত সুখ সুবিধার মহাশত্রু বলিয়াই গণ্য হইবে। নিজের রুচি অনুসারে নিজের অর্জ্জিত অর্থব্যয়ের ক্ষমতা স্বাধীনতার একটি প্রধান কার্য্যগত লক্ষণ। সোসিয়ালিষ্ট সমাজ-সংস্কারের সমস্ত সুখসুবিধার বিনিময়েও এই স্বাধীনতা পরিহার্য্য নয়। এই বিষয়েই সোসিয়ালিজমের সহিত প্রথম বুঝাপড়া চাই। উল্‌সে সাহেব এই স্পষ্টবাদিতার জন্য সাফেলকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন, যে এসম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টদের কার্য্যপদ্ধতি, যাহারা যথার্থ স্বাধীন জীবন স্থাপন করিতে চায়, তাহাদের জন্য নয়, যাহাদের পক্ষ হইয়া তাহারা এই আন্দোলন তুলিয়াছেন, যেন বিশেষভাবে তাহাদের জন্যই। যাহাদের সামাজিক অবস্থা অধিকতর সচ্ছল এবং যাহারা নিজেদের স্বাধীন রুচি ও ইচ্ছায় অভ্যস্থ, তাহাদের কথা যেন ধরাই হয় নাই।

যদি দেশের উৎপাদন ও অভাবপূরণের কাজ সোসিয়ালিষ্ট সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সে দেশের মাল চলাচল, লোক যাতায়াত ও সংবাদ প্রেরণাদির কাজও ঐ সরকারের পক্ষে চালান যে খুবই সহজ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ প্রচলিত ব্যবস্থাতেও ডাক টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের কাজ সরকারের হাতেই অনেক ন্যস্ত আছে। উহার জন্য তখন বিশেষরূপ নূতন কিছুই করিতে হইবে না। ধরিতে গেলে, উৎপাদনের পরিচালনাই

সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কার্য্য। এসম্বন্ধে সাফেলের মত এই যে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রকে একসঙ্গে এই বিভাগের সকল কার্য্যই যে হাতে লইতে হইবে, এমন কি কথা আছে। একটি পর একটি করিয়া ক্রমশঃ এই সব কাজ ব্যক্তিগত হইতে সমষ্টিপদ্ধতির অধীন করা যাইতে পারে। এমন কি সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে উৎপাদনের প্রত্যেকটি কাজ যে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে কড়াকড়ি রকমে পরিচালিত হওয়া চাইই, তাহাও নয়। কেহ যদি বিক্রয়ের জন্য না করিয়া নিজের ভোগের জন্য কিছু উৎপন্ন করে, তবে তাহা ব্যক্তিগত কাজ হইলেও, তাহাকে সমষ্টিগত পদ্ধতির মধ্যে না আনায় ক্ষতি কি? ভিষক্ ও কলাবিদের কার্য্যেও ঐভাবে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া বিধেয়। এসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে, তবে প্রতিযোগিতা সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির বিশেষ আতঙ্কের বস্তুরূপে গণ্য হইলেও, তাহা ক্ষেত্র বিশেষে সোসিয়ালিজমের পক্ষে সহ্য করার দোষ কি? এসব স্থলে শ্রমিক নিজের কার্য্যের জন্য যে সব টিকিট পাইবে, তাহা ভিষক্ প্রভৃতির সাহায্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে প্রদান করিতে পারে। কিন্তু যে সব ব্যক্তিগত কার্য্যের সহিত মূলধন সংশ্লিষ্ট, তাহা রাষ্ট্র, সমাজ বা সাধারণ শিক্ষা ইহাদের যে কোন সম্বন্ধে হৌক না কেন, তাহা অবশ্য সমষ্টিগত পদ্ধতিক্রমেই পরিচালিত হইবে।

উৎপাদনের কার্য্য সম্বন্ধে প্রধান কথা হইতেছে খরচ। সোসিয়ালিষ্টদের মত এই যে তাঁহাদের পদ্ধতিতে যখন একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত, তখন প্রচলিত ব্যবস্থা অপেক্ষা উহাতে উৎপাদনের খরচ কমিবারই কথা, এবং ব্যয়ের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই প্রত্যেকের লভ্যও বেশী দাঁড়াইবে। সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে প্রকৃত পক্ষে এই সুবিধা ঘটিবে

কিনা, সে বিষয়ে সাফেল কিছু যেন সন্দেহই প্রকাশ করিয়াছেন। তবে বিশেষ ভাবে এ সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ তিনি করেন নাই। উল্‌সে সাহেব বলিতেছেন, এই প্রশ্নটার মধ্যে একটা অজ্ঞাত তথ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু উৎকর্ষ, একদিকে কার্য্য-পদ্ধতির নবতর প্রভাব ও অপর দিকে যে সব সাধারণ কারণে শ্রমিকদের চরিত্রোন্নতির সম্ভাবনা এই উভয়ের সমন্বয়ে সাধিত হইবার কথা। নবতর পদ্ধতি কি শ্রমিকদিগকে অধিকতর শক্তিশালী, আত্মনিভরশালী ও ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন করিবে, না উহাদের বিপরীত করিয়া তুলিবে? আবার কোন নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইহাও বিবেচ্য, যে প্রচলিত মূলধন ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় কি এমন কোনও উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর নয় যাহাতে শ্রমিকদিগের সর্ব্ববিধ অবস্থার উৎকর্ষ জন্মায়?

যাইহোক, এ সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা অবশ্য আরও ব্যাপক। সাফেল বলিয়াছেন, যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া প্রচলিত প্রতিযোগিতা-মূলক পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ সকল কার্য্যের যেরূপ প্রণোদক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতি সেরূপ প্রণোদনা উদ্রিক্ত করিতে পারিবে কি? সাফেলের মতে এই প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু প্রশ্ন। ইহার উত্তর অবশ্য এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু পরিণামে ইহারই উপর সমগ্র সমস্যা নির্ভর করিবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণ সমূহ আলোচনা করিলে, ঐ প্রশ্নের সমাধানের উপরেই যে সোসিয়ালিজমের জয় পরাজয় বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিক যেমন তাহার কার্য্যে নিজ স্বার্থের দ্বারা প্রবলভাবে প্রণোদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেকের পক্ষে

ব্যক্তিগত প্রবল প্রণোদনের ভাব সোসিয়ালিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে থাকা চাই। সোসিয়ালিষ্ট প্রণালী এইরূপ ব্যক্তিগত প্রণোদনা জাগাইয়া রাখিতে পারিবে কিনা, এ সম্বন্ধে কেহই এখন নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারেন না। এই প্রশ্ন এখনও বিচারবিতর্ক-সাপেক্ষ। স্যাকেল মনে করেন, সোসিয়ালিষ্ট কার্য্য-প্রণালীর যতটা আভাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এ সব বিষয় কিছু স্পষ্টতা লাভ করে নাই। এ সম্বন্ধে উল্সের প্রশ্ন এই যে, সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে যখন সর্ব্বপ্রকার শ্রমের সমান মুল্য, তখন সে ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যক্তিগত প্রণোদনার সম্ভাবনা কি ?

সোসিয়ালিজম্ যতদিন না এই সব সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান করিতে পারিবে, ততদিন তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে বলিয়া প্রতীতি হয়। সোসিয়ালিজম প্রচলিত ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনকামী। প্রচলিত ব্যবস্থা দোষযুক্ত হইলেও, ইহার এমন কতকগুলি নিরাপদ ভাব আছে, যাহা সামাজিক আর্থিক মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজন। সোসিয়ালিজম যদি এ সব নিরাপদভাবের কথা বিন্দুমাত্র না ধরিয়া গায়ের জোরে নিজের মত চালাইতে চায়, তবে তাহার সাফল্য কখনই স্থায়ী হইবে না।

সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত শ্রমশিল্প ও মূলধন সম্পর্কীয় কতকগুলি সম্ভাব্য ফলাফলের বিষয় এবার একটু আলোচনা করা যাইবে।

সোসিয়ালিজমের নীতি কেবল যে সাক্ষাৎ ভাবে উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী তাহাই নয়, পরন্তু যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পরোক্ষভাবেও কোনরূপ আয় জন্মায় উহাও তাহার অনুমোদনীয় হইতে পারে না। এই ভাবে ইহা সুদে টাকা

খাটান, খাজনায় জমি বিলি করা, কোনও কিছু ভাড়া দেওয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগত লাভজনক কাজ মাত্রেরই শত্রু। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে সরকারই অবশ্য দেশের সমস্ত জমিজমার একমাত্র মালিক হইয়া দাঁড়াইবে। সরকার যদি নিজে জমিজমার বিলির কাজ না চালায়, তবে যে সব জমিজমা বহুদিনের পত্তনীতে বিলি আছে, তাহা নূতন পদ্ধতিতে নাকচ হইয়া যাইবে। বাসভবন বল, কর্ম্মশালা বল, কোন কিছুই তখন আর বিক্রয় বা ভাড়া দেওয়া চলিবেনা, কারণ ও সকল একমাত্র সরকারেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে। জমিকর উঠিয়া যাইবে। বর্ত্তমান বাড়ী ও জমির অধিকারীদের নিকট হইতে উহা হয় তাহাদিগকে কিছু মূল্য স্বরূপ দিয়া, নয় বিনামূল্যেই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। এখনকার উৎপাদকদের মত সরকারকেও তখন উৎপাদনের কাজে শ্রমিকদিগকেও অগ্রিম মজুরী দিতে হইবে। কাজেই এরূপ চলতি মজুরী দিবার জন্য সরকারের হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকা প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থায় সরকারকে যদি ঋণ লইতে হয়, তবে তাহা উহাকে অবশ্য বিদেশ হইতে লইতে হইবে। তখন সরকারের এরূপ অভাব ঘটিবারই সম্ভাবনা। কারণ উহাকে তখন শুধু রাষ্ট্র পরিচালনাই নয়, পরন্তু বহু প্রকার ব্যয়সাধ্য উৎপাদনাদির কাজের ভারও গ্রহণ করিতে হইবে।

সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে যখন ব্যক্তিগত ব্যবসায়বাণিজ্যে নিয়োজিত মূলধন থাকা অসম্ভব, তখন সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র ধরণের ছাড়া সবই উঠিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে মুদ্রার চলনও বন্দ হইবে। সরকারের দায়িত্বমূলক নোটের চলনও তখন থাকিবেনা। নোটের পরিবর্ত্তে যে পরিমান কার্য্য শ্রমিকদের দ্বারা সাধিত হইবে, সেই সম্পাদিত কার্য্যের অনুযায়ী সার্টিফিকেট মাত্র তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে।

বর্ত্তমান সমাজে সমস্ত বিনিময়ের কাজ ব্যক্তিগত ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। এখন প্রত্যেকের কাজে তাহার নিজের স্বার্থ বিজড়িত, নিজনিজ কার্য্যে যথেষ্ট লাভ করাই প্রত্যেকের উদ্দেশ্য। এই সব কাজের সফলতা এখন ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও উদ্যমের উপরেই নির্ভর করে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে একের সহিত অপরের প্রতিযোগিতা থাকায় দর চড়ার আশঙ্কা তত থাকে না। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থায় সাধিত হইবে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যপারে সকল কাজের মধ্যে প্রতিযোগিতাই সোসিয়ালিজমের বিশেষ ঘৃণার্হ। সমিষ্টিপদ্ধতিতে কোনরূপ প্রতিযোগিতামুলক কেনা ও বেচার কথাই থাকিবে না। দেশের সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য প্রথমে সাধারণ সরকারী ভাণ্ডারে গিয়া জমা হইবে। তৎপরে স্থানীয় অভাব অনুসারে উহা বিলি করা হইবে। এরূপ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের পরস্পর প্রতিযোগিতার যেমন অবসর নাই, তেমনই সরকারের সহিতও প্রতিযোগিতা করিবার কেহ নাই। এরূপ ব্যবস্থায় ক্রয় বিক্রয়, লাভালাভ, বাজারদর, বিনিময়—এ সকলের কাজ দূরে থাক, কথা মাত্রও অনাবশ্যক হইবে।

অর্থনৈতিক হিসাবে বর্ত্তমান পদ্ধতির সহিত সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির পার্থক্য নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই তিনটি প্রধান সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য। প্রথম, সামাজিক আবশ্যক দ্রব্যাদির পরিমাণ নির্ণয়, দ্বিতীয় সামাজিক অভাব অনুযায়ী দ্রব্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার যথাযোগ্য ও যথাপরিমিত উৎপাদন, তৃতীয় উৎপাদন ও কাটতির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া দ্রব্যের বিনিময়গত

মূল্য নিরূপণ। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে ঐ সব কাজ অন্যতর পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে। তখন সাধারণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নয়, কারণ সাধারণ ব্যবসায়ী বলিয়াই কেহ থাকিবে না, সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারাই এসব কার্য্য সাধিত হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীরাই প্রয়োজনীয় বস্তুর পরিমাণ নিদ্ধারণ করিবেন, দেশের বিভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেশের বিভিন্ন কার্য্য সকল বিভাগ করিয়া দিবেন এবং যে কার্য্যে যতটা সময় লাগিবে, তদনুসারে সেই কার্য্যে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ণয় করিবেন।

এই পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা দিবে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে একটা সুলক্ষণ দৃষ্ট হইবে। তখন ব্যবসায়ীদের প্রলোভনের প্ররোচনায় সংবাদ পত্রের বিকৃতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। ব্যয়বহুল জমকাল বিজ্ঞাপনের যেমন বিরতি ঘটিবে, তেমনই এখনকার মত ছোট বড় দোকান-সজ্জার বিপুল ব্যয়েরও কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

ব্যক্তিগত মূলধন ও তাহার কার্য্যের তিরোধানের সঙ্গে মুদ্রারও প্রচলন রহিত হইবে। এক পরিবারস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে উহার যেমন এখন প্রয়োজন হয়না, তেমনই সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের প্রজা-বর্গের মধ্যেও উহার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। বিদেশের সহিত বাণিজ্যে মুদ্রার প্রয়োজন ঘটিতে পারে, কিন্তু স্বদেশের অন্তর্গত কার্য্য সম্বন্ধে উহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইবে। স্বর্ণ বা রৌপ্যের বড় একটা সমাদর থাকিবে না। বিনিময়ের কাজ সোসিয়ালিষ্ট সার্টিফিকেট বা টিকিটের দ্বারা সাধিত হইবে। তখন টাকা ফেলিয়া জিনিশ কিনিতে হইবে না, কৃত কার্য্যের টিকিট

দেখাইলেই সরকারী ভাণ্ডার হইতে যথাসম্ভব দরকারী জিনিশপত্র মিলিবে।

এই সোসিয়ালিষ্ট সময়-মুদ্রা (time-money) কেবল ব্যক্তি-গত অভাব পূরণের কাজেই নয়, অপরাপর সাধারণ কার্য্যেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। অন্যান্য রাষ্ট্রের মত সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রেরও নিজস্ব এমন কোন সম্পত্তি থাকিবে না, যাহা দ্বারা তাহার পরিচালনার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। প্রজাবর্গের নিকট হইতেই উহার পরিচালনার অর্থ সংগৃহীত হইবে। রাষ্ট্রপরিচালিত উৎপাদন কার্য্যের যে মূল্য দাঁড়াইবে, উহার এক তৃতীয়াংশের অনুরূপ যদি রাষ্ট্রপরিচালনার নিমিত্ত ব্যয়িত হয়, তবে ঐ অর্থ বাদ দিয়াই শ্রমিকদের টিকিটের মূল্য ধরিতে হইবে! ঐ এক তৃতীয়াংশ শ্রমের মূল্য অবশ্য মুদ্রার আকারে নয়, দ্রব্যের আকারেই সাধারণ ভাণ্ডারে মজুত থাকিবে।

এই কথার পর সাফেল সোসিয়ালিষ্ট অর্থনীতির দুইটি শক্ত সমস্যার কথা তুলিয়াছেন। উহার মধ্যে পূর্ব্বেই একটির কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে, দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণের বিষয়। এই মূল্য নিরূপণে সোসিয়ালিষ্টরা কেবল দ্রব্য উৎপাদনের খরচের বিষয় ধরিয়াছেন, কিন্তু উহার চাহিদা বা কাটতির (demand) বিষয় কিছুই ধরেন নাই। অপর সমস্যাটি সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের হিসাব-রক্ষার দুরূহতা। এত বিবিধ ও বিপুল কার্য্যধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া একই সময়মূলক মূল্যের মানদণ্ড সঙ্গত ভাবে বজায় রাখা বড় সোজা কথা নয়। সাফেল নিজে এই সব প্রশ্নের বিশেষ কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ অবশ্য একটা অচিন্তনীয় রকমের

ব্যাপার নয়। যখন একই ব্যবস্থায় সকল উৎপাদনের কার্য্য পরিচালিত হইবে, তখন কোথায় ও কখন বিশেষ একটা দ্রব্যের কাটতি বাড়িবে বা কমিবে, ইহাও নির্দ্ধারণ করা তেমন শক্ত নয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় জিনিশের মূল্যের চড়াপড়াতেই উহা বুঝা যায়। যাহার কাটতি কমিয়া যায়, তাহার উৎপাদনও কমান হয় এবং তখন সেই উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত কতকলোক অন্যত্র অন্য কাজের সন্ধান দেখে। প্রচলিত মূলধন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূলক ব্যবস্থাতে শ্রমশিল্পের এই যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহা সমষ্টিগত ব্যবস্থাতেও ঘুচিবেনা। বর্ত্তমানে সোসিয়ালিষ্টরা কাটতির বিষয় কিছুমাত্র না ধরিয়া কেবল খরচের হিসাবেই যে জিনিশের মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা ঠিক হয় নাই। এই ভুল কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে শোধরাইতে হইবে। কি শ্রমের, কি দ্রব্যের বিনিময়গত মূল্য নিরূপণে তাঁহাদিগকে কাটতির হিসাব পরে ধরিতেই হইবে। যখন কাটতি অনুসারে জিনিশের ব্যবহারিক মূল্য বাড়িবে বা কমিবে, তখন সেই সঙ্গে উহার বিনিময়গত মূল্যও বাড়িবে বা কমিবে। সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিতে যদি এই ব্যবহারিক মূল্য না ধরা হয় অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতিতে দ্রব্যের বিনিময়গত মূল্য নিরূপণে যে সব বিষয় গণনা করা হয়, সে সব বিষয় না ধরা হয়, নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট হিসাবে জিনিশের আমদানী ও কাটতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দ্রব্যের বিনিময়গত মূল্য নিরূপণের সহিত তিনটি বিষয় বিশেষভাবে বিজড়িত। প্রথম, উৎপাদন ও অভাব পুরণের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন, দ্বিতীয় প্রত্যেককে তাহার পেশা সম্বন্ধে কার্য্যগত ও দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধে রুচিগত স্বাধীনতা প্রদান। তৃতীয় অর্থনৈতিক নিয়মানুসারে প্রত্যেকের কার্য্যক্ষমতা ও নৈপুণ্যের যথাযোগ্য প্রণোদনার ব্যবস্থা।

উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, নিজের অবিসংবাদিত বিশেষ সুবিধাগুলির সহিত সোসিয়ালিজম যদি প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে কার্য্যগত মানুষের স্বাধীনতার যে সব সুবিধা রহিয়াছে তাহার যোগ ঘটাইতে না পারে, তবে তাহার ভাবী সাফল্যের আশা বড় কম; বাস্তব-জগতে কোন দিন তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়না। তাহা হইলে ইহা চিরদিনই ইউটোপিয়া বা আকাশকুসুম হইয়াই থাকিবে।

সাফেলের শেষ প্রশ্ন—সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত আয় কিরূপ আকার ধারণ করিবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির গঠনে ও ব্যবহারেই বা ঐ আয়ের কিরূপ সম্পর্ক থাকা সম্ভব। বলা বাহুল্য, মূলধনীদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বার্ষিক বৃত্তি যদি কিছু দেওয়া হয়, তাহা ছাড়া আর সর্ব্বপ্রকার আয়ই ব্যক্তিগত শ্রমের ফল মাত্র হইবে। এমন কি রাষ্ট্রের নিজ আয়ও ঐরূপ শ্রমজাত ফলের অংশ ভিন্ন আর কিছু নয়। রাষ্ট্রের পরিচালনার্থ যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সাধারণ সরকারী ভাণ্ডার হইতে শ্রমজাত দ্রব্যের আকারেই যথাযোগ্য পরিমাণে গ্রহণ করা হইবে। ইহা সরকারী কর আদায়ের বেশ একটা সহজ পন্থা বটে।

নিজের ব্যক্তিগত আয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই যথা-সম্ভব স্বাধীনতা থাকা দরকার। আয়ের অধিকারী নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত যাহাতে উহা ব্যয় বা সঞ্চয় করিতে পারে, অথবা প্রত্যর্পণের সর্ত্তে অপরকে প্রদান করিতে পারে এরূপ ক্ষমতা তাহার থাকা চাই।

প্রচলিত রাষ্ট্রের মত সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রেও প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় আয়ের অর্থাৎ নিজকার্য্যগত টিকিটের ব্যয় ও বিনিময় সম্বন্ধে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। কেবল অপরাপর রাষ্ট্র এ বিষয়ে যতটুকু বাধা দিয়া থাকে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রও তদনুরূপ বাধা দিতে পারিবে অর্থাৎ

যেরূপ ব্যয় সমাজের অনিষ্টকর, সেরূপ ব্যয় করিবার স্বাধীনতা কেহ পাইবে না।

আয়ের সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির গঠন সম্পর্কে সাফেল কিছু দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনার মর্ম্ম এইরূপ। যে সম্পত্তি অপর সম্পত্তির উৎপাদক তাহা ব্যক্তিগত অধিকারে থাকিবে না। কিন্তু নিজ ব্যবহার বা ভোগার্থ সঞ্চিত সম্পত্তি—যেমন অশন-বসন আসবাব পত্র, পুস্তক বা অপর কোন শিল্পজাতীয় দ্রব্যাদি প্রভৃতির কেবল সঞ্চয়ই নয়, অপরকে দিবারও ক্ষমতা থাকিবে। আর এরূপ সম্পত্তির উপর যে কোনরূপ কর বসান উচিত নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। অনেকে যে বলেন, সোসিয়ালিষ্টরা লোকের সঞ্চিত আয় সময়ে সময়ে সকলের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করিতে চায়, একথা সোসিয়ালিষ্টরা কিন্তু অস্বীকারই করেন। যাই হোক, যদি এরূপ ভাগ করা হয়, তবে কিছুদিন পরে ওরূপ ভাগের বস্তুই যে আর কিছু জমিবে না। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কথা এই যে, সত্য বটে মাথা-পাগলারা উহা একেবারেই রহিত করিতে উন্মুখ, কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে উহা রক্ষা করিলে বিশেষ কোন বৈষম্য বা অশুভ উপসর্গের আশঙ্কা নাই। কারণ কোনরূপ উৎপাদকসম্পত্তি বা মূলধন যখন ব্যক্তিগত অধিকারে কিছু থাকিবে না, তখন উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাত্রা বেশী কিছু বাড়িবার আর সম্ভাবনা কি? অপিচ এইরূপ উত্তরাধিকার যদি সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে অনুমোদিত হয়, তবে উহা কর্ম্মীকে অধিকতর সময় কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবার পক্ষে কতকটা প্রণোদিত করিতে পারিবে। সোসিয়ালিষ্টরা সকলেই সম্ভবতঃ এরূপ উত্তরাধিকারকে তাঁহাদের সাধারণ পদ্ধতির কোনরূপ অন্তরায় বলিয়া মনে করেন না।

সোসিয়ালিজম পরিণয় অনুষ্ঠান ও পারিবারিক জীবনের অনুকূল কিনা ইহা অবশ্যই একটা বিশেষ গুরুতর প্রশ্ন। ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার এই সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই সব গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোনও কোনও সোসিয়ালিষ্টের ধারণা তেমন উচ্চ ও সুদৃঢ় নয়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট সমাজ যে উচ্চতম পারিবারিক জীবনের একান্ত পরিপন্থী, এমন ভাবিবার কোনই কারণ নাই। যাই হৌক, এ সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্ট মতের আলোচনা পরে কিছু বিস্তৃত ভাবে করা হইবে বলিয়া এখানে সাফেলের ঐ টীকাটুকু মাত্রই প্রদত্ত হইল।

স্বীয় শ্রমের সঞ্চিত ফল অপরকে ধার দিবার কথাটা আপাততঃ সোসিয়ালিষ্ট মতের সহিত তেমন সঙ্গত বোধ না হইতে পারে। এরূপ সঞ্চিত অর্থ যদি সুদের হ্যাণ্ডনোটের আকারে অপরকে ধার দেওয়া হয়, তবে তাহা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত মূলধনের উচ্ছেদকামী সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির একান্ত বিরোধী হইয়াই দাঁড়ায়। কিন্তু উহা যদি কেবলমাত্র ঐ অর্থের ভাবী প্রত্যর্পনের সর্ত্তে কোনরূপ বন্ধকাদি রাখিয়াও দেওয়া হয়, তবে উহা সোসিয়ালিজমের অনুমোদিত হইতে পারে।

আত্মীয় স্বজন অথবা অপর কোন ব্যক্তি বা সাধারণ সভা-সমিতির উদ্দেশে দান সোসিয়ালিষ্ট মতে নিষিদ্ধ হওয়া বিধেয় নয়। ফলকথা, যদি সঞ্চিত অর্থ কোনরূপ মূলধনরূপে ব্যবহৃত না হয়, তবে তাহার ব্যবহার যে ভাবেরই হৌকনা কেন, তাহা সোসিয়ালিজমের প্রতিকূল বলিয়া বিবেচ্য না হইবারই কথা। এরূপ হইলে কি ধর্ম্ম, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান কিছুরই উন্নতি সাধনে অথবা জনহিতকর সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় সোসিয়ালিষ্ট নীতিতে

কোন বাধাই জন্মাইতে পারে না। সাফেল লিখিয়াছেন—" এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষ প্রনিধান-যোগ্য। সোসিয়ালিজমের সাধারণ ভাব দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে উহা ধর্ম ও ধর্ম্ম-সঙ্ঘের একান্ত প্রতিকূল। সোসিয়ালিজম খৃষ্টীয়ান চার্চ বা ধর্ম্ম সংঙ্ঘকে মূল ধনীদের দ্বারা পরিচালিত পুলিশ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। স্বর্গের সুখসম্পদের লোভ দেখাইয়া ইহা মানুষকে ইহলোকের সুখসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিতে চায়। এরূপ ধর্ম্মের বিলোপই বাঞ্ছনীয়।" সোসিয়ালিষ্টদের হাতে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এরূপ আকার ধরিলেও সাফেলের মতে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বা অনাস্থা সোসিয়ালিজমের কোন একটা বিশেষ লক্ষণ নয়। সত্য বটে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের অর্থানুকুল্যে কোনরূপ ধর্ম্মসংঙ্ঘ পরিচালিত হইতে পারে না, কিন্তু এরূপ ধর্ম্মসংঙ্ঘের সহিত যদি কোন ঐহিক সুখসুবিধার কথা অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ বিজড়িত না থাকে, তবে তাহা স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত দানের দ্বারা অবাধে পরিচালিত হইতে পারে। এমন কি, জাতীয় আয় অর্থাৎ সাধারণ সরকারী কার্য্যে পরিচালনার্থ দেশের শ্রমজাত ফলের যে অংশটুকু কাটিয়া রাখা হইবে, তাহা হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারের পক্ষে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে সাহায্য সোসিয়ালিজমের তেমন অনুমোদিত না হইলেও, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে উহা অসম্ভব ব্যাপার রূপে গণ্য নয়। আর স্বেচ্ছাকৃত ব্যক্তিগত দানের কথায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উহা শুধু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশেই নয়, পরন্তু দেশের সর্ব্ববিধ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞানাদি বিষয়ক ব্যাপারেই নিয়োজিত হইতে পারে।

এই ভাবে দেখিলে, প্রকৃত পক্ষে সোসিয়ালিজমের সহিত পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি প্রভৃতির এমন কোন অবশ্যম্ভাবী বিরোধ নাই। কারণ ঐ সকলের মধ্যে সোসিয়ালিজমের মূলনীতি কোনপ্রকারে ব্যাহত হয় না। সোসিয়ালিষ্টরা যদি উহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব দেখাইয়া থাকে, তবে সেটা তাহাদের ব্যক্তিগত নির্বুদ্ধিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক বলিয়াই গণ্য; প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অর্থনীতির সহিত উহাদের কোনই সঙ্গতি বা অসদ্ভাব নাই। যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সোসিয়ালিজমের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দিক হইতে ঐ সব প্রতিষ্ঠানাদির প্রতি সোসিয়ালিষ্টদের বিরোধিতা সমর্থিত হইতে পারে না। মানবসভ্যতার ঐ সব উচ্চ আদর্শের ধ্বংস যদি সোসিয়ালিজমের উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা এমন একটা বিপ্লববাদ বলিয়া গণ্য হইবে, বাস্তব জগতে যাহার প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই। সোসিয়ালিজমের সামাজিক সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা যদি বিজ্ঞানসম্মত পথে চালিত হয়, তবে তাহা হইতে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের কোন আশঙ্কা নাই; এবং সর্ব্ববিষয়ক সামাজিক পরিবর্ত্তন তখন উদ্দাম বিপ্লবের আকারে নয়, শান্ত সংস্কারের ভাবেই সংঘটিত হইবে।

উল্‌সে সাহেব এবার সাফেলের এই উদার ও যুক্তিগর্ভ আলোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, গ্রন্থের শেষভাগে লেখক অপরাপর সমালোচক অপেক্ষা সোসিয়ালিজমকে যেরূপ অধিকতর উদার অর্থে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহাতে সোসিয়ালিজমের মত-গত উৎকর্ষ কিছু ঘটিলেও, কার্য্যগত কোনই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। তিনি উহার সম্বন্ধে যে সম্ভবপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য

হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ইহার অনুদারতা ও বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানাদির সহিত বিরোধিতার ভাব তিরোহিত হইবে না। উলসের মতে সাফেলের যুক্তি যেন কতকটা এই ভাবের—একজন পাঁচ আঙুলওয়ালা মানুষ যাহা করিতে পারে, তাহা একজন দুআঙুলওয়ালা মানুষও করিতে সমর্থ। কিন্তু ইহার উত্তর এই যে, দ্বিতীয় লোকটি কি প্রথম লোকটির মত তেমন সুচারুরূপে উহা সম্পাদন করিতে পারিবে?

উলসে সাহেবের অপর কথা এই, যে সাফেলের ন্যায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবেত্তার ব্যাখ্যায় সোসিয়ালিজম না হয় বেশ শোভন ও সুন্দর আকার লাভ করিল। অর্থনৈতিক হিসাবে তাহার ব্যাখ্যা না হয় অনেকের কাছে প্রশংসনীয় হইল। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানসম্মত সমাজ এক, আর জীবন্ত কর্ম্মশালী সমাজ অর্থাৎ বিবিধ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত নৈতিক উৎকর্ষের সমবায় ক্ষেত্র অপর বস্তু।

সপ্তম অধ্যায়

(ক) রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধে নব্য

সোসিয়ালিজম্

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার ফলে আধুনিক জার্ম্মান সোসিয়ালিজমের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার মোট একটা পরিচয় পাওয়া গেল। রাজনীতি ও অর্থনীতি হিসাবে উহা এখন সমস্ত সভ্য দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির একটা বিশেষ চিত্তাকর্ষক আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার কার্য্যপ্রণালী ক্রমে অনেকটা সুব্যক্ত হইয়াছে। সোসিয়ালিষ্টরা মনে করেন, সোসিয়ালিজমের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিপুল জনসঙ্ঘ উহার পক্ষাবলম্বনে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইবে, তখন উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উহাকে বাধা দিতে আর সাহস করিবে না, বরং উহার সহিত একটা আপোধ-মীমাংসা করিতেই উন্মুখ হইবে।

কিন্তু সোসিয়ালিজম যেরূপভাবে সমাজকে একেবারে উলটপালট করিতে প্রয়াসী, তাহাতে তাহার সহিত অপর পক্ষের কোনরূপ আপোষনিষ্পত্তির অবসর কই? সোসিয়ালিজমের উদ্দেশ্য কি, না দেশের সমস্ত জমিজমা, সমস্ত কলকারখানা, সমস্ত শিল্প ও সমস্ত আমদানি রপ্তানির কাজ ব্যক্তিগত অধিকার হইতে কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করা। ইহার ফলে সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্য, কারকারবার ও লেনদেনের বিলোপ। ধরিতে গেলে, মানব জীবনের সমস্ত কার্য্য ও ব্যাপারকে উহা একটা অপরীক্ষিত নূতন অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে ফেলিতে চায়। তবেই এরূপ বিষম

বিপ্লবের সহিত আপোষনিষ্পত্তি কেমন করিয়া ঘটিবে? পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিপ্লবের কথা কখনও কোথাও উঠে নাই। ইতিহাসে এক বিজিত জাতি অপর বিজিত জাতির শাসনাধীন হইয়াছে সত্য। কিন্তু এরূপ ঘটনায় প্রথমে কিছু গোলযোগ ঘটিলেও, কিয়ৎকালের ভিতরেই বিজিতজাতি সম্পত্তি ও অপরাপর বিষয়েও অধিকার লাভ করিয়াছে। অনেক জাতির মধ্যে অনেক লোক নবতর দূরদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই নির্ব্বাসন স্থলেই ক্রমে তাহারা ব্যক্তিগত অধিকার লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছে, এমন কি তাহাদের বংশধরেরাও পরে তাহাদের দেশের পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এখন ইহা কি সম্ভবপর যে, যে মহাবিপ্লব লোকের ব্যক্তিগত অধিকারের এমন প্রবল শত্রু, তাহার বিরুদ্ধে লোকে প্রাণপণে সংগ্রাম না করিয়া অমনই সহজে তাহাকে আমল দিবে?

এই সংঘর্ষের ফল যেমন অনিশ্চিত, তেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংসের উপর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধেও এখন কেহ কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিতে অসমর্থ। শ্রমশিল্পের পরিচালনায় ও পরিবর্ত্তনে রাষ্ট্রের যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এইটুকুমাত্রই এখন জানা কথা। মানবসমাজের বিবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে সোসিয়ালিজমের প্রভাবগত ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা এখন কে নির্ণয় করিবে? তবেই দেখা যাইতেছে যে, সোসিয়ালিজম যে সমস্যা খাড়া করিয়াছে, তার খানিকটা মাত্র কিছু জানা, বাকি সবই যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই জন্য উল্‌সে সাহেব বলিতেছেন, সোসিয়ালিজম নিজের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে যে জল্পনা কল্পনা করিয়াছে, তদপেক্ষা তৎ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিবার অধিকতর দাবি জনসাধারণের। কারণ এ বিষয়ে যদি অপর

পক্ষের যুক্তিতর্ক মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু সোসিয়ালিজমের নিজের যুক্তিতর্কে যদি গলদ থাকে, তবে তাহাতে যে সমগ্র সমাজ এক অপ্রতিবিধেয় অমঙ্গলের নিস্পেষণে বিচূর্ণিত হইবে।

মুখ্যতঃ এই সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম, এমন রাষ্ট্র যাহার অধীনতায় সোসিয়ালিষ্টেরা নিজেদের শ্রমশিল্প বিষয়ক মত কাজে পরিণত করিতে পারে। দ্বিতীয়, এমন রাষ্ট্রনীতি যাহা ঐ মতের অবশ্যভাবী ফলরূপে গণ্য হইতে পারে। সোসিয়ালিষ্টদের বা কমিউনিষ্টদের যথার্থ মনোভাব কি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ফরাসী বিপ্লবের আরম্ভ হইতেই কি ফ্রান্সে কি অন্যত্র সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় সাম্যনীতিকে সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের লক্ষণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সাম্য শব্দটা বড়ই ব্যাপকার্থক। স্থল বিশেষে উহাতে কতটা বুঝায় ও না বুঝায়, তাহা দেখা চাই। ফরাসী রাজনৈতিক আদর্শে সকল ক্ষেত্রেই সাম্যের সহিত স্বাধীনতা সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্টই দেখা যায়, যে স্বৈরাচারমূলক শাসনতন্ত্রেও অনেক স্থলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেশ অক্ষুন্নই থাকে। তাহার ফলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগত সাম্য ও আর্থিক অবস্থাগত বৈষম্য পাশাপাশিই অবস্থান করে। এই অবস্থা ও ব্যবস্থাগত পার্থক্য সহজে ঘুচিবার নয়। সোসিয়ালিজম কিন্তু এই উভয়গত সাম্য স্থাপনে প্রয়াসী। ইহার মধ্যে ব্যবস্থাগত সাম্যের পথে তেমন কোন দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় নাই। এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ শ্রেণীর যদি অপর শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর অভাব অসুবিধা থাকে, তাহা দূর করাও তত দুরূহ নয়। কিন্তু সকলের মধ্যে সোসিয়ালিজম যে ভাবে অবস্থাগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর, তাহা এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব ব্যাপার—সম্ভবতঃ অসাধ্যসাধন। রাষ্ট্রীয়

ক্ষেত্রে সোসিয়ালিজমের জনতান্ত্রিক বিধিগত সাম্যমূলক ব্যবস্থা যাহাদের বিশেষ আদরণীয়, তাহারাও সকলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও দক্ষতার বিরোধী। সোসিয়ালিজমের প্রচারিত অবস্থাগত সাম্যনীতি গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে। সোসিয়ালিজমের সাম্যভাব কেবল সকলের মধ্যে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকারেরই দাবি নয়, পরন্তু সকলের মধ্যে সমান আর্থিক সুখসুবিধারও স্থাপনা। কিন্তু এরূপ সাম্যের প্রতিষ্ঠা অর্থ ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও দক্ষতাকে দাবিয়া রাখা ভিন্ন আর কি? পৃথিবীর পণ্য ভাণ্ডার অবশ্যই এমন অসীম নয় যে, প্রত্যেকেই নিজের অভাব ও রুচি অনুসারে তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক বস্তু অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে। তাই এই ব্যক্তিগত সংগ্রহের কাজে প্রবল প্রতিযোগিতার সংগ্রাম নিয়তই চলিতেছে। সোসিয়া-লিজম্ এই সংগ্রাম নিরুদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার পার্থিব অর্থসম্পদ সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিতে চায়। প্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যপদ্ধতিতে মানুষের অর্থলিপ্সা যে অসীম পরিমাণে বাড়িয়া গিয়া সামাজিক অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু এই অমঙ্গলের নিরাকরণার্থ সোসিয়ালিজম যে ভাবে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে উন্মুখ, তাহা কখনই অনুমোদনীয় হইতে পারে না। সোসিয়ালিজমের এরূপ প্রতীকারে রোগ অপেক্ষা ঔষধের অনিষ্টকারিতাই বেশী হইয়া পড়ে। কারণ, এরূপ প্রতীকারে প্রতিযোগিতার ভাব নষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নিরুদ্ধ হয়, বিচারশক্তির পঙ্গুত্ব ঘটে, উৎসাহ ও উদ্যম দমিত হইয়া যায়। ইহার ফলে শুধু ব্যক্তিগত অনিষ্টই হয় না, পরন্তু জাতিরও অবনতি হয়। কেন না, ঐ সব গুণের অনুশীলনই জাতীয় উন্নতির মূল।

যখন ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশ রাষ্ট্রীয় বিধি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা খর্ব্ব হয়, তখন সমাজ-শক্তিরও অনেক হানি ঘটে। সমাজের এইরূপ শক্তিহানির অনুপাতে, এমন কি এই অনুপাতের বেশী পরিমাণেই রাষ্ট্রশক্তির উপচয় ঘটিবার কথা। রাষ্ট্রশক্তির এরূপ অসঙ্গত উপচয় কি নিঃসন্দেহেই জাতীয় মঙ্গলের অন্তরায় নয়? সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে যদি ব্যক্তিগত মূলধনের বিলোপ হয়, তবে রাষ্ট্রকেই অবশ্য সেই মূলধন চালনার কাজ করিতে হইবে, নহিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ত থাকিবে না। এখন রাষ্ট্রকে যদি তাহার প্রচলিত কর্ত্তব্য ছাড়া আবার এরূপ বিপুল নূতন কার্য্যের ভার লইতে হয়, তবে যে তাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবশালী হওয়া দরকার, ইহা ত সহজেই অনুমেয়। রাষ্ট্রের হাতে এরূপ অত্যধিক শক্তি থাকার ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা, ও সম্বন্ধে বর্ত্তমানের আভাস হইতেই কি বুঝা যায় না? শক্তির অপব্যবহার সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। বর্ত্তমানে যদি কোথাও কোন সময়ে রাষ্ট্র শক্তির যথেচ্ছাচারিতা ঘটে, তবে প্রচলিত ক্ষমতাশালী স্বাধীন সমাজের প্রতিবাদে তাহা ক্রমে দমিত হয়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট ব্যবস্থায় যখন রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইবে এবং সমাজ নিতান্ত পঙ্গু হইয়া পড়িবে, তখন প্রবল রাষ্ট্রশক্তি যদি যথেচ্ছাচারী হয়, তাহাকে দমন রাখিবে কে?

তবেই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির উক্ত প্রকার প্রাবল্য ও অদম্যতা সোসিয়ালিজম্ নীতির একরূপ অনিবার্য্য ফল। কেননা, উহার হাতে যে কতকগুলি নূতন কাজের ক্ষমতা দেওয়া হইবে শুধু তাহাই নয়, প্রত্যুতঃ ঐ ক্ষমতা সমাজের হাত হইতে লইয়াই রাষ্ট্রকে অর্পণ করা হইবে। কাজেই নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ সমাজের পক্ষে সকল সময়েই রাষ্ট্র শক্তিকে বাধা দেওয়া, সংশোধন

করা ও উপদেশ দানের পথ প্রায়ই রুদ্ধ হইয়াই যাইবে। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের গঠন কি দাঁড়াইবে, তাহার পর্য্যালোচনা খুব একটা দরকারী বিষয় নয়। উহার গঠন যাহাই হৌক, উহা যে অব্যাহত শক্তি-সম্পন্ন হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। উহা প্রজাতান্ত্রিকই হৌক আর রাজতান্ত্রিকই হৌক, অথবা অপর কিছুই হৌক, অব্যাহত শক্তি পরিচালনার ফল যে সব ক্ষেত্রে সমান, নামের পার্থক্যে সে সম্বন্ধে যে বড় পার্থক্য ঘটে না, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, খাঁটি সোসিয়ালিষ্টরা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যাহা অনুকূল, সেইরূপ রাষ্ট্রই সংস্থাপন করিবেন। তাহা রাজতান্ত্রিক হৌক আর প্রজাতান্ত্রিক হৌক, অব্যাহত ক্ষমতাপন্ন হইলে, নামের জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। কারণ অভিজাত শ্রেণী বলিয়া যখন রাষ্ট্রে কিছু থাকিবে না, তখন প্রয়োজন মত অব্যাহত শক্তি সম্পন্ন রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অনায়াসেই অব্যাহত শক্তি-সম্পন্ন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রথমে অপর পক্ষের সহিত বিরোধের কালে সোসিয়ালিষ্টরা সর্ব্বগত ভোটের অধিকার লাভেই চেষ্টা পাইবেন এবং তৎপক্ষীয় আন্দোলন-কারীরা জনতান্ত্রিক নীতি প্রচার করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পর, তাঁহাদের একজন বন্ধু যেমন বলিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বগত ভোটের প্রয়োজনীয়তা তেমন বোধ না করিতেও পারেন। যাই হৌক, তাহাদের প্রকাশিত সব ইস্তাহারে জনতান্ত্রিক মতেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণ সভায় যাহাই হৌক, সোসিয়ালিষ্ট নেতারা নিঃসন্দেহেই অতটা উদ্দাম জনতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে কিছু সতর্ক। সেই জন্য সাফেল বলিয়াছেন, নিজ উদ্দেশ্য সাধনের পর সোসিয়ালিজম্ সর্ব্বগত ভোটের জন্য বিশেষরূপ আগ্রহান্বিত থাকিবে না।

পুরাতনের পরিবর্ত্তে ঐরূপ নূতন পদ্ধতির স্থাপনার প্রারম্ভে প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের অবশ্যই বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তখন পুরাতনের স্মৃতি অনেকের মনে খুবই জাগরূক থাকে এবং পুরাতন পক্ষীয়দের সমবেত ভাবে বাধা দিবার পথও একেবারে রুদ্ধ হয় না। তারপর নূতনের কার্য্যগত কোন ত্রুটিতেও উহার বিরোধী দলের বৃদ্ধি পাইবারও সম্ভাবনা।

এখন দেখা যাউক, উৎপাদনকার্য্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরোধে ও সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের স্থাপনায় লোকের ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্বের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? প্রথমে সম্পত্তির স্বত্বের কথা ধরা যাক। পূর্ব্ব রাষ্ট্রের ধনী লোকদের মধ্যে যাঁহারা নবপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে বাধা দিবেন না, তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ কেবল ভোগার্থ প্রদত্ত অর্থ ছাড়া এবং শ্রমিকরাও নিজেদের অথবা উত্তরাধিকারীদের ভাবী ভোগের জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিবে, তাহা ছাড়া সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। ইহাও অবশ্য আসল সোসিয়ালিষ্টদের নয়, সাফেলের মত অনুকূল সমালোচকের কথা। সাফেল যতটা পারেন, সোসিয়ালিজম্‌কে অনেকাংশে প্রচলিত ব্যবস্থার সদৃশ করিয়া তুলিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সামর্থ্যে ও নৈপুণ্যে নিজ অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের উপায়ও কিছু নাই। সাফেল সোসিয়ালিজমের সমষ্টিগত কার্য্যপদ্ধতিতে শুধু দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত সময় নয়, পরন্তু দ্রব্যের কাট্‌তির হিসাবও ধরা চাই, এই প্রশ্ন তুলিয়া কাজের চাহিদা ও নিজেদের সুবিধা মত শ্রমিকদের নিজ নিজ কার্য্যে নির্ব্বাচনগত স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আসল সোসিয়ালিষ্ট কার্য্যপ্রণালীতে ওরূপ স্বাধীনতার

তার কথা নাই ;—প্রত্যেকেই তার নির্দ্ধারিত কার্য্যে নিরত থাকিতে বাধ্য। রোমান্ সাম্রাজ্যের দাসেদের যেমন এ বিষয়ে নিজেদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, কেবল তাহাদের সত্বাধিকারীরাই তাহাদিগকে স্থানান্তরিত ও কার্য্যান্তরে নিয়োজিত করিতে পারিত, তেমনই সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের শ্রমিকরা কেবল রাষ্ট্রের দ্বারাই স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে নীত ও নিয়োজিত হইতে পারিবে। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে শ্রমশিল্পের কার্য্যে কর্ম্মীদের যদি এইরূপ অবস্থা স্থায়ী হয়, তবে উহার ফলে কি সামাজিক কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নানা নূতন তর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে।

নিজেদের কার্য্যক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কতটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিতে পারিবে, তাহা এখন নির্ণয় করা দুরূহ। ফরাসী সোসিয়ালিষ্টদের কল্পিত কর্ম্মশালায় শ্রমিকদিগকে নিজেদের সর্দ্দার ও তত্ত্বাবধায়কের নির্ব্বাচনের কতক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মশালায় যাহা সম্ভব, তাহা সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। বর্ত্তমানে বড় বড় কাজে মালিক বা তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব খুবই গুরুতর। কারণ জিনিশের ফ্যাসান বা গড়নের বিশেষত্ব, কলকব্জার অদল-বদল, কাটতির হিসাব এবং অপরাপর বহু ছোট বড় বিষয় নির্দ্ধারণের ভার তাহাদের উপরেই ন্যস্ত। সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতিকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে, এই সকলের ভার তত্ত্বাবধায়কদের স্বাধীন রুচি ও বিচার বুদ্ধির উপরেই ন্যস্ত রাখিতে হইবে। সুতরাং এসব ব্যাপারে শ্রমিকদের নিজের লোক অপেক্ষা স্বাধীন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরই বিশেষ প্রয়োজন।

দেশের খুব দরকারী একটা কার্য্য সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টরা বড় বেশী কিছু বলেন নাই। সেটি কৃষিকার্য্য। সমষ্টি-নিয়মানুসারে

এখানে এইভাবে বোধ হয় কাজ চলিবে। একটা শ্রমিকদলের হাতে অনেকখানি জমির চাষের ভার দেওয়া হইবে। ঐ দল সরকারকে যথাযোগ্য খাজনা স্বরূপ কিছু দেওয়া নিজেদের কাজ নিজেরা চালাইবে। অথবা শ্রমশিল্পের কারখানা যে ভাবে পরিচালিত হইবে, ঠিক সেই ভাবে কৃষিকার্য্যও পরিচালিত হইতে পারিবে। এখানেও শ্রমিকদের কার্য্যে সময়ের হিসাব ধরিয়া টিকিট দেওয়া যাইতে পারিবে। তবে এখানে কার্য্যের মূল্য নিরূপণ আরও একটু জটিল হইবারই কথা। যাইহোক, এখানকার শ্রমিকরাও কারখানার লোকেদের মত নিজ নিজ টিকিট দেখাইয়া সাধারণ ভাণ্ডার হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে। তবে যখন শ্রমিকদের নিজেদের আলাদা আলাদা জমিতে কাজ করিতে হইবে এবং শ্রমজাত ফসলের কতক অংশই নিজেরা দৈনিক খরচের নিমিত্ত ব্যবহার করিবে, তখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বণ্টনের ব্যাপার আরও কিছু দুরূহ হইবার সম্ভাবনা নয় কি? অনেক দেশে এই শ্রেণীর শ্রমিকদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধীয় সমস্যা অবশ্যই বিশেষ গুরুতর। ইহা সহজেই অনুমেয় যে অপরাপর শিল্পাগারের শ্রমিকদের অপেক্ষা ইহারা একই স্থানে আবদ্ধ থাকিতে অধিকতর বাধ্য।

সোসিয়ালিষ্ট দেশে বিদেশের সহিত কারকারবার একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সাধিত হইবে। যে সকল ফসল দেশে উৎপন্ন হয় না, সেই সব কাঁচা মাল ও অন্য দেশজাত বিলাস দ্রব্যের আমদানীর জন্যই বিদেশের সহিত এইরূপ সাহচর্য্যের প্রয়োজন। নিজের দেশজাত কোন কিছুরই যখন রপ্তানীর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সুধু এইরূপ একটু সামান্য আমদানীর কাজমাত্রের ভার কোন একটা রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে।

সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের আয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সরকারী আয় যখন শ্রমিকদের শ্রমজাত ফলের কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছু নয়, তখন উহার সংগ্রহের কাজ অবশ্য অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারিবে। ঐ আয়ের সংগ্রহের পর সরকার নিজের ইচ্ছামত কি দেশের কি বিদেশের কাজে নিজের সাময়িক ও অন্যান্য বিভাগের পরিচালক কর্ম্মচারিদের বেতন দানে ও সাধারণ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যয় করিতে পারিবেন ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এই সব কার্য্যের পরিচালনায় রাষ্ট্রের কোন সময়েই ধনাভাব বড় ঘটিবে না, কারণ সাধারণ ভাগ ছাড়া বিশেষ কোন দরকারের সময়ে দেশের সমস্ত শ্রমিকদের আয়ের আরও কিছু বেশী অংশ কাটিয়া লওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই সহজ হইবে।

যাইহৌক, এইরূপ করের পরিমাণ যে দেশের শ্রমজাত দ্রব্যের সামান্যমাত্র হইবে, এরূপ ভাবিবার তেমন কারণ নাই। রাষ্ট্রকে যখন নিজের শাসন সম্বন্ধীয় কাজ ছাড়া ব্যবসায় পরিচালকের কাজও করিতে হইবে, তখন ত উভয় ভাবেই অর্থ ব্যয় করা চাই। সুতরাং বর্ত্তমানে মূলধনগত লভ্যাংশের আধিক্য হেতু মূলধনীদের বিরুদ্ধে যে চৌর্য্যের অভিযোগ আনা হয়, সেরূপ অভিযোগের ব্যাপার সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রেও ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষ, বিদেশীয় যুদ্ধ বিগ্রহ এবং স্বদেশীয় অন্তর্বিগ্রহের কালে বর্ত্তমান রাষ্ট্র অপেক্ষা সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রকে বেশী বেগ পাইতে হইবে বলিয়াও মনে হয়। কারণ ওরূপ সময়ে নিজের তহবিল বা ভাণ্ডার খালি থাকিলে, দেশের মধ্যে অন্য কোথাও হইতে ধার ত মিলিবেই না, বিদেশ হইতে শীঘ্র ধার মিলাও দুর্ঘট হইবে। আত্মপক্ষ সমর্থক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে যেমন খুব দুরূহ হইবে, আবার আক্রমনকারীরূপেও

সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের দৌর্ব্বল্য সূচিত হইবে। তবে কিনা অপরকে আক্রমণ করিবার কারণ সোসয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই কম থাকিবে। কারণ ইহার ব্যবস্থা অনুসারে বিদেশের সহিত ইহার সংযোগই তত থাকিবে না। অপরের সহিত বিচ্ছিন্নরূপে নিজেকে লইয়াই উহা নিজের দিন গুজরান করিবে। কিন্তু উহার মধ্যে পুরাতন স্থানীয় কলহের ফলে অন্তর্বিদ্রোহ বেশী ঘটিবার ও স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা, কেন না ঐরূপ বিদ্রোহ দমনার্থ উহার তেমন সংখ্যার শক্তিশালী সৈন্য থাকিবে না।

আচ্ছা, এরূপ রাষ্ট্র কি দেশের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং উহাতে স্বদেশের প্রতি প্রেমের ভাব কি লোকের চিত্তে বিশেষ প্রভাব দেখাইতে পারিবে? অবশ্য বর্ত্তমানে কাহারও পক্ষে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা শক্ত। তথাপি মনে হয়, বর্ত্তমানে কোন বিশেষ জাতিকে তদ্দেশীয় শাসনপদ্ধতির বহু দোষ সত্ত্বেও দেশের সহিত যে সব বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে সে সব বন্ধনের অধিকাংশই শিথিল হইয়া যাইবে। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের ইতিহাস বলিয়া কিছু থাকিবে না। সেখানে সেরূপ কোন ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে অনেক শতাব্দী অতিবাহিত হইবে। অবশিষ্ট পৃথিবীর সহিত সোসিয়ালিষ্ট দেশবাসীরা কতকটা বিচ্ছিন্ন ভাবেই দিন যাপন করিবে। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের উন্নতি যে কি ঘটিবে, তাহা সহজে কল্পনায় আসেনা। তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক অপেক্ষা ব্যবসায়নৈতিক হইবারই বেশী কথা, এবং ঐতিহাসিক প্রভাব তাহাদের উপর হইতে একরূপ অপসারিত হইয়া যাইবে। সোসিয়ালিজম-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে, বর্ত্তমান

শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনেও যে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। প্রত্যেক সুসভ্য রাষ্ট্রে এখন মানুষের কার্য্যগত বিবিধ বৈচিত্র্য বিদ্যমান—এমন কি এক পরিবারের লোকও কেহ বিজ্ঞান, কেহ শিল্প, কেহ শিক্ষা, কেহ সাহিত্য প্রভৃতি নানা কর্ম্মে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়া নিজ সমাজকে শোভন ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিকই সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে এইরূপ বৈচিত্র্য কর্ম্মশীলতা ও উৎসাহের ভাব থাকায় তাহার আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই আনন্দ-প্রদ বৈচিত্র্যের মূল কি? মানুষের নিজের পেশা বা কার্য্য-নির্ব্বাচনে যদি নিজের স্বাধীনতা না থাকে, তবে কি সমাজে এমন বৈচিত্র্য গড়িয়া উঠে? আবার এই ব্যক্তিগত নির্ব্বাচন-ক্ষমতা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপচয় ও ব্যক্তিগত জ্ঞানরুচির উৎকর্ষের উপরেই নির্ভর করে। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে এ সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। দেশের সকল লোককে এক সরকারের অধীনে কাজ করিতে হইবে। এইরূপ পদ্ধতি অপেক্ষা আর বেশী একঘেয়ে কি হইতে পারে? ইহা কি মানুষের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা পূরণের ও উচ্চতর জীবন গঠনের উপযোগী বলিয়া গণনীয়?

(খ) সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম্ম

সোসিয়ালিজম্ সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি যদি সঙ্গত হইয়া থাকে, তবে সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র যে দেশের স্বাধীন ব্যক্তিগত বা স্বাধীন সম্প্রদায়গত ক্ষমতার হানি ঘটাইয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐরূপ রাষ্ট্রে স্বাধীন উদ্যমশীল লোকের সংখ্যা ক্রমে শূন্যে গিয়াই পৌছিবে। এক

সাধারণ কার্য্যগত বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধনেই দেশের মধ্যে কোনরূপ সমবায় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের পরিচালকরূপে রাষ্ট্র জনসমাজের উপর নিজের প্রভাব এতটা বিস্তার করিতে পারিবে যে, রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়া দুর্ব্বল সমাজের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়াই দাঁড়াইবে। ভয়ে না হোক, ঔদাসীন্য বশতঃই লোকে রাজনৈতিক ব্যাপারের দিকে আর বড় ঘেঁসিবে না।

এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্রেও লোকের উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা খুব কমই দৃষ্ট হইবে। সমষ্টিগত পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত কোনরূপ আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা ত কিছুই নাই-ই, সরকারী তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীরা ছাড়া আর সব লোক ত একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। যেখানে ব্যক্তিগত মূলধনের প্রচলন আছে, সেখানে সকলের মধ্যেই বিশেষতঃ ছোট খাট কারবারওয়ালাদের মধ্যে নিজের অবস্থার উন্নতির দিকে বিশেষ একটা আগ্রহ ও উদ্যম থাকে। যুক্তরাজ্যের মত দেশে যে জুতানির্ম্মাতার বা সূত্রধরের তাঁবে দুই একটি মাত্র শিক্ষানবিশ রকমের লোক খাটে, সেও নিজের এই ছোট ব্যবসার দ্বারা তার পারিবারিক জীবন উন্নত করিতে যত্নশীল হয়। সেও জ্ঞানের মূল্য বুঝে এবং স্বাধীন ভাবে নিজের বিচারবুদ্ধির প্রেরণায় দেশের সাধারণ কাজে যোগ দিয়া থাকে। নিজে যদি সে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না পাইয়াও থাকে, তবুও নিজের সন্তান সন্ততির শিক্ষার যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ লোকের একটা ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকে। পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যেই উহাদের জীবন গঠিত হয়। উহারা নিজেদের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া

তাড়াতাড়ি যাহা হয় একটা কিছু করিতে উদ্যত হয় না, পরন্তু সপরিবারে বেশ সুখস্বচ্ছন্দে নিজ নিজ সংসারে দিন যাপন করে। উহারা সরকারের সাহায্যপ্রার্থী নয়, নিজেদের সম্পত্তির উপরেই নির্ভরশীল। কি গ্রামে, কি সহরে, যুক্তরাজ্য মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই অধিক। উহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবেই নিজ নিজ কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্যমশীল থাকে এবং তাহাদের কর্ম্মশীলতা ও উদ্যম তাহাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে এমন কি ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে শ্রমিকদের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষা ঐরূপভাবে বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা? সোসিয়ালিষ্ট শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়। বড় জোর কয়েক ঘণ্টার উপরি কাজে যদি কিছু মিলে ইহাই মাত্র, তাহাও আবার রাষ্ট্রের সম্মতি-সাপেক্ষ।

এইরূপ ব্যবস্থায় জ্ঞানের বিস্তার পথেও অনেক বিঘ্ন ঘটিবারই কথা। এই বিঘ্ন কেহ যে প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটাইবে তাহা নয়। তবে কিনা, ঐরূপ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপেই উহা দেখা দিবে। ইহা সত্য যে, বর্ত্তমানে সকল শ্রমিকদলের নেতৃগণই শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততির জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং দেশব্যাপী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। ঐরূপ শিক্ষাকে উদ্দেশ্য করিয়া সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনকারীরা শ্রমিকদের ভবিষ্য জীবনের মনোজ্ঞ চিত্র সকলও কল্পনায় অঙ্কিত করেন। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে জ্ঞানের প্রচার যে কিরূপ ঘটিতে পারে, তাহা একটু বুঝিয়া দেখা দরকার। কাহার হাতে এই শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিবে? সরকার এ ভার গ্রহন করিতে পারে, কিন্তু সরকারের হাতে এ কাজ যে বেশ

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহার স্থিরতা কি? বর্ত্তমান মূলধনীদের স্থায় না হয় সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রও দেশের দরকার মত উৎকৃষ্ট কাপড় ও ময়দা প্রস্তুত করিতে পারিল। কিন্তু কি বর্ত্তমান মূলধনী, কি সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র, দরকার মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ত সৃষ্টি করিতে পারে না। সরকারের অর্ডারী বা আদেশে লিখিত পুস্তক উচ্চ ধরণের হইতে পারে না। ইহার জন্য চিন্তার স্বাধীনতা চাই, সৃষ্টির প্রেরণা চাই। আবার যদি কোন উত্তম ও স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের শাসন ও অর্থনীতির বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহা কি রাষ্ট্রের দ্বারা মুদ্রিত হইবে?

যে রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মূলধন থাকিবে না, সেখানে কোন স্বাধীন সমবায় পরিচালিত ছাপাখানার কারবার প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। যদি সোসিয়ালিষ্ট দেশে সংবাদপত্র বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহাকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যেই থাকিতে হইবে। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত টিকিটের সাহায্যে উহা টিকিতে পারে, কিন্তু উহার কলকব্জা ও বাড়ীঘর, হয় রাষ্ট্রের নয় রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল কোন সমবায়ের অধিকারেই থাকিবে।

এরূপ ক্ষেত্রে উহা যদি রাষ্ট্রের অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাকে দমন করা রাষ্ট্রের পক্ষে কিছুই শক্ত হইবে না। আবার এরূপ রাষ্ট্রে বিচক্ষণ জনমতেরও বড় আশা করা যায় না, কারণ এরূপ রাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন ও সাধারণ আন্দোলনের অনুকূল নয়। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, কর্ম্মিদের স্বাধীন গতিবিধির অর্থাৎ তাহাদের রুচি অনুসারে কার্য্যান্তরে ও স্থানান্তরে গমনের পথে অনেক বাধা ঘটিবে। সাধারণ জনসমাজে এখনকার মত দেশভ্রমণ, বন্ধুত্ব ও কার্য্যোপলক্ষে যে ঐক্য সাধিত হয়, তাহার

সম্ভাবনা তখন থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ ও নীচ ভেদ না থাকিলেও সমাজ তখন কর্ম্মগত ও স্থানগত নানা অসম্বদ্ধ শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

এখন যেমন প্রচলিত সমাজপদ্ধতির বিরুদ্ধে সোসিয়ালিজম অবাধে মতামত প্রকাশ করিতেছে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থকারীরা সোসিয়ালিজমের বিরুদ্ধে কি সেরূপ প্রতিবাদ করিবার অধিকার পাইবে? এরূপ সম্ভাবনা বড় অল্প। কারণ যে অর্থনীতির উপর সোসিয়ালিজম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার অসারতা প্রতিপন্ন হইলে তদ্গত রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটিবার কথা। নূতন অর্থনীতিই যখন সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাভূমি, তখন হাতেনাতে তাহার গলদ ধরা পড়িলে, আর কিসের উপর তাহা খাড়া থাকিবে?

এখন সোসিয়ালিজমের সহিত ধর্ম্মের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহাই একটু দেখা থাক। এ ক্ষেত্রে দুইটী বিষয় লক্ষণীয়। প্রথম, অতীতে কমিউনিষ্টরা বা সঙ্ঘতান্ত্রিকরা প্রচালিত ধর্ম্মমত ও তদীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কিরূপভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, দ্বিতীয়, বর্ত্তমানে সোসিয়ালিজম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপভাব পোষণ করিতে পারে।

খুব প্রাচীন কমিউনিষ্টরা—যেমন প্লেটো ও তাঁহার খৃষ্টীয় যুগের অনুসরণকারীগণ—নিজেদের কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে নিজেদের মত চালাইতে প্রয়াসী ছিলেন। ইঁহারা কেহই ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাহার ধারণা সম্বন্ধে অধিকাংশ দার্শনিক গবেষনার মধ্যে যে ত্রুটি দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে তাঁহারা অবশ্য মুক্ত ছিলেন না। ধর্ম্ম যে আত্মার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া মানুষের প্রকৃতিগত দোষসমূহ সংশোধন করিতে সমর্থ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের সকলের বড় ছিল না বলিয়াই মনে হয়। প্লেটোর মধ্যে লোকের

ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিই দৃষ্ট হয়। এইজন্য আদি খৃষ্টীয়ান যাজকগণ ও তৎপরবর্ত্তী অনেক ধর্ম্মপ্রাণ লোকের কাছে তাঁহার দার্শনিক নিবন্ধগুলি এত আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত অনেক কমিউনিষ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিলেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মেতিহাসে তাঁহারা আস্থাবান্ ছিলেন না। তাঁহারা ঐ ধর্ম্মের প্রেম ও ভ্রাতৃত্বকে মাত্র নিজেদের সাধনার বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাব হইতেই ফ্রান্সে ধর্ম্মগত সঙ্ঘতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়। ইহারই প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের ভীষণ ধর্ম্মহীনতার মধ্যেও বহুলোকের হৃদয়গত পুরাতন ধর্ম্ম বিশ্বাসের বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান এই যুগে ফ্রান্সের বহুতর চিন্তাশীল ব্যক্তি, বিশেষ ভাবে যাঁহারা সঙ্ঘতান্ত্রিকতার পক্ষপাতী, তাঁহারা প্রায় সকলেই খৃষ্ট ধর্ম্ম একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আরও অশুভ লক্ষণ এই যে, প্যারিস ও ফ্রান্সের অন্যান্য সহরে শ্রমিকদের মধ্যে ঈশ্বর ও খৃষ্টের প্রতি অবিশ্বাস সংক্রামিত হইয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লেবোর একখানি গ্রন্থে সমসাময়িক শ্রমিকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাসের যে বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা কিছু দীর্ঘ হইলেও এ স্থলে সন্নিবেশিত করা গেল।

"পৃথিবীতে যখন পার্থিব জিনিশ ছাড়া আর কিছু নাই, তখন তাহা সোণার ঢিবি হউক আর গোবরের গাদা হউক, উভয়েরই ভাগ যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের দিতে হইবে।

বর্ত্তমান সমাজের প্রেতাত্মা ইহার উত্তরে বলে—কেন ভাগ ত করা হইয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা অমনিই জবাব দেয়—হইয়াছে বটে, কিন্তু

ঠিক রকমের নয়। প্রেতাত্মা বলে—কেন বাপু, তুমি ত এতদিন উহাতে সন্তুষ্ট ছিলে। লোকটা উত্তর দেয়—এতদিন যে দ্যুলোকে একটা ভগবান্ ছিল, স্বর্গের আশা ছিল, নরকের ভয় ছিল। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে সমাজ বলিয়াও একটা কিছু ছিল। এই সমাজে আমাদের মত সাধারণ লোক দাসের ন্যায় গণ্য হইলেও, বিনা লজ্জায় পরের আদেশ বহন করিত। কারণ তাহার প্রভু ত নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে আদেশ করিতেন না, সে আদেশ যে ভগবানের নামে প্রদত্ত হইত। ভগবান নিজেই যে পৃথিবীতে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রভু ভৃত্য সকলের পক্ষে ধর্ম্ম ও নীতি কিন্তু একই। এই ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে প্রভুর সেবা করা ও ভগবানের আদেশ মানা একই কথা। আবার যদিও পার্থিব সমাজে প্রভু ভৃত্যের উচ্চ নীচ ভাব আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক সমাজে অর্থাৎ চার্চ্চ বা ধর্ম্মমণ্ডলীতে সকলেই সমান। সেখানে কোনই বৈষম্য নাই, সেখানে সকলে ভাই ভাই। ঈশ্বরের সন্তান ও খৃষ্টের সহ-উত্তরাধিকারীরূপে ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে ছোট বড় সকলেরই একই স্থান। আর এই পৃথিবীর ধর্ম্ম-মণ্ডলী আসল স্বর্গস্থ মণ্ডলীর ছায়া মাত্র। সেই দিকেই সকলের আশা ও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই কল্পিত স্বর্গের বিস্তার পৃথিবীর সেবকের দৃষ্টি হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। পৃথিবীস্থ ধর্ম্মমণ্ডলীর সৈনিকেরা সেবকের স্বর্গপ্রাপ্তির সাহায্যে তাহার জন্য কতই কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাকে সেইদিকে চালিত করিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সেবকের জন্য কত প্রার্থনা ছিল, কত ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, অনুতাপ ছিল, ভগবানের দয়া ছিল। কিন্তু সে যে সব হারাইয়াছে। তাহার আর সে স্বর্গের আশা নাই, তাহার আর যে কোন চার্চ্চ বা ধর্ম্মমণ্ডলী নাই। এখন তাহার প্রভু তাহাকে শিখাইয়াছে, খৃষ্ট একজন ধাপ্পাবাজ লোক। সেবক

এখন জানে না ভগবান্ আছেন কিনা। কিন্তু এটা সে ঠিক জানিয়াছে যে, তাহার যে প্রভুরা ধর্ম্মের নামে আইন কানুন তৈয়ারী করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে কোন ভগবানের ধার ধারে না। ছল করিয়া ভগবানের দোহাই দেওয়া, সে যে আরও খারাপ। প্রভূরা যে সব উড়াইয়া দিয়া পৃথিবীর যাহা কিছু—হয় সোণার ঢিবি, নয় গোবরের গাদায় পরিণত করিয়াছেন। সেবকেরা এখন ঐ সোণা ও গোবর উভয়েরই ভাগ চায়।"

এই বর্ণনায় পৃথিবী যেন শূন্য মন্দির এবং খৃষ্ট যেন তাঁহার আসন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মানুষ নিজের গায়ের জোরে যাহা ধরিতে ছুঁইতে পারে, তাহা ছাড়া এখানে আর কিছু নাই। ধর্ম্মের ধ্বংসের উপর ঐহিক সুখ মাত্র এখন প্রতিষ্ঠিত,—ঐ সুখই এখন সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। সোসিয়ালিষ্ট নেতাদের শিক্ষা এই এবং তাহাদের অনুচরবর্গের বিশ্বাসও এই যে, সময় আসিতেছে, যখন সমস্ত সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়া জনসাধারণ জ্ঞানে ও ধনে উন্নততর স্তরে উপনীত হইবে। কিন্তু এই উন্নতির আশা ধর্ম্মের কাছে কিছু নাই। তাই ফ্রান্সে যেমন প্যাস্কাল ও সেণ্টলুইয়ের প্রতি বিশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই জার্ম্মাণীতেও আর বাইবেল ও লুথারের প্রতি কোন বিশ্বাস নাই।

ভাল, এ সম্বন্ধে এখন সোসিয়ালিষ্ট গ্রন্থকারদের লেখা হইতে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা যাউক। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সম্পাদক ডুঁপোঁ বা বাকুনিনের কথা পূর্ব্বেই কিছু উদ্ধৃত করা গিয়াছে। এখন প্রথমে মার্ক্সের লেখা হইতে কিছু তোলা যাইতেছে—"প্রচলিত ধর্ম্মের বিলোপের উপরই বর্ত্তমান জার্ম্মান্ উদারনৈতিক মত ও কার্য্যোদ্যম প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত জ্ঞানীরা এই

শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানুষই মানুষের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ বস্তু, মনুষ অপেক্ষা উচ্চতর অপর কোন কিছু নাই। সুতরাং যাহাতে মানুষের এই গৌরবের হানি ঘটে, যাহাতে মানুষকে নীচ ও হেয় করিয়া ফেলে, তাহা ধর্ম্ম হৌক আর যাই হোক, উহারা মানিতে চাহেনা।" বরুত্ত (Baruttu) নামে আর একজন লেখক বলিয়াছেন—"সোসিয়ালিজম্ হইতেছে পৃথিবীর সম্পর্কে একটা নূতন দৃষ্টি, এই দৃষ্টির প্রেরণায় ইহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নাস্তিকতা, রাজ-নীতি সম্বন্ধে প্রজাতান্ত্রিকতা এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে সঙ্ঘতান্ত্রিকতার পক্ষপাতী।"

এই ব্যক্তি অপর এক স্থলে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন —"জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারে যতদিন না ঈশ্বর বিশ্বাস-রূপ কুসংস্কারকে মানবসমাজ হইতে উৎপাটিত করা যাইবে, তত দিন সোসিয়ালিষ্ট বিপ্লব কেবল কল্পিত আকাশ কুসুমের মত থাকিবে। একমাত্র সোসিয়ালিষ্টরাই এই ঈশ্বরগত কুসংস্কার-বিতাড়নে সমর্থ। সুতরাং একাজে তাঁহাদের প্রাণপণে লাগা উচিত। যে নিজে নাস্তিক নয়, এবং নাস্তিকতা প্রচারে ব্রতী নয়, তাহাকে যথার্থ সোসিয়ালিষ্ট বলা যায়না।" এ সব কথা খুবই স্পষ্ট। সুইস্ সংবাদ পত্র ভরবোটের এই উক্তি যেন আর ও স্পষ্টতর—"যিনি বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিশ্বাসের সামঞ্জস্য করিতে চাহেন, নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্কে কোন বিকার ঘটিয়াছে।"

সাফেল বর্ত্তমান সোসিয়ালিজমের ধর্ম্মবিশ্বাস যাহা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই সব উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই প্রাপ্ত প্রমাণ হইতে আর একটা কথাও আসিয়া পড়ে। সত্যই কি সোসিয়ালিজম্ আসলে এতটা ধর্ম্মবিরোধী

অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ সব সিদ্ধান্ত যথার্থ সোসিয়ালিজমের নীতিগত ফল, না, ওগুলি উহার অনুসরণকারীদের ব্যক্তিগত প্রলাপ মাত্র? উহা কি শ্রমিকদিগকে নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছে, না শ্রমিকেরা আগে হইতেই নাস্তিকতার ভাবে প্রেরিত ছিল? ইহার উত্তরে উল্‌সে সাহেব কয়েকটীমাত্র কথা বলিয়া পরে সোসিয়ালিজমের সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সম্পর্ক তাহার আলোচনা আরও কথঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে করিয়াছেন।

সোসিয়ালিষ্ট নীতির সূচনার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। যুক্তিবাদীরা প্রথম হইতেই বাইবেল হইতে যতটা পারেন, অতিপ্রাকৃতের ভাব বাদ দিতে চেষ্টা করায় সাধারণ মণ্ডলীর ভিতর ধর্ম্ম বিশ্বাসের হানি ঘটে। এই বিশ্বাসের অভাব যখন ধর্ম্মশিক্ষক ও প্রচারকদের চরিত্রের পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, তখনই জনসাধারণ যাজকদিগকে অনুন্নত শ্রেণীদের দমনকারী রূপে রাষ্ট্রনিয়োজিত পুলিশ বলিয়া ধারণা করিতে শিখিল।

আবার স্বাধীন চিন্তাবাদ ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তরায়রূপে ফ্রান্সে দেখা দিয়াছিল। ইহা জার্ম্মাণীতেও খুব ছড়াইয়া পড়ে। তবে ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা প্রতিক্রিয়া জার্ম্মাণীতে দেখা দেয়। এই সময়ে জার্ম্মাণী য়ুরোপে দর্শন বিদ্যা প্রচার করে। হেগেলের সময় হইতে দর্শন বিদ্যায় সর্ব্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) প্রধান হইয়া দাঁড়ায় এবং উহা ক্রমে সাধারণ লোকের মধ্যে কাছে নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বাইবেলে বিশ্বাস হইতে এই জাতির বিচ্যুতি ইহারই ফল। প্রকৃত পক্ষে যুক্তিবাদী জ্ঞানীরাই দায়ী। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মকে জনসাধারণ যদি নিম্নশ্রেণীর দমনকল্পে নিয়োজিত শাসক ও উচ্চশ্রেণীর

একটা যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া থাকে, তবে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক অভিযোগ হয় নাই, কারণ এই ধর্ম্মের প্রতি উচ্চশ্রেণীর আস্থা লক্ষিত হইত না। এই ভাবেই শ্রমিকশ্রেণী অবিশ্বাসী নাস্তিক হইয়া দাঁড়াইল এবং ভণ্ড ও স্বার্থপর বলিয়া উচ্চশ্রেণীর প্রতি তাহাদের একটা ঘৃণা জন্মিতে লাগিল।

(গ) ধর্ম্ম, গার্হস্থ্যজীবন ও বিবাহ সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্ট আদর্শ

এইবার সোসিয়ালিজমের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক আরও একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক। ধর্ম্মের সহিত ইহার যে বিরোধিতা লক্ষিত হয়, তাহা কি সোসিয়ালিষ্ট নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল, না উহা একটা সাময়িক প্রতিবাদ মাত্র। যে নীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনে উন্মুখ, তাহাতে ব্যক্তিগত অভাব পূরণের স্বাধীন চরিতার্থতা নাই। যাহা স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করিতে চায়, তাহার সহিত বাইবেল নির্দ্দিষ্ট অধ্যাত্ম ধর্ম্মের তেমন সহযোগিতা থাকা সম্ভব কিনা এবং বর্ত্তমানে সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ে যে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা এতটা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কি চিরদিনই ঐরূপ থাকিবে, না প্রচলিত ধর্ম্মে যে সব গলদ দেখা দিয়াছে, তাহাদের অপসারণে নূতন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মগত প্রতিবাদ ও বিরোধিতার স্থলে উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মগত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইবে?

পূর্ব্বে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘতান্ত্রিক সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই নয়, এমন কি বিবাহ পর্য্যন্ত কোথাও কোথাও বিলুপ্ত হইলেও, সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাব ঘটে নাই। কিন্তু এই সব সম্প্রদায়ে প্রবেশ করা

সভ্যদের স্বেচ্ছাধীন ছিল। আবার সাধারণতঃ যখন কোন সভ্য সম্প্রদায় ত্যাগ করিত, তখন তাহাকে তাহার অর্পিত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবারও ব্যবস্থা অনেক স্থলে ছিল। বহিঃস্থসমাজের নিন্দা প্রশংসার প্রভাবও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে নিজ নিজ ধারণায় সুদৃঢ় রাখিতে কম সহায়তা করে নাই। তাহাদের এরূপ নিভৃত জীবনযাপনও বহুতর প্রলোভন হইতে মুক্ত। এই সম্প্রদায়ে সাধারণ সম্পত্তিও আছে এবং উহার ক্রয় বিক্রয়ও চলে। কোন একটি কারবারের প্রত্যেক অংশীদারের যেমন সেই কারবারের সাধারণ সম্পত্তির উপর একটা অধিকার থাকে, তেমনই এই সব সম্প্রদায়েও সাধারণ সম্পত্তির উপর প্রত্যেক সভ্যের প্রায় সেইরূপ অধিকার বিদ্যমান ছিল। সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় ও এই জাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য এত, যে বিচার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক কোঠায় ফেলা চলে না। সোসিয়ালিষ্টরা যেরূপ রাষ্ট্র স্থাপনে প্রয়াসী, সেরূপ রাষ্ট্রে ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিক ভাবের যে তেমন কিছু অনুশীলন ঘটিবে, এমন লক্ষণ মিলে না। জার্ম্মাণ নেতৃগণ প্রায় সকলেই হেগেলের অনুসরণকারী, সুতরাং তাঁহারা বিশ্বাতিরিক্ত কোনও ব্যক্তিগত শক্তি স্বীকার করেন না বলিয়া সকলেই একরূপ অদৃষ্টবাদী। তাই সর্ব্ববিষয়েই ইঁহারা একচ্ছত্র ক্ষমতার পক্ষপাতী। আহ্রিন্‌ (Ahrin) বলেন, সোসিয়ালিষ্টদের মতে রাষ্ট্র একচ্ছত্র ক্ষমতাশীল। ইহা সবই আত্মস্থ করিয়া রাখে। ধর্ম্ম বল, নীতি বল, বিজ্ঞান বল, শিল্প বল, ইহা সকলই নিয়ন্ত্রিত করিবার দাবী রাখে। ইহার অনুমোদন ছাড়া কোন শক্তি কাহারও নাই। হেগেলের দার্শনিক সর্ব্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) এখানে রাজনীতিক সর্ব্বেশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রই এখানে সর্ব্বশক্তিমান্‌ একেশ্বর হইয়াছে। রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার সমর্থনকারীরা জনতান্ত্রিকই হোক, আর

রাজতান্ত্রিকই হোক, কি আর যে কোন তান্ত্রিকই হোক না, প্রাচীন রাজাদের মত রাষ্ট্রকে যেন ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন করিবারই পক্ষপাতী।

এরূপ মতের প্রভাব হইতে সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে স্বর্গের আলোক আসিবার খুব কমই সম্ভাবনা। আবার যে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা শ্রমিক সমাজকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইতেও ধর্ম্মের আলোকের কোনই আশা নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার যদি শ্রমিকদের ইচ্ছায় চালিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও একচ্ছত্রশক্তির প্রভাব অননুমোদিত হইবে না। এখন ধরা থাক, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র যেন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ একচ্ছত্র শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রে, তাহা জনতান্ত্রিক হোক আর অভিজাত-তান্ত্রিকই হোক, ধর্ম্মবুদ্ধির অনুকূল কিছু তথায় তিষ্ঠিবে কি? যদি রাষ্ট্র এ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন থাকে, দেশে শিক্ষার ভার যদি বাসকদের পিতামাতার উপরেই অর্পিত থাকে, রাষ্ট্রের সহিত কোন সংযোগ না রাখিয়া দেশের শিক্ষা যদি একান্ত শিক্ষা-মূলকই হয়, তাহাতেও ধর্ম্ম বিশ্বাস এমন প্রতিকূল সমাজ ও উদাসীন রাষ্ট্রের মধ্যে বড় বেশী আমল পাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ডেল্‌সে বলেন, ইসিনাসে চার্চ্চ বা ধর্ম্মমণ্ডলীকে রাষ্ট্র হইতে বিযুক্ত এবং বিদ্যালয়গুলিকে ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে বিযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব সমর্থিত হয়, এবং ধর্ম্মকে যেরূপ ব্যক্তিগত ব্যাপার করিয়া রাখিবার কথা উঠে, সে বিষয়ে যুক্তরাজ্যের লোকদের কোন অমত নাই। এমন কি ব্রুসেলের কংগ্রেস অধিবেশনে ধর্ম্মশিক্ষা হইতে বিযুক্ত ভাবে যে বাধ্যতা মূলক বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যগত শিক্ষার আবশ্যকতা প্রচারিত হয়, তাহার সহিত যুক্ত রাজ্যের লোকের সহানুভূতিই আছে। কিন্তু যদি সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, অধিকাংশ পরিবারের মধ্যেও যদি উহার নাম গন্ধ না পাওয়া যায় এবং সোসিয়ালিষ্ট

রাষ্ট্রে যখন যাজক বা গির্জা বলিয়া কিছুই থাকিবার কথা নয়— শ্রমিকদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদার উপরেই যখন সাধারণ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের নির্ভর, অথবা যখন উহা অপর দেশ হইতে আগত প্রচারকদের উদ্যম-সাপেক্ষ. আবার এরূপ বিদেশী প্রচারকদেরও যেখানে তেমন অভ্যর্থনার আশা নাই, তখন সাধারণ উপাসনার অনুষ্ঠান অথবা অসংখ্য অবিশ্বাসীদের মধ্যে কতিপয় মাত্র বিশ্বাসীর এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা যে বিশেষ সাফল্য লাভ করিবে, এমন আশা করিবার কোনই ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের সহিত সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইতে পারে, তাহাও একটু দেখা যাউক। এ বিষয়ে সোসিয়ালিষ্টদের অভিযোগ এই, যে বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের মতামত অপর পক্ষ ঠিক না বুঝিয়া তাহাদের অযথা নিন্দা প্রচার করিয়াছেন।

আবার যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজ ও সোসিয়ালিজম রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের কসি টানা যায়, তবে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, প্রথমোক্ত সমাজে পারিবারিক জীবনকে বড় আমল দেওয়া হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনকে ওরূপ ভাবে না আমল দিবার কারণ কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ক্ষুদ্র সঙ্ঘতান্ত্রিক সমাজ নিজেই যেন পরিবারের স্থলাভিষিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের দিকে আর তত নজর থাকে না। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে পরিবারের স্থান ও প্রভাবের বিরুদ্ধে ওরূপ প্রতিকূলতা কিছু থাকিবার নয়। এখানে শ্রমিকদের সমবায় কোন নিভৃত সাধনা বা অন্য উদ্দেশ্য জনিত নয়, ব্যবসায়িক কার্য্যগত মাত্র। সুতরাং প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন গৃহ পরিবার থাকাই সম্ভবপর. তবেই, যদি অন্যতর কোন কারণে বাধা না পায়, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে বিভক্ত পারিবারিক জীবনের স্ফূর্ত্তি কেন না ঘটিবে?

যাইহোক, একটা প্রশ্ন অবশ্য এ সম্বন্ধে উঠিতে পারে। উত্তরাধিকারের বিলোপে কি পারিবারিক জীবনের স্ফূর্ত্তি হানি হইবে না? পরিবারগত সম্পত্তির ধ্বংসের উপরেই সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ভোগার্থ সঞ্চিত সামান্য কিছু ছাড়া আর কোনরূপ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীকে দিবার নাই। সুতরাং পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি সোসিয়ালিষ্টদের প্রস্তাবিত ঐরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তবে লোকে মৃত্যুর পর পুত্রকলত্রকে অর্পণ করিবার আশায় যেরূপ মিতব্যয়িতা অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করে এবং অর্থ সঞ্চয়ের ফলে পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়, সেই সব শুভকর পারিবারিক ভাবের খুবই খর্ব্বতা ঘটিবে। এরূপ পারিবারিক ব্যবস্থায় বৈধব্য ঘটিলে শ্রমিকের পত্নীকে যে অপোগণ্ড সন্তানসন্ততি লইয়া বড়ই দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, ইহা সদাই তাহার মনে জাগরূক থাকিবে। উত্তরাধিকারের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকে অবশ্য ঐরূপ অনাথ অনাথাদের ভরণ পোষণের কোন একটা ব্যবস্থা করা চাইই। কিন্তু তাহা হইলেও জীবনের শেষে এইরূপ একটা অসহায় পরিবার রাখিয়া যাইবার ভাবনায় সমাজে বিবাহ অনেকটা অবাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার ফলে ইহার পবিত্রতারও হানি ঘটিবে। ইহার উপর যদি ধর্ম্মের প্রভাব সমাজে কমিয়া যায় এবং আধ্যাত্মিকতার যথাযোগ্য অনুশীলনের স্থলে ইহাসর্ব্বস্ব জড়বাদই যদি সভ্যতান্ত্রিকতার লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে সামাজিক নীতির বন্ধন যে বড়ই শিথিল হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর সংশয় কি? নিশ্চয়ই ঐ বন্ধন এখনকার মত আর সুদৃঢ় থাকিবে না। বহিঃস্থ সমাজের নিন্দাপ্রশংসার প্রভাবও ঐরূপ রাষ্ট্রে ঐরূপ শৈথিল্যের দমন কিছুই ঘটিবে না।

উত্তরাধিকারের বিলোপে লোকের মন হইতে কর্ম্মশীলতা মিতব্যয়িতা এবং অপরাপর পারিবারিক গুণের প্রণোদক ভাব যে অনেকটা অপসারিত হইবে, ইহা খুবই সম্ভব। এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, স্বামীর পরিতক্ত সম্পত্তির উপর পত্নীরও আংশিক অধিকার বর্ত্তায়। এখন লোকে নিজের পুত্রকলত্র এবং ভাবী-বংশের সহিত নিজের একটা ঐক্য বন্ধন অনুভব করে বলিয়া তাহার চরিত্রে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক সদ্‌গুণ বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। উত্তরাধিকারের বিলোপে ঐ ঐক্য বন্ধনের শৈথিল্যবশতঃ ঐ সব সদ্‌গুণ বিকাশের পথও অনেক রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব সোসিয়ালিষ্টদের পক্ষে উত্তরাধিকারের একটা যথাযোগ্য পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত। উহা একেবারে উঠাইয়া দিলে সামাজিক দূর্নীতি ও অমঙ্গল বৃদ্ধি পাইবারই কথা।

বিবাহ ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা অনুসারেই বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা ও বিবাহবিচ্ছেদের অল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। জেগার (Jager) বলেন—যেখানে সম্পত্তির সহাধিকারিতা ইহসর্ব্বস্ব জড়বাদ হইতে উদ্ভূত হয়, সেখানে পত্নীর সহাধিকারিতার কথা উঠাও খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য শেষটি প্রথমটির একটা অনিবার্য্য ফল নয়। তবে প্রথমটির উদ্ভব যেখানে ঐ ভাবে ঘটে, সেখানে শেষটির প্রতিও একটা ঝোঁক থাকে। হেসেন ক্লেভার লাসেলের একজন বন্ধু ও জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। ইনি বার্লিনে জার্ম্মাণ শ্রমিকসঙ্ঘের একটা সভায় বলিয়াছিলেন—"যখন মূলধনীদের দ্বারা শ্রমিকেরা আর প্রতারিত হইবে না, তখনই প্রথম বেশ্যাবৃত্তির বিরাম ঘটিবে। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের যথার্থ কর্ত্তব্য পথে চালিত হইবে। সোসিয়ালিষ্ট সমাজে নারী

ঘটিত সমস্যার পূরণ স্বতঃই সাধিত হইবে। কারণ এরূপ রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপে শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার যখন নিজেই গ্রহণ করিতে বাধ্য, তখন কোন নারীকে তাহার সন্তানদের খাতিরে কোন একজন বিশেষ পুরুষের কাছে আর আইনতঃ আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না। তখন স্ত্রী পুরুষের মিলন কেবল উভয়ের চরিত্রগত সামঞ্জস্যের উপরই নির্ভর করিবে। যদি একের সহিত অপরের চরিত্রগত সামঞ্জস্যের হানি ঘটে, তবে অবাধেই ঐ মিলন বন্ধন ছিন্ন করা যাইবে।" জেগার সম্ভবতঃ হাসেন ক্লেভারের ঠিক মুখের কথাগুলা বসান নাই, তাহার ভাবার্থ প্রদান করিয়াছেন। তাই পরে বলিতেছেন—"এ কথার মর্ম্ম প্রায় পত্নীর সহাধিকারিতার কাছাকাছিই পৌঁছায়। কিন্তু জরিসেন (Jorisen) নামা আর একজন বক্তা এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট রূপেই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে কুমারী অবাধে প্রেম বিতরণ করে, তাহাকে গণিকা বলা উচিত নয়. তিনি ভাবী স্বাধীনা স্ত্রী বলিয়াই গণ্য। ভবিষ্য রাষ্ট্রে কেবল প্রেমই স্ত্রী পুরুষের মিলনের নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইবে। রাষ্ট্রই শিশুদিগের অধিকারী ও অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইবে। বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধে এই সব কথা অবশ্য সভার সকলে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু ধর্ম্মনীতিগত বিশেষ কোন প্রতিবাদও উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় নাই।

সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাধারণের মনোভাব ও সম্বন্ধে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা জার্ম্মাণীর ঐরূপ কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সোসিয়ালিষ্ট নেতার কথায় ভর দিয়া নির্দ্ধারিত করা ঠিক হইবে না। বরং এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহারা এখন ব্যক্তিগত মূলধনী ও মহাজনের অধীনে থাকিয়াই স্ত্রীলোক ও

বালকদিগকে গুরুতর কর্ম্মভার হইতে আইনের দ্বারা রক্ষা করিতে যত্নপর রহিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য তালিকার মধ্যেও প্রচলিত সমাজ-সংস্কার কল্পে এই প্রস্তাব গুলি স্থান পাইয়াছে—যথা রবিবারে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের বন্ধ, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের কাজে না লাগান, যাহা স্বাস্থ্য ও সুনীতির পক্ষে ক্ষতিকর এরূপ কার্য্যে স্ত্রীলোকদের নিয়োজিত না করা, শ্রমিকদের বাসগৃহের উৎকর্ষ সাধন। তবে ইঁহারাই যে এরূপ সব সংস্কারে প্রথম চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য নয়। বালক ও স্ত্রীলোকদের অনুকূলে ঐরূপ আইন আগেই ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সেখানে কার্য্যকালের পরিমাণ নির্দ্ধারণের দ্বারা শিল্পশালার সত্বাধিকারীদের অত্যধিক লোভ দমনার্থ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনার্থ ও চেষ্টার ক্রটি ঘটে নাই। এই সমস্ত ব্যাপার যাহতে সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার তত্বাবধানের জন্য সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যেও শিল্পাগার সম্বন্ধীয় এসব অমঙ্গলের নিরসনের নিমিত্ত আইনাদি প্রণয়নের কথা চলিতেছে। কর্ম্মশালায় নিযুক্ত বালকবালিকাদের যাহাতে অধিকক্ষণ খাটান না হয়, যাহাতে তাহারা যথাযোগ্য শিক্ষা লাভের অবসর পায় এবং অভিভাবকেরাও যাহাতে তাহাদের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের লোভে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে অবহেলা না করে, এরূপ বিধিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবেই সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের কার্য্য তালিকায় যে মানব-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা কেবল তাহাদের দ্বারাই পৃথিবীতে প্রথম প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু যে সব দেশে মূলধনীদের প্রাবল্য বেশী এবং শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত যেখানে বেশী পরনির্ভরশীল, সেখানেই খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রণোদিত মানবপ্রীতি সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতার

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যেথানে লোভের বশে অধীন ব্যক্তিদের সুখ সুবিধার প্রতি ঔদাসিন্যে, অভিভাবক বা পিতা মাতার অবহেলায় এবং আর্থিক উন্নতিই জাতির একমাত্র বিশিষ্টতম লক্ষ্য এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায়, বহু সব অশুভ ফল উৎপন্ন হইবার কথা, তাহাদের দমনের চেষ্টাও চলিতেছে। যে পর্য্যন্ত মুলধনীদের দেশে এই সব শুভকর চেষ্টা বিরত না হয়, ততদিন সোসিয়ালিষ্টদের অপেক্ষা করা উচিত। ঐ সব চেষ্টার বিরামে তাহাদের নবপদ্ধতির প্রবর্ত্তনের অনুকূলে নিশ্চয়ই বেশী জোর দাঁড়াইবে।

সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে সর্ব্ব সাধারণের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে। সেথানে আমোদ প্রমোদেরও সাধারণ প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে; অত্যাচার ও উৎপীড়ন দমনার্থ যথারীতি শান্তিরক্ষার সুপ্রণালীও থাকিতে পারে। কিন্তু যে সব মহৎ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সকল কিরূপে রক্ষা পাইবে? এবং যদি বিনষ্ট হয়, তবে তাহাদের স্থান কিরূপে পূর্ণ হইবে?

সোসিয়ালিজমের মত একচ্ছত্র শক্তি সম্পন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলাফল কি দাঁড়াইতে পারে, এতক্ষণ তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

(ঘ)

ব্যক্তিত্বের উপর, ধর্ম্মের উপর, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার প্রভাব কি ভাবে পড়িতে পারে, তাহাও দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য সমাজে প্রত্যেকের ভিতর যে একটা প্রবল ও স্বাধীন লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে তাহার বিলোপ

ঘটিবারই কথা। মৃত্যুর পর সন্তানসন্ততির জন্য লোকের কিছু রাখিয়া যাইবার আশা সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে একরূপ ত্যাগ করিতে হইবে বলিলেই চলে। সোসিয়ালিজম্ পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের একেবারে প্রতিকূল না হইলেও, বিশেষ ভাবে অনুকূলও নয়। উহার আওতায় পারিবারিক জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধি তেমন ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বোপরি উহার ভাব যেরূপ নাস্তিকতা ও জড়বাদ প্রধান, তাহাতে উহা যে সামাজিক মঙ্গল প্রসূত হইবে, তাহা কিরূপে আশা করা যায় ?

সাধারণ শান্তি ও সুশৃঙ্খলার স্থাপন এবং সাধার [illegible]ভ ও বিচার বুদ্ধির বিকাশে উহার সম্ভাবিত সামর্থ্য কিরূপ, [illegible] দ্রষ্টব্য। শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থাপনে সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে প্রচো[illegible]ষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ থাকিবারই সম্ভাবনা। কেনন [illegible]চলিত রাষ্ট্রে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার অনেক বে[illegible] অপর পক্ষে সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকারে ঐরূপ স্বাধীনতার খর্ব্বকারী ও নিজেই একচ্ছত্র শক্তিসম্পন্ন। অসংখ্য জনসাধারণের ভ্রমণ আর অন্যত্র গতিবিধিরও তেমন সুবিধা ঘটিবে না, তাহারা স্ব স্ব নিজ নিজ আবাস স্থলেই একরূপ আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। যাহি হোক, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে কিন্তু ভিক্ষুক, তস্কর ও ভবঘুরের দল প্রায় বিলুপ্ত হইবে, কারণ টিকিটের সাহায্য ব্যতীত আগন্তুক ভবঘুরের ঘুরিবার সম্ভাবনা কোথায় ? আবার লোকের সম্পত্তি যখন থাকিবে না, তখন চৌর্য্যেরই বা উপদ্রব কেন ঘটিবে ? ফলেই প্রতারণা চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে তেমন আমল পাইবে না। ইহা ব্যতীত জালিয়াতি তহবিল তছরূপ মুদ্রা-নকল প্রভৃতি সাধারণ সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত অপরাধেরও পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে।

ঐ সব কারণেই আদালতে একের বিরুদ্ধে অপরের অভিযোগের সংখ্যাও অনেক কমিবে। যখন রাষ্ট্রই দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্য্য নিজের হাতে লইবে, তখন ও সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ কিছু ঘটিবেনা। উত্তরাধিকারের বিলোপে উইল সম্বন্ধীয় বিবাদ বিরোধেরই আর হেতু থাকিবে কি? পণ্যাদির স্থানান্তরে প্রেরণ বা চালান যখন রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, তখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও সম্বন্ধেও কোন গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ফলে, এই সকল অপরাধ বিবাদ বিরোধ ও গোলযোগের যদি এভাবে অবসান ঘটে, তবে এখনকার মত উকিল মোক্তার বিচারক বিচারালয় ও রাশিকৃত আইন পুস্তকের আবশ্যকতা তখন ততটা থাকিবে না। এখানে এইসব সুফলেরই উল্লেখ করা গেল। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে জীবনের বৈচিত্র্য ও বিকাশের যে হানি ঘটিবে, তাহার স্থান কি ঐ সব সুফলের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে?

সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে জনসাধারণ কতটা নীতি ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয় বিচার্য্য। উচ্চধরণের মতামতের প্রভাব যেখানে খুবই খর্ব্ব হইয়া পড়িবে, সেখানে সাধারণ নীতির উৎকর্ষের আশা বড় কম। তাই মনে হয় যে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের শ্রমিকেরা যদি অপেক্ষাকৃত অল্প সময় কাজ করিয়া নিজেদের সংসার চালাইতে পারে, তবে তাহাদের বেশী অবসর কালটা তাহারা তেমন যেন ভাল ভাবে কাটাইবে না। বর্ত্তমান অপেক্ষা তখন নেশা, বিবাদ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাপর দুর্নীতির আরও বেশী প্রাবল্য ঘটিবারই ত সম্ভাবনা। তবে একচ্ছত্র শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের দমনও অবশ্য কঠিন হইবে না।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে স্ত্রীপুরুষের চরিত্র ঘটিত দোষ বৃদ্ধি পাইবারই কথা। কারণ একদিকে উত্তরাধিকারের বিলোপেই যেমন পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে, তেমনই অপর দিকে সোসিয়ালিজমের সূচিত নাস্তিকতা ও জড়বাদের প্রভাবেও উহার পবিত্রতার লাঘব ঘটিবে। অথচ সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের পদ্ধতিতে এমন কিছু লক্ষিত হয় না, যাহার দ্বারা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের ঐরূপ গুরুতর ক্ষতি কিছুমাত্র পূর্ণ করতে পারে। তাই মনে হয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভবতঃ তখন অতি অল্প কারণেই সংঘটিত হইবে। ফলকথা, যদি সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র ঐ সব অশুভ প্রভাবের প্রতীকার কল্পে কোন উপায় উদ্ভাবন না করে, তবে খৃষ্টীয় ভূভাগে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থায় যে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধোগতি ঘটিবে, তাহা একরূপ নিশ্চয়।

অসমর্থ দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের ভার তখন সাধারণতঃ রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সম্পত্তিগত কর বা দানের দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হয়। যদি কোথাও খৃষ্টীয় রাষ্ট্র বা সমাজ ঐ কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিতে না পারিয়া থাকে, তবু তাহার উপর ঔদাসীন্যের দোষ চাপান যায় না। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে জীবিতদের নিকট হইতে স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদা ও মৃতদের নিকট হইতে দানের পরিমাণ বিশেষ ভাবেই কমিয়া যাইবে। আবার এই উদ্দেশ্যে শ্রমজাত ফল হইতে বাদ কাটাও শ্রমিকদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। তবে ইহা সম্ভব যে, যে সব জমিজমা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে, তাহার আয় হইতে নিঃসহায় ও অনাথদের প্রতিপালনের একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। যাহা হউক, বর্ত্তমানের তুলনায় তখন ঐরূপ দীন দরিদ্রের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা

এক্ষণে নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। বর্ত্তমান অপেক্ষা তখন অত্যধিক কর-ভার ও যুদ্ধাদি কম ঘটিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এখনকার মত তখন সাধারণ দুর্ভিক্ষের প্রতীকার তত সহজ হইবে না। কারণ তখন মূলধনী ও ব্যবসায়ীদের অভাবে অপর দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য সহজে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে আনা যাইবে না। আবার সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র বিদেশে ঋণ গ্রহণ করিতে কিম্বা বিদেশের সহিত পণ্যের আদান প্রদান করিতেও সহজে সমর্থ হইবে না। মোট কথা, দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান বর্ত্তমান অপেক্ষা তখন যে বিশেষ ভাবে কিছু হইবে এমন আশা বড় নাই।

প্রাচীন রাষ্ট্রে সাধারণের শিক্ষার প্রতি সমাদর দেখান হয় নাই, এমন কি উহা ভয়ের ব্যাপার বলিয়া বিশেষ বাধা পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র আধুনিক রাষ্ট্রের উহা একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ এ সম্বন্ধে কি ভাব প্রদর্শন করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই সঙ্ঘের গথা ও হিসিনাসের অধিবেশনে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হইয়াছিল। এই সব ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টদের নিঃসন্দেহই বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হয়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা ও সোসিয়ালিষ্ট সমাজের মনোভাব কি ঐরূপ সাধারণ শিক্ষার অনুকূল হইবে? বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রতিই ঝোঁক দেখা যাইতেছে। যুক্ত রাজ্যে প্রত্যেক শ্রেণী, এমন কি যাহারা অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত, তাহাদেরও সন্তান সন্ততিদের পক্ষে উহা একটা উন্নতি ও আশার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে অর্থশালী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার্থ উচ্চ বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে বেশী কিছু থাকিবে না, সেখানে শিক্ষার্থ এরূপ

দানের কোনই সম্ভাবনা নাই। আবার সন্তান সন্ততিদের উচ্চশিক্ষা দিবার মত শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ইহার জন্য একটা সাধারণ কর আদায় ছাড়া অন্য কোন পথ থাকিবে না। তাহা হইলেই শিক্ষাকে যতটা সুলভ করিতে পারা যায় সেই চেষ্টা লক্ষিত হইবে। এইরূপ অবস্থায় শিক্ষা তেমন উচ্চাঙ্গের হইতে পারে না, কারণ যোগ্যতর শিক্ষক শ্রেণী গঠন করিতে হইলে, প্রথমেই বিশেষ অর্থের প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে আরও এক কথা বলা যায় যে,উহা তখন নানা কারণে সাধারণের তেমন প্রার্থনীয় বস্তু হইবে না, কারণ সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা সাপেক্ষ পেশা—যেমন ব্যবহারজীবী ও শিক্ষিত মন্ত্রী প্রভৃতির কার্য্য একরূপ উঠিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া যাহাদের কোন পেশা অবলম্বন না করিয়াও জ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা ঘটে, সেরূপ লোকও সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে থাকিবার কথা নয়। শিক্ষাসাপেক্ষ পেশাধারীদের মধ্যে বাকি রহিল ডাক্তার ও সরকারী কর্ম্মচারীর দল ডাক্তারকেও তখন সম্ভবতঃ সরকারের অধীনে কাজ করিতে হইবে।

যাহাহৌক, ইহাদের মধ্যে অনেকেরই অবশ্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া চাই। তবে অনেকের পক্ষে তত উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু যে শিক্ষার পেশাগত উদ্দেশ্য নাই, যাহা মানুষের মানসিক শক্তি ও সৌন্দর্য্যানুভূতির উৎকর্ষ-সাধকমাত্র, সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে তাহা কি বিশেষ সমাদৃত হইবে, না তাহার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ের তেমন প্রবৃত্তি থাকিবে? আবার সমাজে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর বিলোপেও শিক্ষার অনেকটা হানি ঘটিবে। কারণ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যেই অনেকে উচ্চ শিক্ষার ও জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ পাইয়া থাকেন। ধরিতে গেলে তাঁহারাই জাতীয় জীবনে

বৈচিত্র্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ রোপণ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই মানব সমাজে এমন সব নব নব ভাব ও চিন্তা প্রবর্ত্তিত করেন, যাহার সুফল সর্ব্ব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারাই মানুষের মনে এই ধারণা জাগরূক রাখেন যে, আর্থিক সম্পদ অপেক্ষা আরও কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে। সংসারে ব্যবহার্য্য ফলোৎপাদক অপরা বিদ্যা অপেক্ষা আত্মা ও মনের উৎকর্ষ সাধক পরাবিদ্যার মূল্য একটুও কম নয়। দেশে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির বিদ্যমানতায় শিক্ষা বিষয়ে তাহার নিজের শ্রেণী অপেক্ষা অনেকস্থলে তন্নিম্ন শ্রেণীরই বরং অধিকতর উপকার সাধিত হয়। তবেই, যে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে জ্ঞানচর্চ্চাশীল লোকের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমিয়া যায় এবং তাহাতে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক উপায় তেমন থাকে না। তাহা কি উচ্চ, কি সাধারণ, কোন প্রকার শিক্ষার অনুকূল হইতে পারে না।

অষ্টম অধ্যায়

(ক) বর্ত্তমান সমাজের ধ্বংস ও সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা

এখন দেখা যাউক, সোসিয়ালিজম কি নিতান্ত অসম্ভব আকাশ-কুসুম, না ধরাধামে ইহার বাস্তব আকারে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে? যদি লোককে বুঝাইয়া না পারা যায়, তবে শেষে কি জবরদস্ত একটা বিপ্লবেও সমাজে ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে? আর যদি এইরূপ কোন বিপ্লবের সম্ভাবনা না থাকে, তবুও এই আন্দোলনের মধ্যে এমন কি কোন সামাজিক ব্যাধি প্রকাশ পায় নাই যাহার প্রতিকার নিতান্তই প্রয়োজন? যদি যথার্থই কোন ব্যাধি ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিকারের উপায়ই বা কি? নিজ গ্রন্থের উপসংহারে উল্‌সে সাহেব ঐ সব প্রশ্নের যে উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

তাঁহার মতে বিষয়টি তলাইয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সোসিয়ালিজম যে প্রভাব সাধারণের উপর বিস্তার করিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক যুক্তিমূলকই নয়। আধুনিক সময়ে রাজনৈতিক অধিকারের নবতর চর্চ্চায় যে সাম্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেই উহা উদ্ভূত। যাহারা এতদিন ঐ অধিকার হইতে পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বঞ্চিত ছিল, তাহারাই ঐ সাম্যের দাবী উত্থাপিত করিয়াছে। এই নূতন দাবীর সত্য এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উচ্চতর বিশেষ বিশেষ শ্রেণী এতদিন যে বিশেষ বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছিল, তাহা উহাদের এক এক করিয়া ক্রমে ছাড়িতে হইয়াছে। ক্রমে ঐসব অধিকারগত সাম্য এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে

এখন ঐ সম্বন্ধে সকলেই সমান বা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার রাজনৈতিক অধিকারগত বৈষম্য ক্রমে দূর হওয়ায় আর একটি বৈষম্য লোকের নজরে এখন বেশী পড়িয়াছে। ইহা অবস্থাগত বৈষম্য। ব্যক্তিগত এই বৈষম্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই ন্যায় পুরাতন একটা কথা। সমাজের কতক লোক জন্ম, শিক্ষা, সামর্থ্য, ও বিচার বুদ্ধিতে অথবা যাহাকে লোকে দৈব (accident) বলে, তাহার ফলে এরূপ সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, যাহা সাধারণের পক্ষে সুদুর্লভ। দেশের আইন ও লোকাচার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তাহার উত্তরাধিকার সমাজে বজায় রাখিয়া ব্যক্তিগত বিশেষ বিশেষ সুখৈশ্বর্য্যের অবস্থাকে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর, কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে মূলধনের সমবায় ও একচেটিয়া আধিপত্য ঘটায়, মূলধনহীন লোকের পক্ষে নিজের জন্মগত অবস্থার উন্নতি করা খুবই শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে সমাজের বহুতর লোকের পক্ষেই রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য আর্থিক অবস্থার বৈষম্যে বিড়ম্বিত হইয়াছে। যথেষ্ট মূলধন ব্যতীত কর্ম্মক্ষেত্রের সাফল্য কঠিন হইয়া ওঠায় রাজনৈতিক অধিকারগত সাম্যের মধ্যে অবস্থাগত বৈষম্যের বিড়ম্বনা প্রতিনিয়ত বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ ব্যাধি ছিল, এখন ঐ অবস্থাগত বৈষম্যের ফলে সেইরূপ ব্যাধিই সমাজে অন্যভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ঐরূপ বৈষম্যপীড়িত লোকেদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, তাঁহারা ঐ ব্যাধির একটা প্রতিকার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, সমাজের এই যে একদিকে ভীষণ দারিদ্র্য ও অপরদিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাব দিন দিন বৃদ্ধি

পাইতেছে, ব্যক্তিগত অবাধ প্রতিযোগিতাই এ অমঙ্গলের মূল দেশে সমস্ত মূলধন রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। এই ভাবে সোসিয়ালিজমের আবির্ভাব হইল।

ঐরূপ সাম্যের ভাব লোকের মনে অন্য দিক হইতে দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বকালে লোকেরা নিজ বাড়ীতে থাকিয়া নিজেদের ছোট খাট ব্যবসায় চালাইত। সাধারণ কর্ম্মশালা তখন খুব কমই ছিল। যাহা ছিল, তাহা অতি ক্ষুদ্র আকারে থাকাতে সেখানে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ঘটে নাই। সুতরাং অপেক্ষাকৃত দীন অবস্থাপন্ন লোকের মনে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা তখন তেমন না জাগিবারই কথা। কিন্তু এখন বিপুল মূলধন চালিত বিপুল কলকারখানার দিন। এখন মালিক শ্রমিকদের মধ্যে অবস্থাগত আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাই এখন এইরূপ বেতায় বৈষম্য হইতে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা লোকের মনে এমন উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। যাহার মূলে কোন ব্যক্তিগত প্রাধান্য নাই এবং যাহা সর্ব্বপ্রকারে অত্যুচ্চ, এমন শক্তির বশ্যতা লোকে সহজেই স্বীকার করে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহার সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে আর্থিক ক্ষেত্রে তাহার এমন ব্যক্তিগত বিপুল প্রাধান্য লোকে সহজে সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য রাষ্ট্র যদি সমস্ত শ্রমশিল্পের কাজ নিজের হাতে লইয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়, সেটা লোকের পক্ষে তত অসহ্য হয় না।

এই সব ব্যাপার হইতেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সোসিয়ালিষ্ট-দের কতক সুবিধা হইয়াছে। সোসিয়ালিষ্টরা শ্রমগত ফলের যে অতি বড় একটা ভাগ লাভের আশা শ্রমিকদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা তাহারা ততটা বুঝুক আর না বুঝুক, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে উন্মুখ। এতদ্ব্যতীত, ইহাও তাহারা মনে করে যে সোসিয়ালিষ্ট নেতারা যে কথা

বলেন, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহাতেই বা তাহাদের ক্ষতি কি? আর যদি সত্য হয়, তাহাদের কিছু লাভ ত হইবেই। যে অবস্থাতেই থাকুক, সমাজে শ্রমিক নহিলে চলিবেনা। কিন্তু সমাজে আর একটা দল আছে এবং উহার সংখ্যাও বড় কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস সোসিয়ালিজমের অভ্যুদয়ে তাহাদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এখন ইহাদিগকে কিরূপে শান্ত করা যাইতে পারে? এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোন কোন সোসিয়ালিষ্ট যে সব জবরদস্ত রকমের চড়া ভাব প্রদর্শন করেন, তাহাতে সুফল ত কিছু নাই-ই, বরং পরস্পরে আড়াআড়ি ও ছাড়াছাড়িরই সম্ভাবনা। আরও এইরূপ চড়া ভাব প্রদর্শনে সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনের সাফল্যে বিশ্বাস অনেকের মনে কমিবারই কথা। যাহা হোক, এই সম্প্রদায় এখন ক্রমে বুঝিয়াছে, যে সোসিয়ালিজম শ্রেণী হিসাবে তাহাদের ধ্বংসের কারণ ভিন্ন আর কিছু নয়। উহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারেই নষ্ট হইবে। উহারা রাষ্ট্রীয় শ্রমিক শ্রেণীতেই অবনমিত হইবে।

আধুনিক সোসিয়ালিজম যে ভাবে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সাধনে ব্রতী, তাহাতে নিজেদের এইরূপ অবনতিকর ব্যাপারে সম্পত্তির অধিকারীরা নিশ্চয়ই কখনও স্বেচ্ছায় সম্মত হইবে না। হয় তাহাদিগের সম্মতি নিয়া, নয় জবরদস্ত বিপ্লবের দ্বারাই ঐ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এই উভয়বিধ উপায় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক এবং সোসিয়ালিজমের সম্ভাবিত সাফল্যের দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করা যাউক।

ঐ নূতন আন্দোলনকারীদের একটা বিশ্বাস এই, যে প্রকৃতির নিয়ম—যদি উহাকে ঐনামে আখ্যাত করা যায়—তাহাদেরই স্বপক্ষে কাজ করিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রমিকদের নিজ নিজ সামান্য যন্ত্রাদির স্থলে

এখন বিপুল মূলধন চালিত কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা উন্নতির সোপানের একটা উচ্চ ধাপ বলিয়া গণ্য। কারণ ক্রমে যেমন শ্রমিকদের সামান্য কর্ম্মশালার স্থলে বড় বড় কলখারখানার প্রতিষ্ঠা হইল, তেমনই ঐ বড় বড় কলকারখানার মধ্যে যাহারা প্রতিযোগিতায় বেশী বড় হইবে তাহারা ক্রমে ছোট-গুলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এইরূপ ব্যাপার যতই বেশী ঘটিতে থাকিবে, ততই মালিকদের সংখ্যা কমিয়া আসিবে। ব্যবসায় গুলিও সংখ্যায় কমিবে এবং আকারে বাড়িবে। তখন এই অল্প সংখ্যক মালিক, যে শ্রমিকদলকে বর্ত্তমান ব্যবসায় প্রণালীতে দাস করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু যাহারা রাজকীয় বিধি ব্যবস্থায় স্বাধীন, তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে যদি ঐরূপ নিয়ম প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট, অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়, তবু উহার কার্য্যে পরিণত হইতে সময় লাগিবে। প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি সোসিয়ালিষ্টরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ভালই হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে সামাজিক যে অমঙ্গলের আলোচনা সোসিয়ালিষ্টরা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার নিরসনের জন্য তাহাদের প্রস্তবিত সমাজ বিপ্লবই এক মাত্র প্রতিকার, না সমাজ ওরূপ ভাবে নিজেকে ধ্বংস না করিয়া ক্রমে উহার সংশোধন করিতে সমর্থ। প্রকৃত পক্ষে যদি অবাধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য্য কয়েকজন মাত্র ব্যবসাদার পণ্যোৎ-পাদক জাহাজওয়ালা আমদানী-রপ্তানিকারী মূলধনীর হস্তগত হইয়া থাকে, তবে তখন কি ঐরূপ সামাজিক অমঙ্গলের প্রতীকার আইনপ্রণয়নের দ্বারা সম্ভব হইবে না? যাহাই হোক, ইত্যবসরে সোসিয়ালিজমের মত সমাজবিধ্বংসী প্রতীকার অপেক্ষা ঐরূপ আইন গত প্রতীকারের চেষ্টা করাই ভাল।

শ্রমগত ফলের উপর শ্রমিকদেরই একমাত্র অধিকার, বর্ত্তমান মালিকরা ধরিতে গেলে লুণ্ঠনকারী মাত্র—এই বিশ্বাস কি সোসিয়ালিষ্টরা লোকের মনে জন্মাইতে পারিবে? আবার ইহাও দ্রষ্টব্য যে বর্ত্তমান অপেক্ষা শ্রমিকের শ্রমগত প্রাপ্য সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে খুব বেশী দাঁড়াইবে এইরূপ প্রত্যয় লোকের মনে বদ্ধমূল করিবার পক্ষে তেমন অকাট্য প্রমাণই বা কি? কারণ রাষ্ট্রই হোক আর অন্য কোন মালিকই হোক, উভয়কেই ত উৎপাদনের যন্ত্র ও উপকরণাদির ব্যয় বহন করিতে হইবে। দ্রব্যাদি বাজারে বা ভাণ্ডারে পৌঁছাইবার আগেই ত উভয়কে শ্রমিকদের প্রাপ্য অগ্রিম দিতে হইবে, এবং ইহার সাহায্যেই উভয়ে নিজ নিজ খরচ চালাইবে। পার্থক্য এই যে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যদি পণ্য লোকসানে বিক্রীত হয়, তবে মালিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অপর পক্ষে রাষ্ট্র সেই ক্ষতির ভার সমগ্র শ্রমিকদের উপরেই চাপাইয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত দেশের শ্রমজাত ফলের অংশ ভিন্ন নিজের কার্য্য পরিচালনার্থ ও নিজের কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য প্রদানার্থ রাষ্ট্রের যখন অন্য কোন উপায় থাকা সম্ভব নয়, তখন এই খরচটাও যে নিতান্ত সামান্য হইবে, তাহাও বলা যায় না। সেই জন্য প্রচলিত না ভাবী এই নূতন—কোন পদ্ধতিতে শ্রমিকের প্রাপ্যের পরিমাণ বেশী থাকিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় দুরূহ। আবার যে পদ্ধতিতে কার্য্য দক্ষতার কোন পুরস্কার নাই, কেবল কার্য্যগত সময়ই কার্য্যের মূল্যনিয়ামক, সেই পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে কার্য্য যে অধিকতর আন্তরিক ভাবে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে, এমন কি আশা আছে? কার্য্যে যাহাতে লোকের আন্তরিকতা ও আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়, সেরূপ উপায় বর্ত্তমান মালিকরা বরং অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের

পদ্ধতিতে সকল প্রকার ব্যক্তিগত উৎসাহ ও আগ্রহ, মনে হয়, নিভিয়াই যাইবে এবং তন্নিমিত্ত কাজের ফল কমিবারই কথা। এরূপ ঘটিলে সোসিয়ালিষ্ট পদ্ধতির বিফলতা কি অবশ্যম্ভাবী নয়? যত দিন না সোসিয়ালিষ্টরা এ সম্বন্ধে আকাট্য প্রমাণ সহ সদুত্তর দিতে পারিবেন, ততদিন লোকে তাঁহাদের পদ্ধতির অনুমোদন করিতে পারিবে না।

আবার সোসিয়ালিষ্টরা যদি তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রচারিত কার্য্য-প্রণালীকে সোসিয়ালিজমের ভিত্তিরূপে অটলভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ কাট্তির কথা না ধরিয়া কেবল মাত্র শ্রমের হিসাবেই চলেন এবং শ্রমিকের একস্থান ও কার্য্য হইতে অন্য স্থানে ও কার্য্যে যাইবার স্বাধীনতা ও সুবিধা না রাখেন, তবে তাহাদের পদ্ধতি যে স্থায়ী ও উন্নতিকর হইবে, ইহা লোক সাধারণকে তাঁহারা বুঝাইতে সক্ষম হইবেন না। ইহা ছাড়া যদি তাঁহাদের পদ্ধতি বর্ত্তমান ব্যবস্থার মত নিজেকে লোকের পরিবর্ত্তনশীল অভাব ও রীতি নীতির অনুযায়ী না করিতে পারে, তাহা হইলেও উহার সাফল্য সুদূরপরাহত। অন্যান্য রাষ্ট্রকেও অনেক বিঘ্ন বিপদ সহ্য করিতে হয়। তবে সে স্থলে ব্যক্তিগত কার্য্যোদ্যমের অবসর থাকায় ঐ বিঘ্ন বিপদ শীঘ্র কাটিয়া যায়। কিন্তু সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্র একই পন্থানুসারী। সেই পন্থা হইতে প্রয়োজনমত ফিরিবার তেমন সামর্থ্য থাকিবেনা। অন্ততঃ এইরূপ আশঙ্কায় লোকে একান্ত ভাবে উহার শাসনাধীন হইতে ইতস্ততঃ করিবে।

যাই হোক, অর্থনীতি ও তদনুযায়ী কার্য্যই মানুষের জীবনের সমস্তটা নয়। সাধারণের মধ্যে অনেকেই অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না। ইহারা জানিতে চায়, সোসিয়ালিজমের প্রবর্ত্তনে লোকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, শাসন ব্যবস্থা, ধর্ম্মনীতি ও অপরাপর অধ্যাত্মিক

ব্যাপারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। সোসিয়ালিজম কিন্তু এই সকলের বড় ধারই ধারে না। তাহারা যদি বুঝে, যে এই সব বিষয়ে লোকের অধিকাংশের হানি ঘটিবে, তবে তাহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থার অশুবিধ দোষ সত্ত্বেও জীবনের ঐ সব মহা প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের অনুকূল জানিয়া ইহার ধ্বংস সাধনে শীঘ্র রাজি হইবে না। এইরূপ মনোভাব অনেক সোসিয়ালিষ্টের চিত্তেও জাগিতে পারে। কারণ যে ব্যবস্থা প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতি ও চিন্তাধারার এরূপ প্রতিকূল যে তাহার অতীত ইতিহাসের সহিত দেশের কোনই সম্বন্ধ থাকিবার নয়, সেরূপ বিপ্লবে যাহারা অর্থনীতিমূলক কার্য্যকে মাত্র জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করে না, তাহারা যোগ দিতে অথবা উহার সাফল্য কামনা করিতে নিশ্চয়ই উদগ্রীব হইবে না।

তবেই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, যদি এইরূপ বিপ্লব সমাজে ঘটাইতে হয়, তবে তাহা জোর জবরদস্তি করিয়াই ঘটাইতে হইবে। যদি সোসিয়ালিষ্টরা কোনরূপ জোর জবরদস্তির পক্ষপাতী না হন, তবুও বর্ত্তমান ব্যবস্থার সমর্থনকারীরা জবরদস্তভাবে নিজেদের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইবে। এইরূপ অবস্থায় প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থনকারীদেরই বেশী সুবিধা। কারণ সোসিয়ালিষ্টদের মতে যখন তাহাদের পদ্ধতি কেবল কোন বিশেষ জাতি সম্পর্কে নয়, পরন্তু সমগ্র মানব সমাজ সম্বন্ধীয়—তখন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষপাতী সর্ব্ব প্রকার দল ও সম্প্রদায় আত্মরক্ষার্থ যে ঐক্যবদ্ধ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সোসিয়ালিজমের লক্ষ্য যখন কেবল শাসনতন্ত্রগত পরিবর্ত্তন নয়, পরন্তু পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন, তখন ত অপর পক্ষের ঐরূপ ঐক্য বন্ধনের আন্তর্জ্জাতিক ভাব সর্ব্বত্রই জাগরিত হইবে। উভয়

পক্ষের মতগত বিরোধ যখন এত প্রবল, তখন উহাদের মধ্যে কোন আপোষ-নিষ্পত্তিরও সম্ভাবনা থাকিবে না। আপোষ নিষ্পত্তির খাতিরে সোসিয়ালিষ্টদের পক্ষে মতের পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। কারণ ঐ মতই তাহাদের শক্তির প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এইরূপে পৃথিবী ব্যাপী বিরোধে একই সময়ে সর্ব্বজাতির মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটিবে, তাহা মনে হয় না। যদি হয়, সম্পত্তি ও মূল ধনের অধিকারী ও সমর্থন কারীরা দাঁড়াইবে এক দিকে, অন্যদিকে দাঁড়াইবে সাধারণ শ্রমিক দল ও উহাদের নায়করা। দ্বিতীয় পক্ষ সংখ্যায় বেশী হইলেও অপর বহু বিষয়ে নিঃসম্বল। ইহারা দেশে অনেক অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে তাহারা কখনই সমর্থ হইবে না। পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন দূরের কথা, মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রের অধীন হয় শ্রমিক নয় কর্ম্মচারী হইবে, এমন দিনের কাছা-কাছিও পৌছিতে উহারা কখনই পারিবে কি না সন্দেহ।

সমাজের অনেক লোক সোসিয়ালিজমের প্রতি এক রকম উদাসীন, ইহা দেখিয়া সোসিয়ালিষ্টরা সম্ভবতঃ একটু উৎসাহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা প্রতিকূল নয় তাহারা যে অনুকূল হইবে, সোসিয়ালিষ্টদের এইরূপ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায় সংস্কার বা সংগঠনের দিকে না গিয়া একেবারে বর্ত্তমান সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া নবতর সমাজ গড়িতে উন্মুখ। ইহা ধারণা করিতে অনেক লোকের অনেক সময় লাগে। আবার অনেকের নিকটে সোসিয়ালিজম একটা কাল্পনিক আকাশ-কুসুম সদৃশ। ইহাদের ধারণা উহা যখন কখনও কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিবে না, তখন উহার জন্য আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? তাহাদের বিশ্বাস যে সব ধীর ব্যক্তি সোসিয়ালিজমের কোন

দেখা দিবে না, তখন তাহার জন্য আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? তাঁহাদের বিশ্বাস যে সব ধীর ব্যক্তি সোসিয়ালিজমের কোন একটা আপাত-উজ্জ্বল দিক দেখিয়া উহার প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহারা উহার আসল মূর্ত্তি দর্শনে শেষে সরিয়া পড়িবেন। ইহা ছাড়া এমনও একদল লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, অর্থশাস্ত্রই যখন সোসিয়ালিজমের একমাত্র ভিত্তি, তখন ওরূপ সঙ্কীর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল ভিত্তির উপর সোসিয়ালিজমের সাফল্য ও স্থায়িত্বের আশা কিছুই নাই। কিন্তু এই দলের পক্ষে ইহাও জানা দরকার যে, বর্ত্তমানে অর্থনীতির পার্থক্যেই দলের পার্থক্য ও জাতির পার্থক্য সংঘটিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে এতদিন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষত্ব যে স্থান অধিকার করিয়াছিল,এখন অর্থনীতি অনেকটা সেই স্থানের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, যদি সোসিয়ালিজমের অভ্যুদয় ঘটে, তবে যাঁহারা এ বিষয়ে নানা কারণে এখন অনেকটা উদাসীন আছেন, তাঁহাদের তখন উহার সম্বন্ধে একটা মত অবলম্বন করিতেই হইবে। তাঁহারা তখন কোন পক্ষে দাঁড়াইবেন, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

শ্রমশিল্পের আকার বর্ত্তমানে বৃহৎ হইয়া পড়ায় বড় বড় কল কারখানায় এখন বহু শ্রমিক একত্র হয়। ইহাতে তাহাদের যেমন ঐক্যবদ্ধ হইবার সুবিধা হইয়াছে, তেমনই একটা সাধারণ মত গড়িয়া তুলিবার বেশ সুযোগ ঘটিয়াছে। এই মত অনেক সময় অপর পক্ষের দাবীদাওয়া না দেখিয়া কিছু স্বেচ্ছাচার মূলক হইয়া দাঁড়ায়। এই সব শ্রমিকেরা,পরস্পরে সর্ব্বদা একত্র থাকায় এবং তাহাদের সম শ্রেণীস্থ অপর লোকের সহিত তাহাদের যোগ কতকটা ছিন্ন হওয়ায়, একদিকে মূলধনী ও অপরদিকে জনসাধারণের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন একটা

সম্প্রদায়রূপে গড়িয়া উঠে। সংস্কারক ও আন্দোলনকারীরা সহজেই ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বলিয়া ইহাদের একটা যেন আপাত-বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা সহজ হওয়ায়, ইহারা অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীকে পশ্চাতে ফেলিতেও সমর্থ। যাহারা জমি কর্ষণ করে, অথচ জমির অধিকারী নয়, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবসায়ীদের উপর সোসিয়ালিজমের প্রভাব এখনও তেমন কিছু পড়ে নাই। যেখানে জমিজমা কেবল বড় বড় জমিদারদেরই করায়ত্ত, সেই খানেই অবশ্য ঐরূপ কৃষকশ্রেণীর আধিক্য লক্ষিত হইবে। আজ এই যে আন্দোলন য়ুরোপের বহুস্থলে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা যদি বড় বড় জমিদারিকে বিভক্ত করিয়া প্রজাদিগকে ঐ সব খণ্ডিত অংশের মালিক করিয়া তুলিতে পারে, তবে যেটা দেশের পক্ষে একটা চিরস্থায়ী মঙ্গলের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলন-কারীদের প্ররোচনায় এই জাতীয় প্রজা সোসিয়ালিজমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য মাত্র উহাদের নাম সোসিয়ালিজমের খাতায় দেখা যাইবে। ইহাতে সোসিয়ালিষ্ট দলের গুরুত্ব তেমন কিছু বাড়িবে না।

কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত অথবা নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের ভরণপোষনার্থ যে কোন প্রকার সম্পত্তির যাহারা অধিকারী, সোসিয়ালিষ্টরা তাহাদিগকে শ্রমিকদলের বিরুদ্ধ পক্ষ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। কারণ শ্রমিকদের ভরণ পোষণ কোনপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে নয়, একান্ত ভাবে নিজের দৈনিক মজুরীর উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই পার্থক্য অনেক সময় বিলুপ্ত হয়। যেমন একজন ঐরূপ শ্রমিক যখন সেভিংস ব্যাঙ্কে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে এবং শেষে একখানা বাড়ী বা

কিছু জমি ক্রয় করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার পক্ষে ঐ শ্রেণীগত পার্থক্য আর থাকেনা। এইরূপ লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ শ্রেণীস্থ অনেকের অপেক্ষা নিঃস্ব, সে হয়ত হিংসাবশে সোসিয়ালিষ্ট প্রভাবের অধীন হইতে পারেন। তথাপি অনেকেরই আবার এ সব জ্ঞান থাকা সম্ভব যে, নিঃস্বই হউক আর সচ্ছল হউক, তাহাদের প্রত্যেকের স্বার্থ সকল সহকর্ম্মীদের স্বার্থের সহিত বিজড়িত। এই ধারণায় হিংসার প্ররোচনা অনেকস্থলে দমিত থাকিবার সম্ভাবনা। ফলে এই শ্রেণীর মধ্যেও যাহারা কিছু ধীর ও বিচক্ষণ, তাহারা সোসিয়ালিজমের দিকে ঝুঁকিবে না বলিয়াই মনে হয়।

খ্যাতনামা জার্ম্মাণ লেখক হেনরী ট্রেইটস্কে (Heinrich von Treitschke) বলিয়াছেন—"আধুনিক রাষ্ট্রে শ্রেণীবিভাগ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।" ইহা খুবই সত্য, কারণ এখন রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা কেবল উচ্চতর শ্রেণী বা তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা সমাজের সকল স্তরেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যেখানে অভিজাত শ্রেণী আছে, সেখানে তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখন এমন রাষ্ট্র দেখা দিতেছে, যেখানে রাজনীতিক ক্ষমতা বিষয়ে কোন প্রকার উচ্চনীচ শ্রেণীভেদ বিদ্যমানই নাই এবং যেখানে কোন প্রকার সমাজিক শ্রেণীভেদ আইনের দ্বারা সমর্থিত নয়। সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলন কিন্তু এই শ্রেণীগত প্রভেদের ভাবকেই বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী। যুক্তিসঙ্গত বিচারে যাহাদের সঞ্চিত ধন বলিয়া কিছু নাই, নিজ দেহের শক্তিমাত্রই যাহাদের জীবন যাপনের একমাত্র সহায়, তাহাদেরই কেবল শ্রেণী বিশেষে ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের নিজ কার্য্য সাধনোপযোগী যন্ত্রাদি আছে এবং যাহারা

নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য নিজেরাই অপরের সহিত বিনিময় করিয়া থাকে, তাহা দিগকে অবশ্য অন্য শ্রেণীর কোঠায় ফেলা উচিত। যেমন,যে ব্যক্তি নিজে করাতের দ্বারা জ্বালানি কাঠ কাটিয়া নিজের ঘোড়া ও গাড়ীর সাহায্যে উহার ব্যবসায় চালায় তাহাকে মূলধনীর শ্রেণীতে ধরা যাইবে না কেন? কারণ মূলধনী শব্দটার অর্থ ত যাহার নিজ কার্য্য সাধনোপযোগী কোনপ্রকার মূলধন আছে এবং যে সাধারণতঃ কেবলমাত্র নিজের দৈহিক শক্তির উপরই নির্ভর করে না। ইহা একটা লক্ষনীয় বিষয় যে ফরাসী (Bourgeoisie) মূলধনী বা (Prolitariat) অমূলধনী)শব্দের মত জর্ম্মাণ বা ইংরাজি ভাষায় কোন শব্দই তৈয়ারী করা হয় নাই। ইহাতে কি এই কথাই কতক প্রমাণিত হয় না যে, সোসিয়ালিষ্টরা ঐ সামাজিক শ্রেণীগত প্রভেদকে পরিস্ফুট করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে সমাজে ঐরূপ কোন প্রভেদের ভাব না থাকায়, ঐরূপ প্রভেদসূচক কোন শব্দের প্রয়োজন ঘটে নাই।

এখন প্রশ্ন এই—ঐ মূলধনী-শ্রেণী যখন সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের আসল অর্থ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন উহারা ঐ রাষ্ট্রের প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিবে। এই শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার অন্তর্গত সকলেরই কিছু না কিছু সম্পত্তি আছে এবং সেই সম্পত্তি কোন না কোন উৎপাদনের কার্য্যেই নিয়োজিত। এই শ্রেণী হইতে উহার সহায়তাকারী—যেমন কেরাণী, শিক্ষানবিশ,বাহক ও গার্হস্থ্য ভৃত্য প্রভৃতি এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীবৃন্দকে বিভক্ত করা যায় না। কারণ যদিও উহারা প্রত্যক্ষ ভাবে এখন মূলধনী নয়, তথাপি মূলধনী শ্রেণীভুক্ত হইবার উহাদের অনেকেরই সম্ভাবনা আছে এবং উহারা সকলেই লোক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকে। লোকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কুফল ও স্বার্থনীতি-

চালিত সমাজ ব্যবস্থার যতই নিন্দা করুক, ধরিতে গেলে এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ও এরূপ নীতি কিন্তু মানব প্রকৃতির দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মানুষ নিজেকে একদিকে যেমন স্বতন্ত্র সত্তারূপে উপলব্ধি করিতে চায়, তেমনই অপর দিকে সে নিজেকে সাধারণ মানব সমাজের একজন সভ্য বলিয়া ধারণা করে। মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা ও উত্তম অথবা উহার অপরাপর স্বাভাবিক গুণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে না। পারিবারিক প্রতিষ্ঠান মানুষের ঐ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ক্ষেত্র। সোসিয়ালিজম মানুষের ঐ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সর্ব্বতোভাবে খর্ব্ব করিতে চায়। নিজের ইচ্ছামত কার্য্য নির্ব্বাচনে ও নিজের রুচিমত দ্রব্য সংগ্রহে সোসিয়ালিজম বাধা প্রদান করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের দ্বারা উহা ঐ কার্য্য সাধন করিতে উন্মুখ। তবেই, যাহারা কিছু না কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক, তাহারা যে সকলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী সোসিয়ালিজমের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

এইরূপ মনোভাব, কি ধনী কি দরিদ্র, যাহারই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, তাহারই মধ্যে প্রবল। অল্প ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেও মানুষ সন্তোষ অনুভব করে, কারণ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার পক্ষে সেইটাই বহুমূল্য। যে দানশীল ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জ্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিলাইয়া দেয়, সেও ঐরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জনের সুযোগসুবিধাকে অবহেলার চক্ষে দেখে না। ফলে সম্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব সকলের মধ্যেই বিদ্যমান।

এরূপ মনোভাব জমিজমার মালিকদের মধ্যে আরও বেশী প্রবল বলিয়া মনে হয়। নিজের গোলাবাড়ীর সঙ্গে একজন গোলাবাড়ীওয়ালার সম্বন্ধের মধ্যে লাভক্ষতির হিসাব অপেক্ষা

মমত্ব ও অনুরাগের ভাবই যেন বেশী প্রবল। বহু অতীত ও হয়ত কতক অংশে বিস্মৃত ঘটনা পরম্পরায় নিজের দেশের প্রতি দেশবাসীর যে টান লক্ষিত হয়, নিজের গোলাবাড়ীর প্রতি তার মালিকের টানও অনেকটা সেইরূপ। যাহা লোকে নিজস্ব বলিয়া জানে, তাহাতেই লোকে একটা সুখানুভব করে। জমির মালিকের ভিতর এইভাবটি আরও যেন বিশিষ্ট রূপে পরিস্ফুট। ছোট হোক আর বড় হোক, নিজের গৃহটুকু লোকের পক্ষে একটা বিশিষ্ট বস্তু যাহার উপর সমগ্র বহির্জগৎ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সেইরূপ সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারীও নিজের জমিজমাটুকুকে ঐ ভাবে দেখে, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর বক্ষের উপর ঐ ভূমিটুকুতে এমন একটা তাহার একান্ত অধিকার যাহার বলে সকল অনধিকার প্রবেশকারীকে সে বাধা দিতে সমর্থ। এখন ইহা কি কেহ আশা করিতে পারে যে, যে কৃষক নিজের জমিতে ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে নিজে যাহা কিছু নির্দ্ধারণ করে—কোন জমিটা বনভূমির আকারে রাখিতে হইবে, কোনটা গবাদি চারণের জন্য থাকিবে, আগামী বর্ষের চাষ আবাদ কিভাবে সুবিধাজনক করা যাইবে, এই সব বিষয় যে নিজে স্বাধীন ভাবে বন্দোবস্ত করে, সে কি স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষেত খামার রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দিবে, এবং রাষ্ট্র তাহার জমিতে যে ভাবে চাষ আবাদ করিতে চায় ও তাহার প্রাপ্য ফসলের অংশ যে পরিমাণ স্থির করিবে, তাহাতেই হৃষ্ট চিত্তে সায় দিবে? সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের অধীনে কৃষকসমবায়ের দ্বারা কৃষি কার্য্যের পরিচালনা অপেক্ষা ওসম্বন্ধে আর বেশী কিছু সুব্যবস্থা থাকা সম্ভব নয়। ইহা কি বিশ্বাস-যোগ্য যে, কৃষকেরা নিজ নিজ জমির উপর নিজেদের অধিকার সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে সোসিয়ালিষ্ট

টিকিটে শান্ত ও সুস্থির থাকিবে? ওরূপ পদ্ধতি তাহাদের নিকট দাসত্ব অপেক্ষা বড় বেশী সুব্যবস্থা বলিয়া ঠেকিবে, এইরূপ মনে হয় না।

ইহাও সম্ভব নয় যে, যে সব লোক নিজেদের সম্পত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী, তাহারা অন্ততঃ সোসিয়ালিষ্টদের সম্পত্তিগত যুক্তিতকে ভুলিয়া নিজ ভুমির উপর নিজ স্বত্ব বা মমত্বের দাবি পরিহার করিতে প্রস্তুত হইবে। ঐ যুক্তিতর্কের উত্তরে তাহারা বলিতে পারে, দেশের জমির উপর রাষ্ট্রের যে স্বত্ব, তাহা ত রাষ্ট্র অপরকে অর্পণ করিয়াছে। আবার সেই অপরের নিকট হইতে আরও অনেকে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ আদান প্রদান ও ক্রয় বিক্রয়ে সত্ব চিরস্থায়ী বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেশের লোকমতও প্রত্যেকের এরূপ স্বত্বকে কায়েমী করিয়া তুলিয়াছে। যদি এখন জোর করিয়া কোন রাষ্ট্র ঐরূপ ক্ষমতা চালাইতে যায়, তবে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থায় ও আইন আদালতে তাহা কখনই সমর্থিত হইবে না। সোসিয়ালিষ্ট মতের পক্ষপাতী কোন রাষ্ট্র যদি ঐরূপ ক্ষমতা চালাইবার প্রয়াস পায়, তবে অপরাপর রাষ্ট্র দেশের ভূস্বত্বের উপর এরূপ আক্রমণে নিশ্চয় উদ্বেজিত হইবে এবং ঐরূপ আক্রমণের দমনে বদ্ধপরিকর হইবে। তবেই, যত দিন না সমস্ত রাষ্ট্র-সমষ্টি সোসিয়ালিষ্ট ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন প্রজা-স্বত্বের উপর কি রাষ্ট্রীয় কি ব্যক্তিগত আক্রমণ ব্যর্থ করিবার মত রক্ষকের অভাব হইবে না।

অবস্থা বিশেষে কোনও কোনও রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিশেষ ভাবে ভূসম্পত্তির বিলোপ সাধন কিছু সুগম হইতে পারে, কিন্তু দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সোসিয়ালিষ্ট ভাবে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস সর্ব্বত্রই বিশেষ বাধা পাইবে। অনেক দেশেই এইরূপ বাধা সফল

হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বত্র সমাজের রক্ষণশীল দলের অর্থাৎ যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বত্ব অথবা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানাদি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের সমবেত শক্তির কথা ভাবিলে সোসিয়ালিষ্টদের প্রয়াস অনেকস্থলেই ব্যর্থ হইবে, এরূপ অনুমান করা যায়।

সহর গুলিই এই আন্দোলনের কেন্দ্র স্থল। সেখানে শ্রমিকদের উপর ইহার প্রভাব দেখিয়া মফস্বলবাসীদের উপর ইহার প্রভাবের নির্ণয় করা ঠিক হইবে না। কারণ নগরস্থ কারখানার শ্রমিকদের মত তাহারা একত্র বাস করে না, সুতরাং কোন নূতন ভাবের প্রভাব মফস্বলে অল্প পরিমাণে ও মন্থর গতিতেই বাড়ে। তাই মনে হয়, নিজেদের প্রভাব সম্বন্ধে সোসিয়ালিষ্টদের ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। এখন যদি তাহারা গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের দিকে টানিতে না পারে, অর্থাৎ গ্রামবাসীরা যদি তাহাদের ক্ষেত খামার গোলাবাড়ী ঘোড়া ভেড়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্র নিযুক্ত শ্রমিকরূপে দৈনিক মজুরী গ্রহণে রাজী না হয়, তবে সোসিয়ালিজমের সাফল্য সুদূর পরাহত। যদ্যপি সোসিয়ালিষ্টেরা মনে করে যে, যখন কারখানার শ্রমিকেরা তাহাদের পক্ষে তখন তাহারা সমগ্র দেশ জয়েই সমর্থ, তবে এরূপ ধারণায় তাহাদের অভীষ্ট ফললাভ কখনই ঘটিবে না। কারখানার শ্রমিকদের ছাড়িয়া সোসিয়ালিষ্টদের থাকা অসম্ভব হইলেও দেশের কৃষকেরা কিন্তু ঐরূপ শ্রমিকদের তোয়াক্কা না রাখিয়া নিজেদের কাজ বেশীই চালাইতে সমর্থ।

যাইহোক, যে বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া উল্‌সে সাহেব বলিতেছেন, যদি ব্যক্তিগত মূলধনের যথেচ্ছ ব্যবহারে শেষে সমগ্র দেশবাসী একদিকে কতিপয় ধনকুবের ও অপরদিকে তদধিক অসংখ্য জনসঙ্ঘে পরিণত হয়, যদি

একদিকে বর্ত্তমান স্বাধীন ব্যবস্থাজাত ঐরূপ সামাজিক ব্যাধি অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায় এবং অপরদিকে, সর্ব্বসম্পত্তিগ্রাসী সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভিন্ন উহার অন্যতর কোন প্রতীকার না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্য কোনটা যে বাঞ্ছনীয় তাহার নির্ণয় কিছু দুরূহ। তবে জনসঙ্ঘ যতদিন বর্ত্তমান ব্যবস্থার ঐরূপ ব্যাধির কার্য্যতঃ সম্ভাবনা না দেখিবে এবং দেখিলেও, অন্যতর উপায়ে উহা অপ্রতিবিধেয় বলিয়া না বুঝিবে, ততদিন সোসিয়ালিজমের দিকে তাহারা বড় ঝুঁকিবে না, এটা ঠিক। যদি প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ মূলধনের কেন্দ্রীকরণ ঘটে, তবে তাহা শুধু শ্রমশিল্পেই নয়, সমাজের সকল সম্পত্তির ব্যাপারেই দেখা দিবে। তখন কয়েকজন ধনকুবের ব্যবসায়ী অপেক্ষাকৃত সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে উৎখাত করিবে। ছোট ছোট গোলাবাড়ীর স্বাধীন মালিকরা অপরের অধীন প্রজাবর্গে পরিণত হইবে। সহরের সমস্ত বাড়ী কয়েকজন ধনীর হাতে গিয়া পড়িবে। ছোট ছোট উৎপাদকেরা তজ্জাতীয় বিপুল ধনশালীদের হয় বেতনভুক কর্ম্মী হইবে, নয় একেবারেই লোপ পাইবে। কিন্তু সামাজিক ব্যাপার এইরূপে বিকৃতির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিলে, বঞ্চিত দেশবাসী তখন কি তাহা নীরবে সহ্য করিবে? হয় তাহারা ঐ কয়েকজন সর্ব্বগ্রাসী ধন কুবেরকে ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে, নয় তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে। এইরূপ কোমল বা কঠোর বিদ্রোহের ফলে দেশ নিশ্চয় আবার পূর্ব্বকার সুস্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফল কথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বকারী ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের শৈথিল্য বিধায়ী কোন উপায় ঐ সম্ভাবিত সামাজিক বিকৃতির যথার্থ প্রতীকার বলিয়া গণ্য নয়। এরূপ বিকৃতির গতি নিরোধার্থ অনেক দেশেই ত প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়াই

নানা উপায়ের কথা আলোচিত হইতেছে, কার্য্যতঃ কয়েকস্থানে উহা কিছু না কিছু অবলম্বিতও হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যে প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলের রক্ষণ, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী উপায় অবলম্বন, বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে শ্রমভাবের লঘুকরণ, মধ্যস্থতার দ্বারা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার প্রয়াস, নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ বিবিধ শ্রমিকদের ভিতর সঙ্ঘ ও সমবায়-গঠনের অনুমতি দান এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদিগের সুযোগ ও সুবিধার সম্প্রসারণ—ইংলণ্ডের এইসব বিষয়ক আইন প্রণয়ন হইতে সামাজিক অমঙ্গলের নিরসনে কোন সভ্যজাতির কিরূপ উপায় অবলম্বনীয় তাহা কি বুঝা যায় না? এই সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে জমিজমার বিক্রয় সম্বন্ধে যে সব বিধিগত অন্তরায় আছে, সেগুলি যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদির স্থায়িত্বকামী স্বাধীন ক্ষেত্রস্বামী কৃষক সম্প্রদায়ের সংখ্যা যে অনেক বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও সহজে অনুমেয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই প্রচলিত রাষ্ট্র-নীতি যে সমাজব্যবস্থার কালোপযোগী সংস্কার সাধনে অসমর্থ, এমন আশঙ্কা আমাদের নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে নীতিহীন ও উত্তেজনাপ্রবণ গলাবাজদের প্রভাব, শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অবনতি, সুনীতির শৈথিল্য এবং তজ্জনিত সামাজিক সদাচারের ক্রমবিলোপ, বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও নিজ গ্রন্থের শেষে উল্‌সে সাহেব বলিতেছেন, এই সব অমঙ্গলের প্রতীকারের আশাও আছে। যে জড়বাদ ও নাস্তিকতায় দীনদরিদ্রের সম্মুখে ভগবানের প্রসন্ন বদন ঢাকা পড়িয়াছে, তাহার কথা ভাবিতে গিয়া সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও মনে উদিত হয় যে, খৃষ্টের ধর্ম্ম কখন মরিবার নয়,অধঃপাতের শেষ সীমায়

পৌঁছিলেও তৎধর্ম্মাবলম্বী জাতিকে আবার তাহা পুনরুত্থিত করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ অপেক্ষা বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ধর্ম্মের সর্ব্বত্র বিস্তারে ইহার শক্তি যেন আরও পরীক্ষিত ও জয়যুক্ত হইয়াছে। এমন কি, ইহা এখন নব বন্ধু সদৃশ যেন কোথা হইতে আসিয়া ফরাসী ক্যমিউনিষ্টদের মত তমসাচ্ছন্ন লোকের সম্মুখেও ইহার প্রসন্ন মুখপ্রভা বিস্তার করিতেছে এবং রাষ্ট্রনীতি হইতে বিযুক্ততাতেই মানুষের অন্তরাত্মার সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। যদি এই বন্ধু নিজের কাজ নিজের ধারানুমোদিত ভাবে করিতে পারে, তবে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থগত সকল অন্তরায় বিদূরিত হইয়া নিশ্চিতই উদার শান্তি সমাজের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গ্রন্থাবলী।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ—জ্ঞানপ্রচারসমিতি (Extention Lecture Department) হইতে প্রকাশিত।

হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান।

A Comparative Study of Hindu Social System.

······আধুনিক যুগ সভ্যতার নায়ক ইউরোপীয় সমাজের তুলনায় হিন্দুসমাজের স্থিতি পুষ্টি ও পরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু প্রমাণ্য গ্রন্থের প্রমাণে বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

লেখক—**হেমচন্দ্র বসু মল্লিক** ২য় বৃত্তিধারী অধ্যাপক **শ্রীকালী প্রসন্ন দাশ এম এ**।

সুবৃহৎ পুস্তক, ডিমাই আটপেজি ৮৫০ পৃষ্ঠা, ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সব উৎকৃষ্ট।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ**।

যাদবপুর (২৪ পরগণা)

এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

Babu Hirendra Nath Dutt M. A, B. L. P. R. S., **Writes.**

"It is in many ways a remarkable book; so far as I know there is no other work in the Bengali language which treats the subject matter with the lucidity and comprehensiveness which characterises your work."

Rai Priya Nath Mukerjee Bahadur, M. A., I. S. O.

"You have carried your examination at the domestic, economic, religious and political conditions of Bengal into fruitful regions and you have sown the seeds of discussion on useful and regenerative lines."

"Forward" in its editorial column observes :

"His work on Hindu Samaj Bijnan or a "Comparative Study of the Hindu Social System is a monumental work which has greatly enriched the Bengali literature."

The Amrita Bazar Patrika : "Our literature has thus been enriched by this work, and the Social and political thinking of a large number of our people will derive nutrition from it."

Servant : "The author has thoroughly dealt with the burning political, social and economic problems of the modern world and their relations to Indian life. His work carries fruitful suggestions towards the solution of those problems in our country and should attract the attention of all Indian thinkers."

আনন্দ বাজার পত্রিকা :—"এই বিরাট গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হইবে। অধ্যাপক দাশ মহাশয় এই গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা এ দেশে দুর্ল্লভ।"

দৈনিক বসুমতী :—"এই সময়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত কালী প্রসন্ন দাশ "হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান" সম্বন্ধে একখানি সুচিন্তিত সারগর্ভ এবং মৌলিকগবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া যে হিন্দু সমাজের মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

বঙ্গবাণী :—কালীপ্রসন্ন বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেকদিন হইতে নানাবিধ রত্ন প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই খানিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া মনে হয়।"

হিতবাদী :—হিন্দু জাতির পরম সৌভাগ্য বশতঃ এই "হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান" গ্রন্থখানি লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কালী প্রসন্ন বাবুর পুস্তক পড়িয়া অনেকের যে চক্ষু অজ্ঞান কুজ্ঝটিকার আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিবে এরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে।

ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি আর, এস, পি, এইচ, ডি :—"বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ যতই রচিত হয়; দেশের সাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, :—আমার বিবেচনায় ইহা বাঙ্গলা ভাষায় এম, এ পরীক্ষার পাঠ্যভুক্ত হইবার যোগ্য গ্রন্থ হইয়াছে ও শিক্ষিত সর্ব্বজন পাঠ্য একখানা বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ হইয়াছে।"

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন।

লেখক—**অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ**

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৩৫০ শত পৃষ্ঠার উপর—

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ উৎকৃষ্ট।

খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে হিন্দু জাতির রাষ্ট্র শাসন ও পাবলিক ল (Public Law) সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত আলোচনা।
